মেঘের পরে মেঘ

প্রতিভা বসু

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৫, আগস্ট ১৯৫৮

দাম : টা. ৩·৭৫

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

শ্রীনরেশ গুহ
শ্রীঅর্চনা গুহ
করকমলেষু

মেঘের পরে মেঘ

প্রথম খণ্ড

. . . . এক

'টিকিট। টিকিট দেখি দাদা।'

কলকাতার একমাত্র লেল্যাণ্ড বাস্। বিদেশ থেকে সদ্য এসেছে, সদ্য তাকে ছাড়া হয়েছে রাস্তায়, বিদ্যুৎবেগে সে আধঘণ্টায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে এসে পৌঁচচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। গাঢ় কালচে নীলের ঝলকে, রাজরাজেন্দ্রাণীর মতো চলনে, আশ্চর্য সুন্দর চেহারায় স্তব্ধ ক'রে দিচ্ছে শহরবাসীকে। ফুটপাতে চলতে-চলতে পথিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখবার জন্য, রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির অধিবাসীরা ছুটে এসে দাঁড়াচ্ছে বারান্দায়, তেতলার জানালা খুলে যাচ্ছে পটাপট।

এমন একটিমাত্র অপরূপ যানের আরোহী হ'তে কার না শখ গেছে তখন? চলন্ত দোতলায় ব'সে, উঁচু থেকে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে করুণা করতে কে না ভালো বেসেছে? রাজা-মহারাজারাও রোলস্‌রয়েস গাড়ি ছেড়ে একদিন উঠেছেন এটাতে, মহামান্য রাজকর্মচারীরা ভ'রে ফেলেছেন নিজেদের দিয়ে, উঠেছেন ভদ্রলোকেরা ভদ্রমহিলারা, ছেলেরা মেয়েরা, যুবকরা যুবতীরা— সব। সবাই। মানসী দত্তমল্লিককে নিয়েও পার্টির পরে একদিন বেড়াবার উপলক্ষে গাড়ি ছেড়ে বাসে চ'ড়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে এলেন তার ভাবী স্বামী সোমেশ্বর বাগচি।

মানসী একগাল হেসে গালে টোল ফেলে মিষ্টি ক'রে বললো, 'সুন্দর তো।' সোমেশ্বর দোতলায় উঠতে-উঠতে টলমলায়মান মানসীর হাত ধ'রে ফেলে বললেন, 'আগে সাবধান। প'ড়ে যাবে— ওপরে চলো, তারপর দেখবে আরো কত সুন্দর।'

রাত এগারোটার শেষ বাস, সাংঘাতিক ভিড় ছিলো না, কাজেই সামনের দিকেই একটা ফাঁকা আসন পেলে তারা। মানসী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রাস্তা দেখতে ব্যস্ত হ'লো আর সোমেশ্বর দেখতে লাগলেন মানসীকে। কিন্নরীকণ্ঠী মানসী, কোকিলকণ্ঠী মানসী। যার গানের স্বর সারা বাংলা দেশকে ভাসিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বম্বের বাতাস মুখর করতে চলেছে, যাকে সোমেশ্বর এতোদিনের চেষ্টায় বিয়েতে মত করাতে পেরে ধন্য হয়েছেন। সেই মানসী যার জন্য হিন্দুস্থান গাড়ি বেচে স্কোডা কিনেছেন সম্প্রতি।

এরই মধ্যে উজ্জ্বল দিনের রোদের মতো নীলবেগ্‌নিসবুজে-মেশা ফ্লুওরেসেণ্ট আলোয়, চেরা-সিঁথির মতো মাঝখানের রাস্তা দিয়ে এগুতে-এগুতে, খাকির জোব্বা পরা নির্মল কণ্ডাক্টর দু-পাশের লোক-জনকে সচকিত ক'রে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে 'টিকিট, টিকিট দেখি দাদা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো।

সোমেশ্বর অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে পয়সার জন্য হাত দিলেন পকেটে, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, 'ইডিয়ট।'

বলবার কারণ ছিলো তাঁর। টিকিট চাইতে এসে টিকিট না-নিয়ে হঠাৎ গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকা মানসীর অনাবৃত ঘাড় আর পিঠ আর এলানো খোঁপায় ঘেরা গালের এক পাশের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো নির্মল। চমকেও উঠেছিলো, কিন্তু বাসের ঝাঁকানিতে বোঝা গেলো না সেটা। ভেতরে-ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা তার লাফিয়ে উঠলো সজোরে। ঠোঁট নাড়লো মনে-মনে : 'টুনি! টুনি না? টুনিই তো!'

শুধু মনে-মনেই নয়, উত্তেজনায় নিজের অবস্থা ভুলে প্রায় ডেকেই উঠছিলো জোরে। পলা-রং শিফন পরা, চুল রোল করা, নখে রং মাখা,

প্রায় ফর্শা সুন্দরী সুগন্ধি মেয়েটির পিঠের উপর প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেছিলো নিজের শিরা-ওঠা ঘামে-ভেজা নোংরা হাতটা। সোমেশ্বর তাকে বাঁচালেন হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে। রুষ্ট গলায় বললেন, 'হাঁ ক'রে আছো কেন, তাড়াতাড়ি দাও, বালিগঞ্জ।'

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলো নির্মল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে যদিও সময় লাগলো একটু, তবু সহজ হ'য়েই টিকিট দুটি দিলো, তারপর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে নেমে এলো একতলায়। এনামেল-করা রুপোলি রড ধ'রে ধুঁকতে লাগলো অসুস্থ রোগীর মতো।

সহকর্মী নলিনী এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, 'কী হ'লো? শরীর খারাপ করছে নাকি?'

'বড্ডো।'

'এই ছ্যাখো। এখন উপায়?'

'কিছু হবে না। দয়া ক'রে তুমি যদি ওপরে যাও তাহ'লে সুবিধে হয় আমার।'

'তাই ভালো। ওপরে যা ঝাঁকুনি, তুমি নিচেই থাকো।'

নির্মল জবাব না-দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো চুপচাপ। কখন মেয়েটি নামবে তারই অপেক্ষায় যেন কাঁপতে লাগলো ভেতরটা।

দেরি হ'লো না, দু-এক স্টপ পরে নেমে এলো ওরা। প্রথমে সোমেশ্বর, পেছনে মানসী দত্তমল্লিক। আর ওরা নেমে যেতেই চলন্ত বাস থেকে এতোখানি ঝুঁকে পড়লো নির্মল, বুকের রক্ত তার তোলপাড় ক'রে উঠলো, ইচ্ছে করলো সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। হয়তো লাফিয়ে নামতেও যাচ্ছিলো, কে একজন চিৎকার ক'রে ধ'রে ফেললো খাকি বুশশার্টের কাটা কোণ, ধমকালো 'খেপেছো নাকি হে।' সারা বাসে একটি গুঞ্জন উঠলো তাকে নিয়ে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে সে যখন সিঁড়ির

রডটাতে হেলান দিলো সবাই বুঝলো গরমে অস্থির হয়েছে লোকটা তাই প'ড়ে যাচ্ছিলো।

ঐ ট্রিপের পরেই সেদিন শেষ হ'লো নির্মলের ডিউটি। মেসে ফিরে এলো। অখিল মিস্ত্রি লেনের নোনাধরা কোনো-এক মান্ধাতার আমলের তেতলা বাড়ির একতলার ভাপসা-গন্ধ এইটুকু একটি চার-দেয়াল-ঘেরা চৌকো সিমেণ্টের ফালিতে এক কোণে একটি গুটোনো বিছানায় ঢেলে দিলো নিজেকে। এতো তার ক্লান্ত লাগলো যে কলে গিয়ে হাত মুখটা পর্যন্ত ধুতে ইচ্ছে করলো না। কম আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো এই সুদীর্ঘ দশবছর পরেও টুনিকে চিনতে তার এক-পলক দেরি হ'লো না। এই সাজসজ্জা সত্ত্বেও। আর সব চাইতে আশ্চর্য— এখনো, আজও টুনির জন্যে তার হৃদয়ে এতো ব্যাকুলতা, এতো কষ্ট। এখনো মুখে-মুখে চোখ বুলিয়ে সে টুনিকেই খোঁজে। সেই কবেকার টুনি, তার ছোট্টো টুনি-পাখি, যে-মেয়ে একদিন চিরুনি দিয়ে খোঁপা বাঁধতো, নন্দদুলাল ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে গামছায় মুখ মুছে কপালে খয়েরের টিপ প'রে ব্যাকুল চক্ষু মেলে জামতলায় দাঁড়িয়ে থাকতো তার আশায়। সেই চেহারাটা ভেবে আজও বুক কাঁপলো নির্মলের।

কিন্তু আজকের এই সুবেশ সুন্দর, হয়তো বা বিবাহিত মেয়েটির সঙ্গে মিল কই তার? এই মেয়ে আর তাকে চিনবে না কোনোদিন, চিনলেও চেনে বলতে লজ্জিত হবে। ভাবতেও বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

মাথার রগটা টিপে ধ'রে, অন্ধকারে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কত কথাই যে মনে পড়লো। কত ঢেউ যে বুকের তটে আছাড় খেয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কড়কড়ে ভাত তেমনি ঢাকা থেকে-থেকে আরো কড়কড়ে হ'লো, খাওয়া হ'লো না। দেশলাই সিগারেট

তেমনি প'ড়ে রইলো পাশে। ধরানো হ'লো না। যেন কবেকার অন্ধকার স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে ফেললো রাস্তা, যেন কবেকার কোন জন্ম জন্মান্তর আগের একটা ধূধু কাহিনী মনে পড়লো কি পড়লো না।

বেড়ে উঠলো রাত, তবু ঘুম নেই। অন্যদিন ঘুমুতে-ঘুমুতেই ফিরে আসে কাজ থেকে। এসেই গোটা চারেক সিগারেট টানে, রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে মস্ত এক গ্লাশ চা আনিয়ে খায়, তারপর বারোয়ারি কলতলায় গিয়ে চৌবাচ্চার তলানি থেকে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে ঘটি দিয়ে জল তুলে হুড়হুড় ক'রে মাথায় ঢালে, সবই যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে। এক থাবায় আধখেঁচড়া ক'রে ভাত খেয়ে অমনি ঢ'লে পড়ে বিছানায়। তারপর নিটোল একটি স্বপ্নহীন ঘুম।

আজ কী হ'লো? এই মেয়েটি আজ আবার তাকে অশান্ত করলো কেন? যে-মেয়ে শামলা ছিলো, বিনা কাজলেই যে-মেয়ের চোখ কাজল ডোবানো ছিলো, লজ্জার ভারে আনত মধুর ছিলো যে-মেয়ের মুখ, তার সঙ্গে—এই মেয়ের আজ কী মিল খুঁজে পেলো নির্মল কণ্ডাক্টর যার জন্য শান্তি গেলো তার, গেলো আহার, গেলো নিদ্রা।

ছোটো চৌকো ঘরের চারকোণে চারজন শোয় তারা। আজ তিন-জনের ঘুমের ঘন নিশ্বাস ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠলো, অসহ্য হ'য়ে উঠলো ঘরের গরম, অন্ধকারে তালপাতার পাখাটা খুঁজলো, তারপর অতিষ্ঠ হ'য়ে বেরিয়ে এলো সরু গলিটায়। মাথার ওপর বিশাল আকাশের বিস্তৃতি যেন অনেকটা শান্তি দিলো মনে। উল্টোদিকের বাড়ির একতলা সরু বারান্দায়, যেখানে তিন-চারটে ছাগল রাত কাটায়, পাশে খোলা ডাস্টবিনটা দুর্গন্ধ ছড়ায়, একটা ষাঁড় সেই সব চিবোতে-চিবোতে ঝিমোয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, সেখানে সে বসলো উবু হ'য়ে হাঁটুর উপর তার লম্বা দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে, তারপর বদলে গেলো ছবি। গলিটা আর গলি

রইলো না, আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গেলো, কলকাতা শহরটা নিমেষে সবুজ গাছে ঢাকা প'ড়ে গেলো, ফাঁকে-ফাঁকে দেখা গেলো, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। ঘোষের বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, বামুনপাড়া, ফাঁকে-ফাঁকে টলটলে জল, পুকুর, ডোবা আর খানা-খন্দ।

নির্মল কতকাল পরে আবার ফিরে তাকালো তার ফেলে-আসা হারিয়ে-যাওয়া সোনার মতো দিনগুলোর দিকে।

. . . . দুই

প্রিয়নাথবাবু অক্ষম। প্রায় দু-বছর যাবৎ অর্ধাঙ্গ অবশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন বিছানায়। শান্ত সমাহিত হ'য়ে শুয়ে আছেন পিঠের তলায় বালিশ হেলান দিয়ে, তাকিয়ে আছেন জানালায়। দুই চোখে সারা আকাশের মেঘ। প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী নিজের দৈন্যদশা নিয়ে অবিরত কপাল চাপড়াচ্ছেন, ভাগ্যকে গাল দিচ্ছেন মুহুর্মুহু, বকছেন স্বামীকে, বকছেন মেয়েকে, রান্না করতে গিয়ে বাড়ন্ত চালের হাঁড়ি দেখে কেঁদে ফেলছেন ঝরঝর ক'রে। এই অভাবের জ্বালা তিনি সইতে পারছেন না।

আর প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে? টুনি? বেচারা দিনরাত ফরমাশ খাটছে মা-র, নিঃশব্দ ম্লানমুখে মালিশ ক'রে দিচ্ছে তার দুঃখী বাবার সরু পায়ে, বাসন মাজছে, মসলা পিষছে, তালি দিচ্ছে ছেঁড়া কাপড়ে— তবু বকুনি খাচ্ছে পদে-পদে মা-র কাছে। মেয়ের বিরুদ্ধে যেন তাঁর আর নালিশ ফুরোয় না। কেমন ক'রে ফুরোবে? মেয়েটা যে মেয়ে এ-কথা কি এক দণ্ডের জন্যও ভুলতে পারেন তিনি? যদি তাঁর একটাই সন্তান, তবে সে কেন ছেলে না-হ'য়ে মেয়ে হ'য়ে জন্মালো? সেটা তো সম্পূর্ণই টুনির

দোষ! অযাচিত হ'য়ে আসবার দরকার ছিলো কী তার? এ ছাড়াও টুনির মা ননীবালার মেয়ের উপর রাগের আরো-একটি মস্ত কারণ ছিলো: গান করতো টুনি। গলায় তার স্বর যেন উপচে পড়তো সারা-দিন। অনেক দুঃখ-দৈন্যেও সেটাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারতো না, ঝেড়ে ফেলতে পারতো না। খেজুরের গুঁড়ি-পাতা পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে তার গলা ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করতো। সব কষ্টের তার সেই সঙ্গীটির উপর ননীবালা একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন। নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে রূঢ় গলায় সেই স্বর তিনি ভেঙে খানখান ক'রে দিতেন। কিন্তু নির্মল মুগ্ধ হয়েছে, গান পাগল করেছে তাকে, মনে হয়েছে একটা কিছু না-করলে আর চলে না সত্যি। ব'লে-ক'য়ে ধ'রে-প'ড়ে কতবার কত জনকে নিয়ে এসেছে দু-একটা গান শিখিয়ে দেবার জন্য। আর সেই গান যখন টুনির গলায় মধু হ'য়ে ঝরেছে, কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছে তার হৃদয়।

গুম হ'য়ে থাকতেন টুনির মা, রাগে গরগর করতেন। বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ ক'রে শোনাতেন: 'ইঃ। গান। গান শিখছেন মেয়ে। গান শিখে তিনি আমার তিন কুল ধুয়ে দেবেন। ভদ্রঘরের মেয়ে, তার আবার অত গান-বাজনার কী দরকার? খেতে নেই শুতে রাঙাপাটি।' অবিশ্যি তা তো তিনি বলতেই পারেন। গান-বাজনায় যতটুকু সময় টুনি অপচয় করবে সেই সময়টুকু ঘরের কাজে মন দিলে আরো একটু আয়াস হয় তাঁর। টুনি ভয়ে চোর হ'য়ে গেছে। নির্মল বলেছে, 'কী বোকা! এতো কিসের ভয়! অভাবে-অশান্তিতে কাকিমার মাথার ঠিক নেই।' তবু চোখ থেকে টুনির ভয়ের ছায়া নামে নি। ও বড়ো ভীরু ছিলো, বড়ো নরম আর শান্ত।

কিন্তু ননীবালার মেজাজ আরো বিগড়োতো যখন নির্মল কোনো

জিনিস একান্ত ক'রে টুনির জন্যেই নিয়ে আসতো। অথচ তেমন জোর দিয়ে কিছু বলতেও পারতেন না, নিজের প্রতিবাদটা নিজের মনের মধ্যেই রুষতো ফুঁশতো, ঝালটা শেষে দিকভ্রান্ত হ'য়ে যে-কোনো উপায়ে মেয়ের উপরেই পড়তো গিয়ে। এই অক্ষম স্বামী নিয়ে নির্মলের উপরই তাঁর ভরসা। নির্মলকে কিছু বলবেন এমন সাহস তাঁর ছিলো না। একটু প্রশ্রয় না-দিলে সে-ই বা বশ মানবে কেন ? ভগবান কি তাঁকে একটা ছেলে দিয়েছেন যে আজ না হোক, কাল অন্তত খেটে খুটে উপার্জন ক'রে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে ? ঐ তো পরের ছেলে নির্মল। নির্মলই তো ধ'রে আছে ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল খাটিয়ে সেই তো বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ফুটো নৌকো। ভরাডুবি থেকে সে-ই বাঁচিয়ে রেখেছে।

'এমন কপাল' নির্মলের' কাছে ব'সে কপালে করাঘাত হেনেছেন তিনি, 'যে আশেপাশে নিন্দে করতে, ক্ষতি করতেই সকলে পটু, দুঃখে কষ্টে ম'রে গেলেও একটা আধুলি সাহায্য করতে কেউ নেই। বুঝলে বাবা, সেইজন্যেই বলি যে এই তোমার উপহার-টুপহারগুলো— ও-সবের দরকার কী ? তোমার কাকার জন্য একটা যদি ফুড আনো বলবার কিছু নেই, সংসারের জন্য যদি কিছু করো তাও কেউ বলতে পারবে না— কিন্তু এই টুনির জন্য যদি— বোঝোই তো সব। এমন বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।' আড়ে-আড়ে নানাভাবে নির্মলকে এ-সব কথা বুঝিয়েছেন তিনি। নির্মল চুপ ক'রে শুনেছে, আর তারপরেই হয়তো কলকাতার পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে-ঘুরে চমৎকার এক স্বরলিপি-পদ্ধতি কিনে এনেছে পরের সপ্তাহে।

তখন ছাত্র সে। সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। কুড়ি কি একুশ বছর বয়স। কিন্তু কলকাতার মতো মহা-নগরীতেও তার মন টেঁকে না, চ'লে আসে প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে, এই

পানাপুকুর আর শেওলা-ধরা এঁদো গ্রামে। মা বলেন, 'ওরকম সব হপ্তাতেই আসিস নি বাছা, খুব তো কাছে নয়, ওতে শরীর খারাপ হয়, টাকাও নষ্ট।'

মাকে জড়িয়ে ধ'রে নির্মল বলে, 'তোমাকে না-দেখে যে থাকতে পারি না, মা।'

মা-র দু-চোখে স্নেহ ঝ'রে পড়ে। 'শোনো আমার বুড়ো খোকার কথা। কী যে বলিস।'

আর সন্ধ্যাবেলা নির্জনে দেখা হ'তেই চোখ ছলছলে হ'য়ে ওঠে টুনির, 'তুমি কেন এমন করো?'

'কী করি?'

'প্রত্যেক সপ্তাহে আসবার কী দরকার?'

'অত আমি হিসেব দিতে পারবো না।'

'আবার বই এনেছো কেন?'

'গান শিখবে না?' খুশিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবার নির্মল, 'আমি একটা টিউশনি নিয়েছি জানো?'

'টিউশনি?'

'পনেরো টাকা মাইনে। কাউকে বোলো না কিন্তু। এ-টাকা আমি সব একা তোমার জন্যে খরচ করবো।'

'আমার জন্যে? আমার কী দরকার?' আবার ভয় নেমেছে টুনির চোখে।

নির্মল পলকহীন হ'য়ে তাকিয়ে থেকেছে সেই টলটলে দুটি চোখের দিঘিতে, আস্তে বলেছে, 'তোমার জন্যে একজন ওস্তাদও রেখে দেবো টুনি।'

'না, না—'

'আরো কী ভেবেছি জানো ?'

'কী ?'

'আমি পড়া ছেড়ে দেবো। কী হবে প'ড়ে ? তার চেয়ে চাকরি করা ঢের ভালো।'

অস্থির হ'য়ে পড়েছে টুনি, 'দোহাই তোমার। ও-সব তুমি করতে যেয়ো না। তুমি পড়া ছেড়ো না।'

'পড়া আমার হবে না।'

'কেন ?'

'কলকাতায় মন টেঁকে না।'

এবার টুনি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মন তারই বা টেঁকে কই ? তারপর ঘন হ'য়ে উঠেছে সন্ধ্যার আঁধার। ঝোপে-ঝাড়ে হাজার বাতি জ্বালিয়েছে জোনাকির দল, পুকুর থেকে গন্ধ উঠেছে জলের, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে ভারি হ'য়ে উঠেছে গ্রামের রাত। অনেক পরে টুনি মুখ তুলে চাপা-চাপা রুদ্ধ গলায় বলেছে— 'তুমি কিছু বোঝো না কেন ?'

'কী আবার বুঝবো ?'

'এভাবে— এভাবে— তুমি কি কখনো কিছু বুঝবে না ?'

'বুঝি, বুঝি। সব বুঝি।' হাসি-ভরা চকচকে চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে বলেছে নির্মল, 'যার যে-বিত্তের ক্ষমতা আছে তার জন্যে যে তাই ব্যবস্থা দরকার সে আমি খুব বুঝি।'

'সবাই কত যা-তা বলে—'

'বলুক গে। আমরা তো কলকাতাই চ'লে যাবো।'

'কলকাতা !'

'কলকাতা না-গেলে কিছু হয় না। এই পাড়াগাঁয়ে ব'সে থাকলে

কেবল জুজুর ভয়।' আস্তে একটা টোকা দিয়েছে সে টুনির গালে, 'টুনি, টুনটুনি, টুনি পাখি।'

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে পালিয়ে গেছে টুনি।

. . . . তিন

তারপর একদিন নির্মল সত্যিই পড়া ছেড়ে দিলো। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে যে-ছেলে তিনটে লেটার পেয়ে, দশটাকার জলপানি পেয়ে দেশের দশের বিধবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছিলো, মাস্টারমশাইরা যে-ছেলে জজ হবে ব'লে রায় দিয়েছিলেন, সমাজপতিরা ভেতরে-ভেতরে বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে বলেছিলেন, 'সাবাস, সাবাস' তার এই আচমকা খেয়ালে সবাই সচকিত হ'লো। ফার্স্ট ইয়ার থেকে খুব ভালো ক'রে, প্রথম পাঁচজনের একজন হ'য়ে সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে, মা কত আশায় বুক বেঁধে তাকে কলকাতা পড়তে পাঠিয়েছেন, কত তাঁর আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবনের কত উজ্জ্বল ছবি রচনা, সব— সব গেলো। সরোজিনী দুঃখে, ক্ষোভে প্রায় কেঁদে ফেললেন, 'তুই কি আমাকে একবার জিগ্যেস করাও দরকার মনে করলিনে ? যা নিজে বুঝলি তাই করলি ?'

নির্মল মিষ্টি ক'রে হাসলো, 'ঐ ছাখো। এ নিয়ে এতো কী কষ্ট তোমার বলো তো ? পাশ করলেই বুঝি একটা মস্ত দিগ্‌গজ হ'য়ে যেতুম ? কিন্তু এ-কথা তো বোঝো যে, পাশই করি আর যা-ই করি, চাকরি না-করলে আমাদের চলতো না ?'

'যখন চলতো না তখন চলতো না। তাই ব'লে এখুনি তুই পড়া ছেড়ে দিবি ?'

'ভালো একটা কাজ পেয়ে গেলাম, না-নেওয়া বোকামি হ'তো না ?'

'এখুনি তোর কাজ করবার হয়েছে কী ? না-খেয়ে তো আর ম'রে যাচ্ছিলাম না।'

'তা না-ই হ'লো, বয়েস তো আমার কম হ'লো না ? এখন চাকরি করারই সময়।'

বাবার মৃত্যুর পরে বছর দুয়েক নষ্ট হয়েছিলো নির্মলের, সে-কথাটাই উত্থাপন করলো সে, 'একুশ বছর বয়সের ছেলে আর আই. এ. পড়ে না।'

'না, তা পড়বে কেন ?' এবার সরোজিনী গঞ্জনা দিলেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে সবাই-ই সাত তাড়াতাড়ি তোর মতো পরের সংসারের গোলামি করে।'

এ-কথায় একটু থমকে গেছে নির্মল, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে— 'কাউকে কিছু করতে পারা কি খারাপ ?'

'না, খারাপ কেন হবে ? তুই যে তাদের দাসখৎ লিখে দিয়েছিস।' রাগে দুঃখে মুখ খুলে গেছে মা-র। 'প্রিয়নাথ দত্তমল্লিকের সাতপুরুষের জমিদারি তো বাঁধা আছে তোর কাছে। তাই তার বউ-মেয়েকে খাওয়াতে তোর চাকরি নিতে হবে।'

ব্যথিত গলায় নির্মল বলেছে, 'তিনি আমার মাস্টারমশাই, তিনি আমার গুরু। তুমি কি আজ সেই সম্বন্ধটাও অস্বীকার করবে ?'

'গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা একেবারে। গুরুর জন্যে সব উৎসর্গ না করলে কি আর তোমার এখন চলে ?'

'না মা, চলে না। যেমন ছাত্রের জন্য একদিন রাত না জেগে পড়ালে গুরুরও চলতো না।'

প্রিয়নাথবাবু মাস্টার ছিলেন এই রাধানগর হাইস্কুলের, আর নির্মল ছিলো তাঁর পরমপ্রিয় ছাত্র। তার বাবা যখন মারা গেলেন, আর

সরোজিনী শোকার্ত হ'য়ে মেঝেতে প'ড়ে থাকা ছাড়া সব ভুললেন সংসারের, নির্মল অমনি স্বাধীন হ'য়ে তাড়াতাড়ি স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলো। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'লো ঘুড়ি ওড়ানো, পাড়া বেড়ানো আর লাট্টু খেলা। ধীরে-ধীরে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ভদ্রলোকই তখন তাকে আবার একদিন হাতে ধ'রে স্কুলে নিয়ে ভর্তি ক'রে দিলেন, ভালোবেসে পড়ালেন, পরীক্ষার সময় প্রাণপাত করলেন তার জন্য, আর সে যখন কৃতী হ'য়ে স্কুলের গণ্ডি পার হ'লো, আনন্দের অংশটা তাঁরই ছিলো সব চেয়ে বেশি। আর তারপর একদিন এই বিপদ এলো অতর্কিতে।

স্কুল থেকে ফিরছিলেন প্রিয়নাথবাবু, কোনো ফেল-করা রুষ্ট ছেলে ছুটে এসে জব্দ করবার জন্য রাস্তার মোড়ে কলার খোসা রেখে গেলো কয়েকটা, সেই খোসাতে পা হড়কেই ভেঙে গেলো তাঁর কোমর থেকে পায়ের জোড়ার হাড়টা। আর তিনি উঠতে পারলেন না শয্যা থেকে।

সরোজিনী ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সত্যি ক'রে বল তো নিমু, সবই কি তোর প্রিয়নাথ মাস্টারের জন্যই ?'

জবাব দিলো না নির্মল।

'বল না সত্যি ক'রে, খুঁজে-পেতে এই যে অ্যালুমিনিয়মের কারখানায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের এক কাজ নিলি তুই, তার মূলমন্ত্রটা কী ?'

'মূলমন্ত্র হচ্ছে টাকা। টাকার বড়ো দরকার, মা।'

'খুব দরকার, না ? মায়ের সাধ আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি। লেখা-পড়া ক'রে পাঁচজন ভদ্রলোকের মতো হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়েও বড়ো।'

নির্মল মা-র হাত দুটো নিজের গলায় জড়িয়ে এবার হেসেছে শুধু।

আর কিছু বলে নি। কী লাভ ? মা কি বুঝবেন এ-সব কথা ? বড়ো-বড়ো করুণ চোখে টুনি যখন তাকায় তার দিকে, বিশ্বসংসারে এমন কী আছে যা সে বিনিময় করতে না-পারে তার জন্য ?

আজ কতকাল পরে মনে পড়লো সেই সব কথা, সেই সব দিন, সেই সব স্মৃতির সমুদ্র আজ মথিত হ'লো। মনে পড়লো, মা কত যত্ন ক'রে খাবার সাজিয়ে ব'সে অপেক্ষা করতেন, বাইরে সাইকেলের পরিচিত বেলটি শুনলেই বেরিয়ে আসতেন ব্যস্ত হ'য়ে। দুপুরবেলাকার প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেদনায় করুণ হ'য়ে উঠতো তাঁর চোখ। আর যখন টুনির কাছে এসে দাঁড়াতো, গালের কাছটা লাল হ'য়ে উঠতো তার, মুখ-ভার ক'রে একটু পরে বলতো, 'এতো দেরি ?'

নির্মল হেসে বলতো, 'অঙ্ক ক'ষে আসতে হয় কিনা ?'

'অঙ্ক !' টুনি অবাক।

নির্জন জামরুল তলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘামতে-ঘামতে নির্মল গম্ভীর মুখে জবাব দিতো, 'হ্যাঁ, অঙ্ক বৈকি।'

'ফ্যাক্টরির চাকরিতেও অঙ্ক লাগে ?'

'হুঁ-উ।'

'ঈশ্ !'

'কী ঈশ্ ?'

'অঙ্ক ভীষণ বিচ্ছিরি।'

'আর অঙ্কও কি সোজা অঙ্ক নাকি ?' চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে নির্মল সেই অঙ্কের তালিকা দিয়েছে, 'ধরো, ফ্যাক্টরিতে খাবার ঘণ্টা বাজলো, পিলপিল ক'রে সব বেরুলো গেট দিয়ে— পাঁচ মিনিট। আমি মাঠ-ঘাট ভেঙে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালালাম। তারপর— তারপর একটা মস্ত

বড়ো হিসেব ঘুরতে লাগলো মগজে। যথা— শ্রীমতী টুনিপক্ষী ছাড়া আর কে আছে খিড়কির ঘাটে— এক ; তার মা-র খাওয়া এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে কিনা— দুই ; তিনি ঘাটে এসে একঘণ্টা কুলকুচি ক'রে আঁচিয়ে, জলে বাসনের পাঁজা ডুবিয়ে, ঘরে গেছেন কিনা— তিন ; পান খেয়ে পিচ্ ক'রে জানলা দিয়ে পিকফেলে, পাৎলা চুল বালিশে মেলে মেঝেতে পাটি পেতে শুয়েছেন কিনা— চার ; তারপর 'অ টুনি, হেঁসেলে যেন বেড়াল ঢোকে না আবার। গোবর-ন্যাতাটা ভালো ক'রে বুলিয়ে নিস। এখন আবার খিড়কির ঘাটে তোর কী দরকার রে বাপু,' ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে কিনা—'

'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ। এতো সব হিসেব বুঝি সোজা কথা ? তারপর শ্রীমতী কখন রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে সদর বন্ধ ক'রে, দয়ার অবতার হ'য়ে অধীনকে দেখা দেবার জন্য জামরুল তলায় দাঁড়াবেন, কখন সরকার-বাড়ির পদিটা বাসন ধুয়ে চ'লে যাবে, ঘাট থাকবে সুমসাম, কেবল মাথার উপর নীল আকাশ আর তার তলায়—'

ঝরনার জলের মতো ঝরঝর ক'রে এবার হেসে ফেলেছে টুনি, 'এই বুঝি অঙ্ক ?'

'অঙ্ক নয় ? এতোখানি হিসেব ক'রে এতোগুলো মাইল ডিঙোনো তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিকের কাজ ! অঙ্ক বলছো কী তুমি ?' নির্মল টুনির চোখে চোখ রেখেছে, 'আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো তো, ঠিক এই মাত্রই তুমি সব সেরে এখানে এসে দাঁড়িয়েছো কিনা ?'

হাসির আভায় দুই চোখ উদ্ভাসিত ক'রে মুখ নিচু করেছে টুনি।

নির্মল ঘাম ঝেড়েছে কপালের, 'একটা খবর আছে।'

'কী ?'

'লিফ্‌ট্ হবে একটা, মাইনে দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে।'

খুশিতে টলটলে হ'য়ে উঠেছে টুনি, 'আজ জানলে ?'

'এক সপ্তাহ আগেই জেনেছি।'

'বলো নি তো !'

'খবর তো তখনো পাকা ছিলো না ?'

'আজ বুঝি ঠিক হ'য়ে গেলো ?'

'হ্যাঁ।'

টুনি এবার একটু চুপ ক'রে থেকেছে, একটু উদাস হ'য়ে তাকিয়েছে রোদ্দুর-ঝলসানো পুকুরের জলে, কচি-কচি জামরুল পাতা দাঁতে কাটতে-কাটতে বলেছে : 'বাবা কী বলেন জানো ?'

'কী ?'

'আমাদের জন্যেই তোমার সব ব্যর্থ হ'লো।'

'মাইনে বাড়ছে দ্বিগুণ, কাজ পেয়েছি ভালো, ব্যর্থ ?'

'বাবা বলেন তোমার মতো পরিষ্কার মাথা কোনো ছাত্রের দ্যাখেন নি তিনি। তাঁর ভীষণ দুঃখ তুমি পরীক্ষাটা দিলে না ব'লে।'

নির্মলের মুখেও যেন ছায়া পড়েছে একটি, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে, 'ভারি পরীক্ষা। বেশ তো, এতো দুঃখ কিসের, একসময় না-হয় দিয়েই দেওয়া যাবে।'

'আর তোমার সময় হবে কিনা। সকাল থেকে রাত অব্দি কাজ।'

'তার ফাঁকে-ফাঁকেই অন্তত পাশ করবার মতো পড়া আমি তৈরি ক'রে নেবো ঠিক।'

'পারবে ?'

'কেন পারবো না ? তুমি বললে আমি কী না পারি ?'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?' একটু ভেবে নিয়ে মুখের দিকে

তাকিয়েছে টুনি, 'ছুটি নিয়ে, পরীক্ষাটা দিয়ে দিলে হয় না ? বাকি তো নেই বেশি ?'

'সবে কাজে ঢুকেছি, এখন কি ছুটি দেয় ?'

'দেয় না বুঝি ?'

'মনিবরা সবাই সমান। এই ছাখো না, এক মিনিট দেরি ক'রে এলে তোমার কাছেই কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আমি তো ভয়ে মরি, বুঝি বরখাস্তই ক'রে দিলে, অবিশ্যি ওরা ঠিক তোমার মতো এতো কড়া মনিব নয়।'

'যা !' টুনি একেবারে লজ্জায় লাল।

তার কথায়-কথায় লজ্জা। আর সেই লজ্জা যে কত মধুর ছিলো, তা তো নির্মল আজ এই মুহূর্তেও ঠিক তেমনি ক'রেই অনুভব করতে পারছে বুকের মধ্যে।

. . . . চার

একদিন টুনির মা থমথমে মুখে বললেন, 'আর তো আমাদের গ্রামে টেঁকা দায় নির্মল।'

নির্মল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আতঙ্কিত হ'লো, 'কী হয়েছে কাকিমা ?'

'না, কী আর হবে।' দাওয়ায় ব'সে শাকপাতা কাটতে-কাটতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। ছোট্টো মাটির উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় ব'সে মসলা পিষতে-পিষতে একবার এদিকে তাকালো টুনি।

নির্মল বললো, 'কেউ কিছু বলেছে ?'

'বলবেই বা না কেন ?' ননীবালা চোখ টান করেছেন, 'হাল, চাল, তরিবৎ এগুলো তো মানো ? না কি মানো না ?'

নির্মল অকাতরে ঘাড় হেলিয়েছে, 'হুঁ—উ—উ। নিশ্চয়ই মানি।'

'তবে ?'

'কী তবে কাকিমা ? অপরাধ হয়েছে নাকি কোনো ?'

'অপরাধ নিরপরাধের কথা নয়, কথা হচ্ছে সমাজে বাস করতে গেলে পাঁচজনের কথা মতোই চলতে হয়, তা নৈলেই নিন্দে।'

'বুঝি কেউ নিন্দে করেছে আমাকে ?'

'তোমাকে আর কেন করবে ? সোনার আংটি আবার বাঁকা। পুরুষ মানুষের তো সাতখুন মাপ। কিন্তু তুমিই বলো দেখি বাছা, আমাদের মতো ঘরের এতো বড়ো মেয়ে যদি গলা ছেড়ে দিন-রাত গান-বাজনা করে, তুমি কাকে না কাকে ধ'রে নিয়ে আসো শেখাতে, তাহ'লে লোকে দুটো বিচ্ছিরি কথা কেনই বা বলবে না ?'

'ও, এই ?' এতোক্ষণে আসল কথা টের পেলো নির্মল। এবার একটু হাসলো সে, 'টুনির গান শুনলে সকলেরই হিংসে হয় কিনা কাকিমা, তাই ওরকম করে। ও-সব কিছু না।'

'তা তো ঠিকই।' কাকিমার তরকারি কাটা বন্ধ হয়েছে, 'তুমি অবিশ্যি অনেক করো, আমি সেজন্য কৃতজ্ঞও তোমার কাছে, কিন্তু তাই ব'লে তো হক কথা না-ব'লে পারিনে।'

ওদিকের বারান্দা থেকে মসলা পিষতে-পিষতে টুনির ভীত চকিত হাত থেমে গেছে, হরিণের ভয় নেমেছে তার চোখে। কী জানি, মা আবার কী বলবেন ঠিক আছে কিছু ?

নির্মল দরাজ গলায় হেসেছে, 'বা রে, বলবেন বৈকি ? দোষ করলে খুব ব'কে দেবেন।'

‘ঠাট্টা তামাশা ক’রে তো আর জীবন কাটে না ?’

‘তাই তো।’

‘হাজার হোক আমরা তোমার গুরুজন।’

‘নিশ্চয়ই।’

‘তোমার মাস্টারমশাই তোমাকে ছেলের মতোই ভাবেন।’

‘মাস্টারমশাইকেও আমি আমার পিতৃতুল্যই ভাবি, কাকিমা।’

‘তা হয়তো ভাবো। কিন্তু এ-কথা কি ভেবেছো— ক’দিন পরে তুমি যখন আর্ধেক রাজত্ব আর কুঁচবরন কন্যার মেঘবরন চুল এনে ঘর আলো করবে তখন এই কালো মেয়ের গতি কী হবে ? মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে ? গান দিয়ে তো পেট ভরবে না।’

‘তা হয়তো ভরতে পারে।’ চোখ কুঁচকে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে নির্মল। ‘কলকাতায় আজকাল গানের ভীষণ আদর। জানেন কাকিমা, কত মেয়ে এই গান গেয়েই স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে সংসার।’

‘ছি ছি ছি।’ ননীবালা মরমে ম’রে গেছেন এ-কথা শুনে। ‘নির্মল, তুমি আমার পেটের ছেলের বয়সী, আমার মুখের কাছে ব’সে তুমি এমন কুচ্ছিৎ ইঙ্গিতটা করতে পারলে ?’

নির্মল হকচকিয়ে গেছে, ‘কেন ? কেন ? কী বললাম ?’

ওদিকের বারান্দা থেকে টুনিও চঞ্চল হ’য়ে উঠেছে। হাত কেঁপে উঠেছে তার।

ননীবালা হাঁক দিয়েছেন, ‘তোর হ’লো ? যা না বাপু, রান্নাঘরে গিয়ে একটু উনুনটা তাতিয়ে দে—’

কাঠের বারকোশে লাল-লাল আঙুলে মসলা তুলে ঘরে ঢুকে গেছে টুনি। নির্মলের বুকটা কড়কড় করেছে, মনে হয়েছে লঙ্কা বেঁটে ওর হাত না জানি কত জ্বলছে, নরম-নরম হাতে শিলের উপর নোড়া ঘষতে

না জানি কত কষ্ট হয়েছে ওর। ওর নিচু-করা-কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘাম লেগে রয়েছে চোখের মধ্যে। অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বলেছে, 'আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি কাকিমা?'

ননীবালা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন, 'তুমি বোঝো না? গরিব হ'তে পারি, তাই ব'লে সম্ভ্রম খোয়াতে পারিনে তো? আমরা দত্তমল্লিক বংশ, আমাদের বংশের মেয়েরা আগে সূর্যের মুখ দ্যাখে নি। আর তুমি বলছো সেই ঘরের মেয়ে বাইজিদের মতো গান গেয়ে রোজগার করবে? ছি! এর আগে আমার মরণ হ'লো না কেন?'

নির্মল একেবারে সনির্বন্ধ হ'য়ে উঠেছে, 'আপনি ভুল বুঝেছেন কাকিমা, আমি ও-সব কিছুই ভাবি নি। কলকাতায় অনেক বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়েরাও আজকাল—'

'থাক। বড়ো ঘরের বড়ো কীর্তি। ও-সব আমি শুনতে চাইনে। না-খেয়ে মরি সে-ও ভালো, তবু যেন এমন দিন আমার না-আসে।'

এবার চুপ ক'রে গেছে নির্মল। ননীবালা বঁটি কাৎ ক'রে তরকারির চুপড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'শুনলাম তোমার মা নাকি ললিত হালদারের ছোটো নাৎনির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করছেন। তা ভালো। পাবে-থোবে অনেক।'

নির্মলের কাছে খবরটা নতুন। কিন্তু তবুও এতোক্ষণে পাল্টা জবাব দেবার মতো প্রশ্ন পেয়েছে একটি, মৃদু হেসে বলেছে, 'টুনিরও তো শুনলাম চৌধুরী বাড়ির তিনু চৌধুরীর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ ঠিক করছেন?'

'ও মা!' ননীবালা একেবারে গালে হাত দিয়ে তাজ্জব। 'কে বলেছে? যতো সব মিথ্যে কথা!' পাছে কান-ভাঙানি দেয় কেউ এজন্যে তিনি কত সন্তর্পণে কথা চালাচালি করেছেন অনাদি ঠাকুরের সঙ্গে, এর মধ্যেই জানাজানি?

ভারি মুখে নির্মল বলেছে, 'কিন্তু তিনু চৌধুরী তো টুনির পায়েরও যোগ্য নয়।' বলতে-বলতে বাইশ বছরের ছেলের বুক তেতাল্লিশ বছরের বিপত্নীক তিনু চৌধুরীর উপর ঈর্ষায় টগবগিয়ে উঠেছে।

'তা, কী আর করি—' আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছেন ননীবালা, 'ঘটটা বুঝে তো ফলটা ? আমার মেয়েই বা এমন কী ?'

'কী নয় ?' রীতিমতো রাগ ফুটেছে নির্মলের গলায়, 'সারা গ্রামে ওর মতো আর ক'জন মেয়ে আছে শুনি ?'

'সে-কথা তুমি বললে তো আর হবে না ? বিয়ের বাজারে আমার মেয়ের দর আমি জানি। সেজন্যেই তো বলি বাবা, একটু তো বুঝে-সুঝে চলতে হয় ? এই গাঁয়েই তো বাস করতে হবে সকলের সঙ্গে।'

'উঁহু ! সে আমি কথা দিতে পারিনে।' পাকা ভদ্রলোকের চিন্তিত মাথার মতো নির্মলের মাথাও এপাশ-ওপাশ হেলেছে এবার।

'তুমি কথা দিতে পারো না মানে ? তোমার কথাতে কী এসে যায় ?' টুনির মা অবাক।

'মানে বিয়ের পরে টুনি খুবসম্ভব কলকাতাতেই থাকবে কিনা—'

'বিয়ের পরে।'

'মেয়ের বিয়ে দেবেন না ?'

'তা তো দেবো।'

'তাই বলছি।'

'কী বলছো ?'

'বলছি টুনির জন্যে আমি পাত্র ঠিক করেছি, এখন দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। তবে ঐ তিনু কঞ্জুষের চেয়ে যে সে শতগুণে ভালো এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।'

মুহূর্তে আলো হ'য়ে উঠেছেন টুনির মা। 'কোথায় বাবা ? কোথায় ?' গলার স্বরই বদলে গেছে একদণ্ডে।

'পাত্র এই গ্রামেরই।'

'কী করে ? ঘরে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে তো ?'

'তা মোটামুটি আছে বৈকি।'

'আমি বাবা কিছুই চাইনে, যদি মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পায়।' এই ব'লে তিনি সবই চেয়েছেন। 'তা ছেলেটি কেমন ?' গলা বাড়িয়ে ঘন হ'য়ে এগিয়ে এসেছেন নির্মলের কাছে। নির্মল পরম উদাসীন থেকে বলেছে, 'লোকে তো ভালোই বলে।'

'জমি-জমা কিছু—'

'তাও আছে, বছরের ধান হয়। পাকা বাড়ি আছে।'

'আহাহা। তবে তো চমৎকার। দেখতে-শুনতেও বোধহয়—'

'তা মন্দ কী— রং ফর্শা, মুখ-চোখও ভালো, আর স্বাস্থ্য এমন যে একদিন তার একটু সর্দিও হয় না।'

'আর স্বভাবচরিত্র ?'

'অতিশয় ভালো।'

'সংসারে আর-আর আছে কে ? ক'টি ভাই-বোন ?'

'না, সে-বিষয়েও নির্ঝঞ্ঝাট। টুনি খুব সুখে থাকবে সেখানে।'

গদ্গদ ননীবালা একেবারে চুপড়ি-টুপড়ি ফেলে এলিয়ে গেছেন, 'চাকরি-বাকরি করে কিছু ?'

'তাও করে। মাইনেও ভালো।'

'আমার টুনির কি এতো ভাগ্য হবে ?' হাত জড়িয়ে ধরেছেন নির্মলের, 'এমন সোনার চাঁদের হাতে দেবার যোগ্যতা কি আমার আছে ?'

'কেন থাকবে না কাকিমা ?' নির্মল একেবারে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর

ছেড়েছে— 'টুনিকে আপনি অত ছোটো ক'রে ছ্যাখেন কেন ? আমি তো ভাবছি সেই ছেলেরই কি এতো যোগ্যতা আছে যে সে টুনিকে পাবে ?'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি তাকে বলেছো তো বাবা আমাদের কী অবস্থা ?'

'হ্যাঁ। এ-সবই সে জানে।'

'কিছুই যে দিতে-থুতে পারবো না—'

'দরকার নেই।'

'তাহ'লে তুমি এক্ষুনি ঠিক ক'রে দাও। বলো, কবে নিয়ে আসবে তাকে মেয়ে দেখাতে।'

'একগ্রামের ছেলে, মেয়ে তো তার দেখা।'

'দেখা ! কবে দেখেছে ?'

'রোজই তো ছ্যাখে।'

'রো-জ ছ্যা-খে !' এবার টুনির মা একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছেন নির্মলের মুখের দিকে, ধীরে-ধীরে বলেছেন, 'তার নাম কী বলতে পারো ?'

মৃদু হেসে মাথা নিচু করেছে নির্মল, 'আমাকে যদি অপছন্দ না করেন—'

'তোমাকে !'

'মাস্টারমশাই যদি—' এবার ঘন-ঘন মুখ মুছেছে সে, বারে-বারে লাল হ'য়ে উঠেছে কান।

'তোমাকে অপছন্দ করবো !' টুনির মা তেমনি অপলকে তাকিয়ে থেকেছেন তার মুখের দিকে।

লাজুক ভঙ্গিতে নির্মল আবার বলেছে, 'যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, ছ'মাস পরে আমার চাকরি পাকা হ'লে, তখন আমি— আমার মাইনেও তখন আরো কিছু বাড়বে—'

'নিমু, আমি কী ব'লে তোমাকে আমার—' ননীবালার গলা বন্ধ হ'য়ে এসেছে কৃতজ্ঞতায়।

নির্মল উঠে দাঁড়িয়েছে তাড়াতাড়ি, 'আমি আজ যাই কাকিমা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে কিনা—'

. . . . পাঁচ

রাত্তিরে খেতে ব'সে মাকে বললো নির্মল, 'আমি বিয়ে করবো, মা।'

মা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বললেন, 'আমিও সে-কথাটাই বলবো ভাবছিলাম।'

'তোমার শরীর কত খারাপ হ'য়ে গেছে।' মা-র দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নির্মল। কুঁকড়ে যেন ছোটো হ'য়ে গেছে মানুষটা, অথচ বয়স আর এমন কী। ভারি মায়া হ'লো। টুনি ভালো মেয়ে, মাকে সে সুখী করতে পারবে।

সরোজিনী সস্নেহে হাসলেন, 'একা ঘরে আর মন টেঁকে না আমার।'

'বউ এলেই ঘর ভ'রে যাবে?'

'যাবে না? শ্রী ফিরবে বাড়ির, তুইও আর এতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবিনে।'

'আমি বুঝি ঘুরে বেড়াই?'

'তা একটু বেড়াস বৈকি। চাকরি কি তোর সারাদিনই?'

এর আর কী জবাব দেবে নির্মল, কথাটা তো সত্যিই। মা-র কাছে আর সে কতটুকু থাকে? মা ভাত বেড়ে ব'সে থাকেন, দয়া ক'রে এসে খায়, বিছানা পেতে রাখেন, অনুগ্রহ ক'রে শোয়। সত্যি, সন্তানের মতো অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর-কিছু না। কেবল নিয়েই খালাস। তারপর যেই পাখাটি গজালো অমনি উড়লো আকাশে। দিলো কী সে?

'শোন—' সরোজিনী ছেলের দিকে তাকালেন, 'হালদার-বাড়ির লাবিকে দেখেছিস বড়ো হয়েছে পরে?'

নির্মল বুঝলো, টুনির মা যে-কথা বলেছিলেন ধীরে-ধীরে এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছেন মা। বড়ো-বড়ো গ্রাসে সে ভাত খেতে-খেতে বললো, 'আমার কি এতোই ভাগ্য যে হালদার-বাড়ির মেয়েদের এই চর্মচক্ষে দেখতে পাবো।'

'তা, ঠিক।' সরোজিনী হাসলেন, 'ললিত হালদার একটু বেশিই পর্দানশিন। মেয়েদের একেবারে ঘরের দাওয়াটিতে পর্যন্ত পা বাড়াতে দেন না।'

'মেয়েরাও তেমনি আস্ত-আস্ত এক-একটা রাঙা আলুর বস্তা।'

'সে আবার কী?'

'একেবারে ভেড়া সব।'

'বলছিস কী?'

'অমন বিচ্ছিরি শাসন শোনে কেন মেয়েগুলো?'

'ও মা, গুরুজনের কথা শুনবে না? আর ললিত হালদার কি একটা যে-সে লোক? একটা বাঘ।'

'বাঘই। বাঘও নয়, রাক্ষস।'

'কী যে বলিস যা-খুশি তাই—'

'ঠিকই বলেছি, কিন্তু যাকগে, ললিত হালদারের কথায় আমাদের দরকার কী?' খাওয়া শেষ ক'রে জল খেলো নির্মল।

মা বললেন, 'দরকার একটু আছে বাছা। আমি ভাবছি ঐ লাবির সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি।'

'কেন, তারা কি বলেছে কিছু?'

'কত কথাই তো বলেছে।' উদাসভাবে নিশ্বাস ছাড়লেন সরোজিনী,

'আর বলতেই বা বাধা কী? বাড়াবাড়ি করতে কি তুই কম করিস?'

মা-র ইঙ্গিতটা বুঝেও না-বোঝার ভান করলো নির্মল, 'কিসের বাড়াবাড়ি?'

'সারাটাদিন প'ড়ে থাকিস প্রিয়-মাস্টারের ঘরে, লোকে ছাখে না?'

'দেখবে না কেন? আমি কি চোর নাকি যে চুপে-চুপে যাবো?'

'কী দরকার তোর ওদের ওখানে সারাদিন?'

'মাস্টারমশায়ের অসুখ না? আমি ছাড়া আর-কেউ যায় সেখানে?'

'সবাই নিন্দে করে তোকে।'

'কেন?'

'অত বড়ো একটা মেয়ে ঘরে। ওরাই বা কী? ওদেরও তো একটা কলঙ্কের ভয় আছে। মেয়ের বিয়ে দেবে না?'

'আমার যাবার সঙ্গে বিয়ে দেবার বাধাটা কোথায়?'

'দুর্নাম হয় যদি তোকে জড়িয়ে, তখন? কে বিয়ে করবে ঐ মেয়ে?'

'আমাকে জড়িয়ে দুর্নাম হ'লে অবিশ্যি আমারই দায়িত্ব।' বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়লো নির্মল।

ছেলে বড়ো বুঝের, এই মনে ক'রে খুশি হলেন সরোজিনী।

খেতে-খেতে ধাঁ ক'রে বাঁ হাতটা মা-র কাঁধে রেখে, যেন আচমকা মনে পড়েছে এরকম ভাবে, বললো নির্মল, 'তার চেয়ে এক কাজ করি না মা?'

'এই ছাখো, দিলি তো ছুঁয়ে, আবার চান করাবি আমাকে।'

নির্মল চোখ-ভরা হাসি নিয়ে জিব কাটলো, 'মনেই ছিলো না। আর

কেনই বা থাকবে? তুমি আমার মা না? তোমাকে আমি সব সময় ছোঁবো। আর মাছ বুঝি তুমি খাও নি কোনোদিন? নাড়ীভুঁড়ি ধুতে পেরেছো?'

'শোনো ছেলের কথা।' সরোজিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'বুড়ো ঢেঁকির কথা শুনলে রাগ হয় কিনা।'

নির্মলও উঠে দাঁড়িয়েছে, এবার ভালো ক'রেই বাঁ হাতে জড়িয়েছে মাকে, 'রাগও হয়, আবার শোনোও তো সব কথা। আরেকটা কথা শুনবে?'

ছেলের আদর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মাছের আঁশের গন্ধে তিনি নাকে কাপড় দিয়েছেন, 'সাধে কি বলি যে বিয়ে কর। এ-সব আর ঘাঁটতে পারিনে আমি।'

'বিয়ে করলেই বুঝি আর তোমাকে ঘাঁটতে হবে না?'

'না। আমি কেন ঘাঁটবো? তোর বউ তোকে রেঁধে দেবে। আমি তো একরকম ঠিকই করেছি, এখন তুই মেয়ে দেখে পছন্দ করলে সামনেই যে-তারিখ পাবো এক ক'রে দেবো দু-হাত।'

'যদি পছন্দ না হয়?'

'পছন্দ আবার হবে না। রং গোলাপ ফুলের মতো। আর ললিত বুড়ো দিতে-থুতেও কম দেবে না। মুরুব্বি পাবি একটা মাথার উপর।'

'আর তারপর গুণবান দাদাশ্বশুরের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় ব'সে ঘোঁট পাকাবো প্রিয় মাস্টারের বিরুদ্ধে, তার কালো মেয়েটার যাতে বিয়ে না হয়, ভাংচি দেবো জনে-জনে।'

'আহা। তা কেন?'

'তাই তো। তাছাড়া আর কী। একটা লোক পঙ্গু হ'য়ে প'ড়ে আছে তবু কেন ভিক্ষে করছে না বাড়ি-বাড়ি এই আক্রোশেই তো ম'রে যাচ্ছে

সারা গ্রামের লোক। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, তুমিও যোগ দিচ্ছো সেই সঙ্গে।'

'আমি কেন যোগ দিতে যাবো।'

'তা নয়তো কী? যে-লোকটা তাঁর সব চেয়ে শত্রু তার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা পাতাতে চাইছো।'

দ্বিধায় পড়লেন সরোজিনী। বুদ্ধি তাঁর প্রখর নয়, এমনিতে মানুষটা ভালো। সাতে নেই পাঁচে নেই, আছেন চুপচাপ নিজের ছেলে নিয়ে নিজে। দিন চ'লে যাচ্ছে সুখে-দুঃখে। তাছাড়া সত্যিই তো তিনি তাঁর ছেলের বিষয়ে প্রিয়নাথ মাস্টারের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর দুঃখের সব চেয়ে চরম দিনগুলোতেই তিনি বন্ধু হ'য়ে জড়িয়ে আছেন মনের মধ্যে। আর মেয়েটা! মেয়েটাই কি কম লক্ষ্মী নাকি? এসেছে, বসেছে কতদিন রেঁধে রেখে গেছে। এখন কালের প্রবাহে সবই ভুলে গেছেন তিনি, সেই সঙ্গে ওদেরও ভুলেছেন। কিন্তু তাই ব'লে তাদের শত্রুর সঙ্গে তো জোট পাকাতে পারেন না?

মায়ের এই দ্বিধান্বিত অবস্থার সুযোগ নিলো নির্মল, 'তার চেয়ে তোমাকে যাঁরা বিপদের দিনে করেছেন, তাঁদেরই তুমি একটা উপকার করো না।'

'আমি কী উপকার করতে পারি? আমার সাধ্য কতটুকু? তুই তো যা পারিস করিসই।'

'তাতে তো আরো অপকারই হয়। দুর্নাম হয় ওদের।'

'তাই তো।'

'তার চেয়ে আমি বিয়ে করি না টুনিকে।'

'কী!' সরোজিনী উপকারের তালিকা শুনে অবাক।

'কী আবার। টুনির মতো ভালো মেয়ে আর আছে নাকি তোমাদের

গ্রামে। সব ক'টা তো ঝগড়াটি আর হিংসুটি আর কুচুটে—' মা-র অপলক চোখের দিকে সে তাকালো। চোখ নামিয়ে নিলেন সরোজিনী। মুখ একেবারে আসন্ন বর্ষার আকাশের মতো থমথমে।

'কী হ'লো? রাগ করলে নাকি?'

জবাব নেই।

'বলো না।'

'আমার বলবার জন্যে কি তোমার কিছু আটকে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'এতোদিন ধ'রে যা-যা করেছো সবই বোধহয় আটকে ছিলো, না?'

'কী করেছি?'

'মাস্টারের সেবার নামে ভাব করেছিস মেয়েটার সঙ্গে। আবার কী!' এক ঝাপটা মেরে সরোজিনী রান্নাঘর ছেড়ে কুয়োতলায় এলেন, অন্ধকারে শুধু তাঁর দড়ি টেনে বালতি ফেলার আওয়াজ শোনা গেলো, ঝপঝপ ক'রে জল ঢালার দ্রুততায় বোঝা গেলো তাঁর উত্তেজনা।

তাঁদের পুকুর নেই। অনেকদিন আগে শুকিয়ে একটা ডোবা হ'য়ে আছে বাড়ির পেছন দিকে। গভীর ক'রে এই কুয়োটি নির্মলের বাবাই মরবার আগে খুঁড়িয়েছিলেন। সুন্দর টলটলে জল। সবাই বলতো মিঠে জল। গ্রামের লোক রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জলের চাইতেও এই জল পছন্দ করতো বেশি। গরমের সময় এই ঠাণ্ডা কুয়োর জলে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তো।

নির্মলও আঁচাতে এলো সেখানে। খোশামুদে গলায় বললো, 'তুমি অনর্থক রাগ করছো মা। ঘরে এসো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবো—'

'বুঝতে আমার কিছুই বাকি নেই বাছা। মাস্টারের কথা ধরছিনে,

তার বউয়ের কথাই ভাবছি। পরের ছেলেকে এমন ফাঁদ পেতে ধরতে কি ননীবালার বিবেকে একটুও আটকালো না? ছি ছি ছি। গ্রামের মধ্যে শেষে এই সব কেলেঙ্কারি কাণ্ড? মেয়ে দেখিয়ে ছেলে ভুলোনো? ম্লেচ্ছদের মতো দেখাশুনো ক'রে বিয়ে?'

নির্মল দিশাহারা। ভেবেই পায় না কী যুক্তিতে সে ঠাণ্ডা করবে মাকে। তাঁর অহেতুক সংস্কারকে সংস্কৃত করবে।

তারপর একদিন নয়, দু-দিন নয়, দিনের পর দিন চললো এই মন-কষাকষির পালা। মা কোনোরকমেই বুঝতে পারেন না যে-মেয়েকে নির্মল রোজ দু-বেলা দেখছে তাকে আবার বউ ক'রে ঘরে আনবে কেমন ক'রে? যে-মেয়ে ওর সঙ্গে বছরের পর বছর মাথার ঘোমটা ছেড়ে কথা বলেছে, নতুন ক'রে ঘোমটা টানবে কোন লজ্জায়? তিনি শুনেছেন সাহেব-মেমরা নাকি এমনি ক'রেই বিয়ে করে। তা তারা করুক। তারা হ'লো অন্য রকম। তাদের আবার ঘর, সংসার, আর বউ-গিরি। তাই ব'লে তাঁর ঘরে এই কাণ্ড? গ্রামের মাতব্বররা আছেন না? বিধবা মানুষ, সকলের দয়াতেই শান্তিতে আছেন, শেষে সকলকে খেপিয়ে অবশ প্রিয়নাথের কালো মেয়ে ঘরে এনে কি তিনি সাত হাত জলের তলায় ডুববেন? অবশ্য শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হ'লো তাঁকে। কী করবেন, সমাজ ত্যাগ করলেও ছেলে তো আর ত্যাগ করতে পারেন না? আর ছেলে তাঁর যেরকম জেদী। আবদার দিয়ে-দিয়ে অবিশ্যি তিনিই মাথা খেয়েছেন, এখন বুঝুন তার ফল।

তবু মন্দের ভালো, ভাবই করুক, যা-ই করুক, মেয়েটা নিতান্ত সুস্থির। একদিন বেড়াবার অছিলায় ভালো ক'রে দেখে এলেন গিয়ে। দেখেছেন তো কতবারই, তা ব'লে এখনকার দেখার সঙ্গে তো আর

তুলনা হয় না ? আর দেখে বেশ ভালোও লাগলো। বড়ো হ'য়ে অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে। কই, আগের মতো কালোও তো নেই, অথচ লাজুক আছে তেমনি।

মার মত পেয়ে খুশিতে সেদিন লাফাতে লাগলো নির্মল। মাকে দুঃখ দিতে কার ভালো লাগে ? মা-র অমতে, মা-র বিরোধিতায় কাজ করতে কোন ছেলের না মন খারাপ হ'য়ে যায় ? সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে ভালোবাসা হ'লো মা-র সঙ্গে তার। মা আর ছেলের সম্বন্ধ আরো যেন নিবিড় হ'লো।

সব ঠিক। কেবল টুনির মা বললেন, 'ছ-মাস পরে যখন তোমার চাকরি পাকা হবে, তখনই বিয়ে হবে। সেই তো ভালো। কী বলো ?'

নির্মল বললো, 'বেশ তো।'

'নির্মলের মা কিন্তু ভারি অস্থির হলেন, বললেন, 'কেন, ঘরে কি তোর খাবার নেই, তোর বউ এলে কি আমি তাকে একমুঠো ভাত দিতে পারবো না যে চাকরি পাকা না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ?'

নির্মল বললো, 'তা হোক, এতো তাড়াহুড়োর দরকারই বা কী ?'

'কী আবার। শুভকাজ ফেলে রাখার নিয়ম নেই শাস্ত্রে।'

'ফেলে রাখলে কী হয় ?'

'কত কিছু হয়। শেষে হয়তো হয়ই না। আর পেছনে কত শত্রু তার ঠিক আছে কিছু ?'

নির্মল হাসলো মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে, 'না-হ'লে তো তুমি খুশিই হবে, কী বলো ? তোমার তো আর মত ছিলো না।'

'অলুক্ষণে কথা আর বলিসনে, যা। মনে-মনে যাকে বউ ব'লে বরণ করেছি, তাকে তো ভালোও বেসেছি। না কি বাসি নি ? মুখে কি তোর কিছু আটকায় না ?'

মাকে আদর করেছে নির্মল, 'তুমি ভারি ভালো, মা। তুমি খুব ভালো।'

মা-র কাছে বললো বটে, দেরিই ভালো, কিন্তু দেরিতে তার নিজেরও মত ছিলো না। কিন্তু টুনির মা যখন বলছেন তখন আর কী করে সে? তবু পরের দিন গিয়ে বললো, 'মা বলছেন, অত দেরি না-করাই ভালো?'

বলতে দারুণ লজ্জা করলো তার, মানে তারও। স্বভাবত লজ্জা-শরম নির্মলের একটু কমই, মা তো সব সময়েই বলেন, 'বেহায়া। নিজের বিয়ের কথা আবার নিজে বলে নাকি অত?' তা কী করবে, নিজেই যেখানে নিজের গুরুজন সেখানে লজ্জার ধার ধেরে কী লাভ?

টুনির মা মুখ মলিন করলেন, 'এই ক'টা দিন তুমি দিদিকে সবুর করতে বলো বাবা। আমার তো মেয়ের বিয়ে, একটু তো সাধ-আহ্লাদ আছে। একটু সময় দাও আমাকে।'

সময় পেলেই তিনি যে সাধ-আহ্লাদ পুরোবার কী সম্পদ জোগাড় করতে পারবেন বুঝতে পারলো না নির্মল। তবু চুপ ক'রে রইলো। তিনি দাতা, সে গ্রহীতা, জোর খাটাবার তার অধিকার নেই।

মাকে সে বোঝালো। মা বুঝলেন। বললেন, 'আহা, তাই তো, আপন বুকের ধন, জন্মের মতো পরের হাতে তুলে দেবে, সময় তো চাইতেই পারে। তা বাপু থাক, আর তাড়াহুড়া ক'রে কাজ নেই। ছ-মাস আর কী, দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবে।'

ফুরিয়েই গেলো। শুধু সময়ই ফুরোলো না, সবই ফুরোলো। আর এতোদিন পরেও সেই ফুরিয়ে যাবার যন্ত্রণাময় স্মৃতিটা ছাইচাপা আগুনের মতো সামান্য ভাবনার বাতাসেই তপ্ত হ'য়ে উঠলো নির্মলের বুকে।

প্রথম ফুরোলেন তার মা। কিছুই না, বলতে গেলে। একটু বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হ'লো কি হ'লো না, বুকে ঠাণ্ডা ব'সে তিনদিনের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গেলেন তিনি। ভালো ক'রে কিছু বুঝতেই পারলো না সে, চিকিৎসা পর্যন্ত করাবার সময় পাওয়া গেলো না। মেয়েদের মতো বুকে মাথা রেখে জোরে-জোরে কাঁদলো। মা ছাড়া যে আর কিছুই ছিলো না তার।

কাটলো ছ-মাস। চাকরি পাকা হ'লো। মাইনেও বেড়ে দ্বিগুণ হ'য়ে গেলো। এবার বিয়ে।

কিন্তু টুনির মা বললেন, 'আর ক'টা দিন সবুর করো বাবা।'

নির্মল অবাক। আরো সবুর করতে হবে? ননীবালা কি জানেন না তার মাতৃহীন, স্ত্রীলোকহীন একা বাড়ি তার পক্ষে কত কষ্টের। বরং তাঁরই তো নিঃসঙ্গ নির্মলের কাছে তাড়াতাড়ি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। একটু গম্ভীরভাবে বললো, 'আমার রোজ এখানে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধে হয়। তখন মা ছিলেন, আসতাম, এখন প্রত্যেকদিন এখানে আসা-যাওয়ার কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি সকলের কাছে?'

'সবই তো বুঝি, তবে একটু অসুবিধে আছে কিনা, মানে—' দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি।

এবার নির্মল ম্লান, গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকে দূরের দিকে।

এদিকে প্রিয়নাথবাবুর অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে। পুঁজি ভাঙিয়ে আর ক'দিন চলে। বলতে গেলে সমস্ত ভারটাই নির্মলের উপর পড়লো এসে। দরকার হ'লে মাইনের বেশির ভাগটা তো সে দিতোই, এমনকি নিজের সিগারেটের খরচটি পর্যন্ত তুলে দিতে হ'তো কোনো-কোনো মাসে। কী ভেবেছিলেন তিনি তখন? এখনকার নির্মল কণ্ডাক্টর ভাবলো মনে-মনে। কেন তিনি ক্রমাগত টালবাহানা ক'রে-ক'রে পিছিয়ে

দিচ্ছিলেন, বিয়েটা করলে টুনিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আলাদা হ'য়ে যাবে সে, আর আলাদা হ'লে তাঁদের কী হবে ? এই কি ছিলো তাঁর মনের কথা? যে-কর্তৃত্ব তিনি এখন চালাচ্ছেন নির্মলের উপর, জামাই হ'লে, মেয়েকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে আর কি শেষে শাশুড়িকে ততো মানবে ? না কি সব টাকা এনে এমন নিঃশেষে তুলে দেবে তাঁর হাতে ? এই কি তখন ভেবেছিলেন টুনির মা ননীবালা। কী ? কী ভেবেছিলেন ? গলির মাথার উপরে অনন্ত আকাশের অজস্র তারায় তাকিয়ে এ-কথা আজ ভাবলো নির্মল।

গ্রাম থেকে তার কাজের জায়গা বড়ো সহজ দূরে ছিলো না। ট্রেনে গেলে দুই স্টেশন পরে। মাঠ-ঘাট ভেঙে পাগলের মতো সাইকেল চালিয়ে সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি চালায়। তার স্বাস্থ্য ব'লেই শীতে গ্রীষ্মে এই হাড়-ভাঙা পরিশ্রম সহ্য হয়, অন্য কেউ হ'লে হয়তো পারতো না। মা-র মৃত্যুর পরে ছেড়ে-যাওয়া বাড়ির তালা-বন্ধ একা-ঘরে সত্যি আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না। টুনি এলে ঘর-বাড়ি আবার আলোকিত হ'য়ে উঠতো, নষ্ট হ'য়ে যেতো না জিনিসপত্রগুলো। ও-ই সব ঠিক-ঠাক ক'রে যত্ন ক'রে রেখে দিতো। এখন ওখানকার মেসেই খায় ব'লে, খেতে আসা বাবদ দুপুরকার ছুটিটুকুতে আর সে এখানে আসতে পারে না। সমস্ত দিনের পরে, কাজ সাঙ্গ হ'লে সন্ধ্যার অন্ধকারে চ'লে আসে ক্লান্ত দেহে। আর এলেই কি সে টুনিকে দেখতে পায় ? কত কর্তব্য আছে। আছে মাস্টার-মশায়ের বিছানায় ব'সে দুটো কথা ব'লে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া, ননীবালার দুঃখের ফিরিস্তি শোনা, তারই ফাঁকে দুটি করুণ কাতর দুঃখী চোখের চকিত পরশ।

শেষ পর্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো নির্মল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে

গিয়েছিলো। একদিন রীতিমতো জোর দিলো সে গলায়, 'আমি আর দেরি করতে পারবো না।'

টুনির মা অমনি বললেন, 'তোমার মা মারা গেছেন মাত্র কয়েক মাস, সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী, একটা বছর তো তোমার অশৌচ পালন করা উচিত ?'

'ও-সব আমি মানি না।'

'হিন্দুর ছেলে, একটু-আধটু মানতে হয় বৈকি বাবা।'

উদ্ধত হ'য়ে জবাব দিলো নির্মল, 'যা মানি না তা মানিই না। আপনি যদি অন্য কারণে বিয়ে পেছিয়ে দিতে চান সে-কথা আলাদা, কিন্তু এটা আমি মানবো না।'

'গ্রামের লোকেরা বলবে কী ?'

'বলাকে কি আপনি খুব ভয় পান ? অনেক কথা তো এখনো বলছে।'

টুনির মা মুখভার করলেন, 'আমরা সাবেকি লোক, ও-সব অশৌচের ব্যাপার না-মেনে পারি না।'

নির্মল একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমার মা-র মৃত্যুর আগেও তো সব ঠিক হ'য়ে পাঁচমাস কেটেছে, তখনো তো আপনার আপত্তি ছিলো। মা-র কত ইচ্ছে কত সাধ অপূরণ থেকে গেলো, আমি তো ভাবছি মা-র প্রথম বাৎসরিক কাজে, টুনিরও কাজ থাক কিছু। হয়তো স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি হবে তাঁর।'

টুনির মা এর কোনো জবাব না-দিয়ে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আর কী-যে রাগ হ'লো নির্মলের, বলা যায় না। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলো সে। বেরুবার মুখে, অন্ধকারে মাধবীতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান টুনিকে সে দেখেও দেখলো না, কেবল তার মৃদু গলার ভীত চকিত করুণ ডাকটি ভেসে এলো পেছনে, 'শোনো।'

যুদ্ধ লেগেছে তখন। চারদিকে এই কথা, এই প্রসঙ্গ, এই আলোচনা। দিগ্বিদিকে টাকা ছড়ানো, চাকরি ছড়ানো, ভয় ছড়ানো। দিকে-দিকে লোক ছুটছে, হাঁটছে, খাটছে, তাঁবু বানাচ্ছে, এরোড্রামের কনট্রাক্ট নিয়ে লক্ষপতি হচ্ছে। যাচ্ছে সৈন্য হ'য়ে, যাচ্ছে ডাক্তার হ'য়ে, যাচ্ছে সেবক হ'য়ে। জাপানি বোমা পড়লো ব'লে কলকাতা শহরে। তারপর আর কী! গেলো সব। নগর, গ্রাম, বাণিজ্য, বন্দর সব ছাতু।

হঠাৎ নির্মলও একদিন গিয়ে যুদ্ধের চাকরিতে নাম লিখিয়ে এলো। প্রত্যহের এই প্রতীক্ষার ভার থেকে তো অন্তত বাঁচা যাবে। অবিশ্যি সবটাই যে রাগ ছিলো তা নয়, টাকার মোহও মন্দ ছিলো না। তারপর কাউকে না-জানিয়ে একেবারে সব ঠিক ক'রে এসে খবর দিলো টুনির মাকে।

আতঙ্কিত হ'য়ে টুনির মা বললেন, 'সে কী?'

'কী আর।' আত্মপ্রসাদে হাসলো নির্মল। 'আপনাদের ভালোই হ'লো।'

'ভালো হ'লো? তুমি গেলে কে দেখবে?'

'টাকা পাঠাবো বেশি ক'রে। টাকারই তো মূল্য।'

প্রিয়নাথবাবু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললেন, 'টাকাই কি বাবা সব?'

'অনেকখানি তো।'

'না, না, কিছুই না।' তিনি হাত চেপে ধরলেন আবেগে, 'তুমি কাছে না-থাকলে আমার কিছুই কিছু না।'

'আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? কোনো অসুবিধে হবে না।'

টুনির মা-র মুখে ছায়া পড়েছে, চিন্তার ঘন রেখায় কুঁচকে গেছে কপাল। দ্রুত গলায় বলেছেন, 'তবে বিয়ে ক'রে যাও।'

'আর সাতদিনের মধ্যেই আমাকে রওনা হ'তে হবে, কাকিমা।

এখন আমার বিয়ে করার সময় কোথায়। আর তাছাড়া যারা যুদ্ধে যায় তাদের জীবনের সঙ্গে কি অন্য জীবন জড়ানো উচিত ?'

'নিমু, এ তুমি কী করলে—' প্রায় চোখে জল এসে গেছে ননীবালার। হয়তো এতোদিনের স্বার্থপরতার কথা ভেবে একটু অনুতাপও হয়েছিলো মনে-মনে, কে জানে। নির্মল কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলো এই আঘাতটা দিতে পেরে।

কিছুদিন থেকে মনে-মনে টুনির উপরেও একটা গভীর অভিমান জমা হচ্ছিলো তার। সেও তো কিছু বলতে পারে। জোর দিতে পারে মাকে। কেন এতো মেনে নেয় ? কিসের এতো লজ্জা ? আসলে নির্মলের দুঃখটা তার কিছুই নয়। নির্মলের কোনো কষ্টই তার কষ্ট নয়।

আজ মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। সে-বেচারার দোষ কী ? তার মতো ভীরু শান্ত মেয়ে, অমন প্রচণ্ড মা-র বিরুদ্ধে কী করতে পারে ? সে নিজেই বা পারছিলো কই ?

ফেরবার সময় দেখা করবার নীরব নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে চুপ ক'রে দাঁড়াতেই টুনি একেবারে বুকের কাছে এসে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো। ঠিক এতোখানির জন্য প্রস্তুত ছিলো না নির্মল। এইটুকু থেকে বড়ো হ'তে দেখলো সে, লজ্জায় মুখ তুলতেই যে লাল হ'য়ে যায়, দুঃখের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে থাকতেই যে অভ্যস্ত, হঠাৎ তার এই আবেগ নির্মলের সারা হৃদয় মথিত ক'রে দিলো।

বাড়ির পিছন দিককার নিরালা পুকুরের ধার, ঝোপঝাড়, হিজলের ডাল আর শ্যাওলার রাজত্ব। বুনো ফুলের মাঝে, বেল কামিনীর মিঠে-মিঠে গন্ধ, চারদিকের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উদ্বেলিত নির্মল সহসা দুই হাতে তাকে জাপটে নিলো বুকের মধ্যে, ঘন চুলে ভরা মাথাটার

উপর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললো, 'এই ভালো, এই ভালো। কাছাকাছি থেকে আর আমি পারছিলাম না ছেড়ে থাকতে।'

'না, না, না। তুমি যাবে না। তুমি যাবে না।'

টুনির সেই কান্নাভরা বেদনার গুঞ্জন দিকে-দিকে ভেসে বেড়ালো, নির্মলের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো নিজের আহাম্মক রাগের জন্য। একটা হালভাঙা নৌকোর মতো শিথিল হ'য়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টুনির কেঁপে-কেঁপে-ওঠা মাথাটায় ক্রমাগত হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর অবিশ্যি অনেক চেষ্টা করেছিলো সে এ থেকে মুক্তি পাবার। কিন্তু পারলো না। যুদ্ধের চাকরিতে একবার নাম লেখালে কি আর তার উচ্ছেদ আছে ?

প্রিয়নাথবাবু হাহাকার ক'রে উঠলেন, ননীবালাও চোখ মুছলেন আঁচলে, নির্মল নিজেও স্থির থাকতে পারলো না, একমাত্র টুনিই চুপ।

যাবার আগের দিন সারা বেলা কাটালো সে তাদের সঙ্গে, ননীবালা মেয়েকে বিশ্রাম দিলেন সেদিন, নিজেই রান্না করলেন নানারকম, ব্যথিত গলায় বললেন, 'মাঝে-মাঝে ছুটি আছে তো ?'

খেতে-খেতে নির্মল বললো, 'তা হয়তো আছে।'

'যে-কোনো একটা ছুটিতে এসে বিয়ে ক'রে যেয়ো।'

কোণে পুতুলের মতো নিঃশব্দ নিস্পন্দ টুনির দিকে তাকিয়ে নির্মল বললো, 'এতো ভাবছেন কেন। কত লোক যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ছুটি তো হামেশাই পাচ্ছে তারা।'

ননীবালা বললেন, 'তবু তো ভয় করে।'

'ভয় কিছুই নেই। বরং প্রচুর টাকা নিয়ে একদিন যখন ফিরে আসবো, কত ভালো লাগবে আপনাদের।'

ঘরের জানালার কাছে তাকিয়ে-থাকা প্রিয়নাথবাবুর গলা পাওয়া গেলো, 'তাই তো। টাকাই তো সব।'

যাবার সময় টুনির কাছে বিদায় নিলো নির্মল, 'তবে যাই ?'

টুনি চুপ।

'ভালো থেকো।' কান্নাকে ঢোঁক গিলে বুকের ভেতরে পাঠিয়ে দিলো সে।

টুনি চুপ।

'টুনি !'

সাড়া নেই।

'কথা বলো।'

মানুষটার কি প্রাণ নেই ? কাঁধের উপর দুই হাত রেখে চোখে-চোখে তাকালো নির্মল। চারটি চোখের অপলক দৃষ্টি যেন অনন্ত কালের জন্য থেমে রইলো। তারপর কখন মেঘ গ'লে বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টির অবিরল ধারায় নির্মলের নতুন-কেনা শার্টের বুক চুপচুপে হ'য়ে ভিজে গেলো কখন কে জানে। ঝড়ের দাপটে ব্যাকুল গাছের মতো ছটফট করতে-করতে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো টুনি, 'তুমি যেয়ো না, যেয়ো না।'

আর তারপর ?

তারপর আজ এই। এই তো ব'সে সরু গলিটায়, এই তো ব'সে-ব'সে যা নেই, তার জন্যই সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল ক'রে ঘুমকে বিদায় দিয়েছে, যা ছিলো তার যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, রাস্তায়, আকাশের তলায়।

কিন্তু টুনি ! তুমি কি আজ সব ভুলে গেলে ? সব ? এক কণা স্মৃতিও কি নেই আর তোমার মনের মধ্যে ? কিছুই নেই ?

রাত হয়েছে। দু-একটা রিকশর টুংটুং, নির্জন বেড়ালের পা টিপটিপ, আর কুকুরের ঘেউঘেউ। গোরুটা জাবর কাটতে-কাটতে কখন ব'সে পড়েছে, গলি জুড়ে ছাগলগুলো শুয়েছে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে, আর নির্মল ভাবছে রাত শেষ হ'য়ে আবার আলো ফুটবে কখন।

এই কলকাতা শহরে আবার কি কখনো আমি তাকে দেখতে পাবো না? কতটুকু শহর? এর মধ্যে খুঁজে-খুঁজে কি আবার বার করতে পারবো না সেই মুখ? কখনো কি আর দাঁড়াতে পারবো না সেই সুন্দরী সুগন্ধি মেয়েটির মুখোমুখি? চোখে চোখ রেখে একবার জিগ্যেস করতে পারবো না কোনোদিন সে চিনতো কিনা এই হতভাগাকে, যে-হতভাগ্যকে দেখে আজ তার ঘৃণা নেমেছে চোখে, লজ্জাবোধ হয়েছে সুবেশ ভদ্রলোকটির পাশে ব'সে একদা চিনতো ব'লে। যে-হতভাগ্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পাগলের মতো তাকেই খুঁজে বেড়িয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো সে। একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো, তারপর হাঁটতে লাগলো কী জানি কোনদিকে। হাওয়া দিলো ফুরফুর ক'রে। এই গলিতেও ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য। সে আছে। আছে। এই তো মাথার উপর আছে জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ, চোখের উপর তারা, আর নির্মল কণ্ডাক্টরের অখিল মিস্ত্রি লেনের এমন এঁদো পচা মেসের গলিতেও তার ঠাণ্ডা নিশ্বাস। তার আশীর্বাদ।

দ্বিতীয় খণ্ড

. . . . এক

পরিপূর্ণ হ'য়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে, ঝকঝক করছে কলকাতা শহর। পিচের রাস্তায় গাছের ছায়া। মানসী বাস্ থেকে নেমে তার ঝুলন্ত খোঁপায় রং-করা আঙুল বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। সোমেশ্বর বললো, 'সুন্দর হাওয়া দিয়েছে, না ?'

মানসী তেমনিই সামনের চ'লে-যাওয় বাস্‌টার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলো, 'হুঁ।'

'কী করবে ? হেঁটেই যাবে, না একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ধরবো ?' বড়ো রাস্তা থেকে সামান্যই দূর মানসীর বাড়ি। হাঁটা কিছুই কঠিন নয়, কিন্তু সে-অভ্যেস তার নেই। গাড়ি এখনো কেনে নি সে, কিন্তু যাদের গাড়ি আছে তারা আছে তার দরজায়। তাছাড়া এখানে-ওখানে যখনই গানের ডাক পড়ে গাড়ি তো তারাই দেয়। কাজেই বাস্ ট্রাম রিক্শ, হাঁটা কোনোটারই আর দরকার হয় না তার।

অন্যমনস্ক মানসী আবার বললো, 'হুঁ।'

সোমেশ্বর অবাক হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'হুঁ কী ? কী দেখছো তুমি অমন ক'রে ?'

কী দেখছে ? মানসী নিজেও যেন ভাবলো সে-কথাটা। নামবার সময় যে-লোকটা হুড়মুড় ক'রে পিছন-পিছন তু-চোখ দিয়ে ধাওয়া করেছে, মুখোমুখি না-দেখলেও সে-লোকটার অসভ্য দৃষ্টি অনুভব ক'রে রাগে সারা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠেছে তার, তাকে দেখছে নাকি ? না কি চলন্ত বাসের ল্যাণ্ডিং-এর একেবারে প্রান্তে, হাতের মুঠোয় একটুখানি

ভর রেখে শরীরের প্রায় সবখানিই বা'র ক'রে দিয়েছে যে-লোকটা, আর একটু হ'লেই যে-লোকটা প'ড়ে যেতো তার পায়ের কাছে, একটা ল্যাম্পপোস্টের চকিত আলোয় তার মুখখানা দেখেই সে থমকেছে? বুঝে উঠতে পারলো না ঠিক। দোতলা লেল্যাণ্ড ডেকার, রাজার মতো গর্বিত ভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ বাঁক ফিরে যত দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেলো তার চোখ থেকে, তত দ্রুত একটা কিছু ভুল দেখতেই বা বাধা কী? তবে কি মানসীর মনের গভীরতম প্রদেশে এখনো কোনো একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন ছায়া ফেলে রেখেছে? কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলগা ক'রে রেখেছে একটুখানি জায়গা? যে-জায়গাটুকু সবুজ ঘাসের আস্তরণে এখনো শ্যামল। নয়তো আজ হঠাৎ চমৎকার পার্টির পরে, চমৎকার গান গেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে অতিশয় ধনবান ভাবী স্বামীর সঙ্গে এমন নিরালা নির্জন রাতে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে এই ভ্রান্তি হবে কেন চোখের? সোমেশ্বরের কথায় হাসলো একটু, মৃদু গলায় বললো, 'কিছু না।'

'লোকটাকে ধ'রে চাবকানো উচিত।'

শিহরিত হ'য়ে মানসী বললো, 'কাকে?'

'কাকে আবার! ঐ লোফারটাকে। কী ভাবে ঝুলে পড়েছিলো দেখেছো?'

'চেনা-চেনা লেগেছিলো বোধহয়।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগলো মানসী।

'তাহ'লে হেঁটেই যাবে?'

'আহা। এটুকু আবার হাঁটবো না তো গাড়ি চড়বো নাকি?'

'তাই ভালো।' সোমেশ্বর গদ্‌গদ হ'লো, 'এসময়ে হাঁটতেই ভালো লাগে। আর তোমাদের পাড়াটিও সুন্দর।'

'তা ভালোই।'

'একখণ্ড জমি তো কিনেছি লেকের ধারে, দেখি এ-বছরের মধ্যে তুলে ফেলতে পারি কিনা বাড়িটা।'

'আমাকে ভাড়া দেবেন তখন।'

'তাই তো। সেই ভাড়ার টাকাটা আবার নিজের আঁচলের চাবি দিয়ে নিজের আলমারিতেই তুলতে হবে তোমায়, মন্দ কী!' রসিকতা ক'রে খুব হাসলো সোমেশ্বর। আর মানসী ইঙ্গিতটা বুঝে চুপ ক'রে রইলো।

'মানসী,' সোমেশ্বরের গলা বেশ গাঢ় হ'লো এবার, 'আর আপত্তি না-ক'রে তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলো, কেমন?'

মানসী আস্তে বললো, 'বেশ তো।'

'অন্তত লোকজন ডেকে একটা উৎসব তো হ'য়ে যাক, তারপর না-হয়—'

'তাই তো।'

'তোমার যেন কিছুতে মন নেই। কেন বলো তো? এই তো খানিক আগেও কত মূড়ে ছিলে।'

'কই, না তো।' সমস্ত চিন্তার জটে একটা ঝাঁকানি দিলো মানসী। বাসের অগুন্তি লোকের মধ্যে কে-একটা লোকের মুখে কী ভুল সে দেখেছে তার ঠিক নেই, আর তাই নিয়ে কী সব বাজে চিন্তা। নিজেকেই নিজে চোখ রাঙালো। যার চেহারা ভালো ক'রে মনে নেই তাকে ভেবে কেবল সময়ের অপব্যবহার। শেষ তাকে কবে ভেবেছে মানসী, তাই কি মনে পড়ে আজ? ছেলেবেলাকার এক ভাঙা পুতুলের স্মৃতি। স্মৃতি স্মৃতিই। তাই নিয়ে মানসীর মন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে পিছু হটতে চায়? পেছনে কী আছে? কেবল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কতগুলো যন্ত্রণার ইতিহাস। না, না, আর আমি ফিরে তাকাতে

চাই না। যা গেছে তা গেছে, যা হয়েছে তা ঠিক হয়েছে। হবার জন্যই যায়।

'মণি।'

বুকটা ধড়াস করলো মানসীর। সোমেশ্বরের আবেগভরা গলা নীরব রাস্তায় ভয় ধরিয়ে দিলো তাকে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন দয়া ক'রে, মা হয়তো ভাবছেন কত কিছু।'

'কিচ্ছু ভাবছেন না।' একেবারে গা ঘেঁষে পাশে-পাশে হাঁটলো সোমেশ্বর, 'তিনি জানেন তাঁর মেয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটির হাতেই আছে।'

তা ঠিক। সে-কথা মানসীও জানে বৈকি। দেরি করলে চিন্তা করা তো দূরের কথা, সারারাত না-ফিরলেও কি তিনি খুব বেশি বিচলিত হবেন? বরং তাঁর বোকা মেয়ে একটু চালাক হয়েছে ভেবেই আরো নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন পায়ের উপর একটি পাৎলা চাদর টেনে দিয়ে।

তবু সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো, প্রায় ঝড়ের বেগে। ভারি সোমেশ্বর হয়রান হ'লো তাতে। মানসী পাৎলা মেয়ে, সারা শরীর তার পুষ্ট কিন্তু এতো পুষ্ট নয় যাকে মেদ বলে, কাজেই দৌড়তেই বা তার কষ্ট কী? কিন্তু সোমেশ্বর তা পারে না। শুধু তো শরীরের ভারই নয়, দৌড়ে, ছুটে, হাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে তাকে কি কখনো কোনো কাজ করতে হয়েছে আজ পর্যন্ত? কলকাতার বনেদি বড়োলোক তারা, বাপ-দাদার সম্পত্তি গিয়ে-গিয়েও যা আছে তাতেও নাতি পর্যন্ত কেটে যাবে সুখে। না-হয় রোলস রয়েসের বদলে আজকাল হিন্দুস্থান গাড়িতেই পর্যবসিত হয়েছে অবস্থা, তবু এই বাগচিরা বাগচিই। এই তো সেদিন বাপ মারা গিয়ে স্বাধীন ক'রে গেলেন তাকে। ভাগ্যের সুলগ্নে সে একমাত্র পুত্র হ'য়েই জন্মেছিলো, সবই তার, আর তা একা তার পক্ষে যথেষ্ট।

....দুই

গান-বাজনার উপর ঝোঁক বাগচিদের বংশানুক্রমে। চতুর্থ পুরুষ আগে সোমেশ্বরের প্রপিতামহের বাপ রত্নেশ্বর বাগচির আমলে ভারতবর্ষের সব চেয়ে বিখ্যাত ওস্তাদদের সম্মেলন হ'তো বাড়িতে। পুজোর সময় আর জন্মাষ্টমীর সময় একপক্ষকাল পর্যন্ত চলতো সেই উৎসব। হাজার হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে যেতো ঐ ক'দিনে। রত্নেশ্বর নিজে ছিলেন মস্ত মৃদঙ্গ-বাজিয়ে, বড়ো-বড়ো ধ্রুপদীদের সঙ্গে বাজিয়ে হয়রান ক'রে দিতে পারতেন, রাতের পর রাত বাজিয়ে একফোঁটা ক্লান্ত হতেন না। আর-কোনো নেশা ছিলো না তাঁর, শুধু এই। আর তাঁর ছেলে বীরেশ্বর শুনতেন বাইজির গান, মশগুল হ'য়ে থাকতেন বাগানবাড়িতে, চুর হ'য়ে থাকতেন নেশায়, লাশের মতো গৌরবর্ণ মোটা শরীরটা টেনে তুলে খাস-চাকর রামকিঙ্কর তাঁকে নিয়ে আসতো ভোর-রাত্রে বাড়িতে, ডুরে শাড়ি-পরা, ঘোমটা-টানা ছোটো বউ, ফোলা-ফোলা ঘুমভাঙা, কান্না-রাঙা চোখে দরজা খুলে দিতো শোবার ঘরের। তারপর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতো, চন্দন-পাখার বাতাস দিতো, হাত বুলিয়ে দিতো পায়ে, বীরেশ্বর আমেজ ক'রে ঘুমুতেন। তারপরে রামেশ্বর। সোমেশ্বরের ঠাকুরদা। তত-দিনে জমিদারির তেজও যেমন ক'মে এসেছে, আধুনিকতার হাওয়াও বইছে তেমনি জোরে। তিনি আমূল পরিবর্তন ক'রে ফেললেন সব। ফরাস-তাকিয়ার বদলে পাতলেন সোফা-সেটি, গলায় তুলসীর মালা ফতুয়া গায়ে ম্যানেজার তারিণী সরকারের বদলে এক স্যুট-বুট-পরা ছোকরাকে নিয়ে এলেন জমিদারির রাশ টানতে। ছিপছিপে চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, জলজ্বলে চোখ, বিলেতের জল খেয়েছে সাত বছর। ব্যয়-বাহুল্য কমিয়ে, বাগানবাড়ির পাট উঠিয়ে আবার গুছিয়ে নিলেন সব রামেশ্বর। পাঁচ মেয়ের পর এক ছেলে সুরেশ্বরকে বিলিতি ইস্কুলে

পড়ালেন। আর সুরেশ্বরের ছেলে এই সোমেশ্বর। সে তার পিতার চেয়ে আরো বেশি অগ্রসর। কলেজের গণ্ডিও ডিঙিয়েছে সে, ঘুরে এসেছে বিলেত থেকে। দেনার দায়ে তিনটে বাড়ি বিক্রি হ'লেও, শ্যামবাজারের বসতবাড়িটা সেখানে তেমনি অটুট চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মাথায় গোল গম্বুজ নিয়ে। গম্বুজের মাথায় এখনো তেমনি আলো জ্বলে, সেই আলো বহুদূর থেকে দেখতে পায় লোকেরা, বলে, রাজবাড়ির আলো। মস্ত ফটকের ভেতরে তাকালে প্রথমেই মাঠের মাঝখানকার মোটা লোহার চেনে আবদ্ধ সবুজ লন্‌টা চোখে পড়ে, চারদিকে রং-বেরঙের ফুলের বর্ডার, আর সেই লনের ঠিক মধ্যিখানে, মস্ত সিংহমুখ ফোয়ারা থেকে ছিটকে-ছিটকে জল পড়ে সারাদিন। এপাশে-ওপাশে গোল হ'য়ে ঘুরে গেছে লাল সুরকির রাস্তা, একেবারে একতলা সমান উঁচু বাড়ির শ্বেত-পাথরের বারান্দার পায়ের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ধাপে-ধাপে উঠে গেছে প্রশস্ত সিঁড়ি, এতোদিন এই বাড়িতেই বাস করেছে সোমেশ্বর, এই সিঁড়ি দিয়েই নেমে এসে হিন্দুস্থান গাড়িতে চ'ড়ে হাওয়া খেতে গেছে, গেছে বড়ো-বড়ো হোটেলের নির্দিষ্ট কামরায়, অনেক রাত হ'য়ে গেছে বাড়ি ফিরতে। তাকে নামিয়ে দিয়েই গাড়িটা গেটের বাঁ-দিক জুড়ে পাশাপাশি চারটে গ্যারেজের একটাতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে আবার কালকের রাত জাগবার ধকল সহ্য করবার জন্য। কর্তাদের আমলে এই ঘরগুলোতে ঘোড়া থাকতো শোনা যায়, হাতিও নাকি ছিলো দুটো। কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িতে মোটা লোহার শিকলে বাঁধা থাকতো সারাদিন, সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতো। এখন সে-যুগ নেই, সোমেশ্বরের ঠাকুরদার আমল থেকেই মোটর গাড়ির চল হয়েছে। হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া— এ-কথাগুলো এখন স্বপ্নের কথা। সেই ঘরগুলোর চেহারাই কি এরকম ছিলো? এই গ্যারেজের

মতো ? না কি সেই সব ব্রুহাম-ফিটনের সহিসরাই এই খাকি প্যাণ্ট আর বুশশার্ট-পরা ড্রাইভারদের মতো নিরলংকার ছিলো।

এই বাড়িটাও অবিশ্যি কিছুদিন থেকে পছন্দ হচ্ছিলো না সোমেশ্বরের। বড়ো পুরোনো ধরনের। বাড়ির অধিবাসীদেরও সহ্য হচ্ছিলো না। কিন্তু যদ্দিন সুরেশ্বর বাগচি বেঁচে ছিলেন, থাকতেই হয়েছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরেও ছিলো কিছুদিন, কিন্তু মানসীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেই ছেড়ে দিলে। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমা রইলেন সেখানে ভিটে আগলাতে, আর রইলো তাঁর বিধবা মেয়ে, অর্থাৎ সোমেশ্বরের একমাত্র পিসি তাঁর তেরোটি সন্তান নিয়ে, আর রইলো রাশীকৃত আশ্রিত-আশ্রিতার দল। সোমেশ্বর মাসোহারা দিয়ে চুকিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা। নিজের মা মারা গিয়েছিলেন শিশুবয়সে, নিঃসন্তান সৎমা আছেন কাশীতে, তাঁর মাসোহারাও যায় জমিদারি থেকে— আর সে নিজে শ্যামবাজারের পচা রাস্তা আর পুরোনো বাড়ি ছেড়ে এসে উঠেছে কুইনস পার্কের মস্ত এক ফ্ল্যাটে। আছে হাত-পা ছড়িয়ে স্বাধীনভাবে। বয়স ভারি হ'য়ে এসেছে, চুলের রং তামাটে হয়েছে, বাঙালির পক্ষে প্রায় অস্তমিত যৌবন। এতোদিন বিয়ে করে নি কেন তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। কেউ বলে সেটা বিলেতে থাকতেই সেরে এসেছিলো, কেউ বলে কৌমার্যই তার চিরব্রত। আবার কেউ-কেউ বলে বুড়ো বয়সে সুরেশ্বর বাগচি ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নাকি নিজেই বিয়ে ক'রে এনেছিলেন, সেই থেকেই এই ভীষ্মত্বপ্রাপ্তি। তা যা-ই হোক, এখন সে মানসীর জন্য বুক বিছিয়ে দিতে পারে রাস্তায়, জমিদারি লাটে উঠিয়ে সন্ন্যাসী হ'তে পারে। এই কোকিলের মতো গলার মেয়েটির জন্য সে না-করতে পারে কী ?

গান ! গানই পাগল করেছে তাকে। গানের জন্য আলাপ করেছে খুঁজে-খুঁজে, গানের জন্যই এই মেয়েটির আকর্ষণ আজ পর্যন্ত ছাড়াতে

পারছে না। তা নৈলে এই মেয়ের বিমুখতাই কি সে কম সহ্য করেছে? এই তো, এই যে দৌড়ে-দৌড়ে হাঁটছে সে, তার পেছনে ছুটতে কি কম কষ্ট হচ্ছে তার? দুধের মতো মসৃণ গায়ের রঙে ঝলকে-ঝলকে রক্ত দেখা যাচ্ছে, দুই ভাঁজ থুৎনির ফাঁকে অকথ্য ঘাম।

বাড়ির দরজায় কলিং-বেলে হাত রেখে হাঁফ ছাড়লো মানসী দত্ত-মল্লিক। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর নামলো তার। মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আপনার কত কষ্ট হ'লো হাঁটতে।'

ঘাড়ে গলায় রুমাল ঘষতে-ঘষতে সোমেশ্বর সংশোধন করলো, 'হাঁটতে নয়, দৌড়তে।'

'আমরা সব নিতান্ত গরিব ঘরের মানুষ,' গলায় বেশ দরদ দিলো মানসী, 'হাঁটা-চলা সবই ব্যস্ত-ব্যস্ত, আপনার তো কষ্ট হবেই।'

'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো?'

'না। ছি।'

'তবে এ-সব বাজে কথাগুলো বলো কেন?'

'ঠিক ব'লেই বলি। রাগ করলেন?'

'রাগ ক'রে আর থাকতে পারি কই?'

তা সত্যি। রাগ ক'রে সে থাকতে পারে না। তা যদি হ'তো তবে কি আজ এই মেয়েকে বাগে আনতে পারতো? মানসী স্বভাবতই শান্ত নম্র। মধ্যে-মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কেন যে এমন একটা নিষ্ঠুরতা বেরিয়ে আসে, বুঝতে পারে না সোমেশ্বর।

তা হোক, তবু মেয়েটা ভালো। সচ্চরিত্র।

মানসী আবার কলিং-বেলে চাপ দিলো জোরে, বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মা আমার জন্য মোটেও ভাবছিলেন না।'

'কী ক'রে জানলে ?'

'গভীর ঘুম না হ'লে কি দু-বার বেল বাজাতে হয় ?'

'তাই তো। তবু তো তুমি কত দৌড়ঝাঁপ করলে।'

'আমার ভুল হয়েছে।'

'তোমার বাড়িটি বেশ।'

'হ্যাঁ, লেকটা একেবারে কাছে কিনা।'

'সুন্দর লন্ আছে একটি।'

'সরকারি লন্, কী-ই বা লাভ তাতে।'

'আহা। লাভ-লোকসানের কথা কী! একটা আউটলুক আছে না? কত ফ্ল্যাট ভেতরে গেলে বেশ, কিন্তু এনট্রেন্স্টা একেবারে রেচেড। অতি হতচ্ছাড়া। আমি এ-বিষয়ে খুব পার্টিকুলার, বাড়ি পছন্দ করবার আগে তার বাইরের শোভাটা দেখে নিই।'

'ভালোই করেন।'

'বাই দি ওয়ে, মণি, একটা কথা—'

'বলুন,' মানসীর হাত বেলের উপর আরো জোর চাপ দিলো।

'সামনের মঙ্গলবার, দ্যাট মীন্স্ টোয়েনটিয়েথ্ মার্চ, আমাদের এনগেজ-মেণ্টের উৎসবটা আমরা সেরে ফেলি না।'

'সামনের মঙ্গলবার!'

'তুমি তো বলেইছিলে আর দেরি করবে না, সামনের মঙ্গলবার তোমার জন্মদিনও আছে, আরো একটু লার্জ স্কেলে পার্টিটা যদি দাও তাহ'লে— কিছু মনে কোরো না, খরচ কিন্তু আমি দেবো।'

মানসী চুপ ক'রে রইলো। সে জানতো না মঙ্গলবার তার জন্মদিন, জানতো না মা কখন নিমন্ত্রণ করেছেন এঁকে। ভাবতে লাগলো সত্যি-সত্যি তার জন্মদিন কবে। সত্যিই তার বয়স কত। এ-সব খবর মানিজেই

কি জানেন ? যখন ছোটো ছিলো বয়সের কথা ভাবে নি, কেউ জিগ্যেস করলে মা বলতেন 'এই ছ' সাত', অতএব সে নিজেও তাই বলতো। সেই বলাটা বহুদিন চলবার পরে একদিন মা-র গলা জড়িয়ে ধ'রে রাত্রি-বেলা জিগ্যেস করলো, 'মা, আমার কি এখনো ছ' সাত বছর বয়স ? তুমি কবে বলেছিলে, তার পরে তো কতদিন হ'য়ে গেলো, আমি এবার বড়ো হবো। পুঁটির কেমন তরতর ক'রে দশ হ'য়ে গেলো, আমি বুঝি সেই ছ' সাতেই প'ড়ে থাকবো ?'

হাত দিয়ে গলার বাঁধন ছাড়িয়ে দিলেন মা, বললেন, 'মেয়ের খালি পাকা কথা। পুঁটি আর তুই বুঝি সমান ?'

'হ্যাঁ তো। সমান তো। আগে তো সমান ছিলাম।'

'নে চুপ কর। বকবক করিস নি মেলা।'

টুনি দুঃখিত মনে চুপ করেছে কিন্তু জিগ্যেস করলে ছ' সাতও বলে নি আর, কিছুই বলে নি।

তারপর ন-দশ হ'য়েও অনেকদিন ছিলো, আর তার পরে ষোলো-সতেরোর গণ্ডি কাটাতে তার প্রায় গলদ্‌ঘর্ম হ'তে হ'লো। আর মিথ্যে কথা বলতে-বলতে মা নিজেই ভুলে গেলেন মেয়ের জন্মতারিখের কথা। হঠাৎ একটা জন্মদিনের খবর শুনে তাই অবাক না-হ'য়ে পারলো না সে। আর তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, সম্মতি ভেবে খুশি হ'লো সোমেশ্বর। খুব ঘন হ'য়ে কাছে দাঁড়িয়ে, প্রায় কানে-কানে বলার মতো আস্তে ক'রে বললো, 'আর কোনো ওজর না, কেমন ?'

দরজা খুলে দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক। আর খুলেই সামনে মেয়েকে আর সোমেশ্বরকে অত ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সদ্য-ঘুমভাঙা স্তিমিত চোখ সতেজ হ'য়ে উঠলো। গুরুজনসুলভ লজ্জায় তিনি ভেতরে

ঢুকে গেলেন। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই মাকে অনেক বারের মতো আরো একবার নতুন ক'রে দেখতে পেলো মানসী।

কনুই পর্যন্ত ঢাকা ধবধবে শাদা অতিশয় দামি পাৎলা কাপড়ের ব্লাউজ পরেছেন তিনি, পরনে দামি সরু কালোপাড় তাঁতের ধুতি, পায়ে শাদা কাপড়ের অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো স্যাণ্ডেল। দেখাচ্ছে বেশ। চুলের ঢৌলটি মা-র বরাবরই সুন্দর,তাকে তিনি আরো সুন্দর ক'রে আঁচড়েছেন। কে বলবে যে এই মা একদিন মোটা খাপি ছেঁড়া শাড়িতে আধো শরীর ঢেকে পুকুরঘাটে ব'সে বাসন মেজেছেন, জল ঘেঁটে-ঘেঁটে হাজা হয়েছে হাতে। মনে-মনে হাসলো মানসী। আমাকে দেখলেই কি আজ কারো মনে পড়বে সে-কথা ? যে-লোকটা বাস্ থেকে প্রায় ঝুলে পড়েছিলো রড ধ'রে সে-ই কি ভাবতে পারবে কিছু ?

উপরে উঠে এসে ঘরে ঢুকে ড্রয়িংরুমের আলো জ্বাললো সে। ঝলমল ক'রে উঠলো দক্ষিণখোলা, মোজেক করা, মানসী দত্তমল্লিকের সুরুচিসম্পন্ন বসবার ঘর।

মানসী দত্তমল্লিক। কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসী। গানের জগতের মধ্যমণি। গুণী-সম্প্রদায়ের একজন। আবার মনে-মনে হাসলো মানসী। মা বললেন, 'তোমাদের পার্টি বেশ জমেছিলো তো ?'

'জমবে না ? পার্টিটা বস্তুত কাকে নিয়ে ছিলো তা বোধহয় আপনি জানেনই না।' সোমেশ্বর হাসিতে সারা শরীর দোলালো।

'কাকে নিয়ে ?' মিসেস দত্তমল্লিকও কথাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে খুশির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন।

'আপনার প্রতিভাশালিনী মেয়েকে নিয়ে। ওকেই আজকের সম্মিলনীতে আমরা প্রধান অতিথির পদ দিলাম। নেক্সট সভায় ঠিক হয়েছে একটা মানপত্র দেওয়া হবে। তা আমি বলছিলাম কী—'

'বলো—' মা-র গলা গদ্‌গদ।

মানসী ভেতরে ঢুকে গেলো পর্দা ঠেলে।

প্রথমে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো চুপচাপ। মাঝারি সাইজের সুন্দর খোলামেলা ঘরটি। দক্ষিণদিকে তাকালে সোজা লেকের আকুল জলরাশি। আকুল? বিশেষণটা ভুল হ'লো। লেকের জল কোনো সময়েই আকুল নয়, ঘুমন্ত। প্রচুর আলস্যে আচ্ছন্ন সেই জল। প'ড়ে আছে, শুয়ে আছে, আকণ্ঠ-খাওয়া ময়ালের মতো নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। লেকের দিকে তাকালেই মানসীর আর-একটি মেয়েকে মনে প'ড়ে যায়, যে-মেয়েটির একটিমাত্র ভঙ্গিই শুধু তার স্মৃতিতে লেগে রয়েছে, যে-ভঙ্গি তার কান্নার। কান্নার পাথার, চোখের জলের বন্যা। সেই কান্না কেউ দেখে নি, শুধু মানসী দেখেছে। মানসী তাকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাঁদতে দেখেছে, হাসবার সময় কাঁদতে দেখেছে, কথা বলার ভঙ্গিতে কাঁদতে দেখেছে, দেখেছে শুয়ে কাঁদতে, ব'সে কাঁদতে, বিনিদ্র রাতে বালিশ ভিজিয়ে কাঁদতে। কত যে গভীর সেই কান্না, কত নিঃশব্দ, কত বেদনাময়, তা-ও মানসী জানে। কান্নার দেয়াল-ঘেরা একটি বাড়িতে থাকতো সে, সেখানে আকাশ ছিলো না, বাতাস ছিলো না, কিন্তু রাত্রি-বেলা তারারা ছিলো। তাদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, ঠাণ্ডা সবুজ নরম একটুকরো আলোর ইশারা পেয়েছে সে, ঐ একটি স্তম্ভিত মুহূর্ত সারা-দিনের কান্নার পরে। আর সব সমুদ্রের নোনা স্বাদ।

মানসী শিথিল হাতে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা, তারপর দামি শাড়িটা লুটিয়ে দিলো ছোটো চৌকো কার্পেটে, আলনা থেকে একটা শাদা শাড়ি টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালো। কিন্তু ব্লাউজটাও খোলা দরকার। কী জবড়জং। অতএব ব্লাউজটাও সে ছাড়লো, তারপর বাথ-রুমে এলো। কেমন যেন লাগছে, স্নান না-করলে আর ঠাণ্ডা হবে না মাথা।

সময়ের হিসেব ছিলো না।

দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক। 'চান করছিস নাকি ? এই অসময়ে এতো রাত্রে কল খুলে এ কি স্নানের ঘটা ?'

একটু থমকালো মানসী। যেন কতদূর থেকে আবার ফিরে এলো সে।

মিসেস দত্তমল্লিকের বিরক্ত কণ্ঠস্বর আবার ঝংকৃত হ'লো, 'অদ্ভুত মেয়ে। ওদিকে সোমেশ্বর যে ব'সে আছে সে-খেয়ালও কি নেই ? না-হয় ও চ'লে যাবার পরেই চান করতিস। আয়, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়। ও যাবে। তোকে ডাকছে।'

ঝরনার ঝরোঝরো শব্দে অনেকক্ষণ মানসী ডুবে যেতে দিলো মা-র সেই ব্যস্ত উদ্বেলিত গলার আওয়াজকে। তারপর একসময়ে ধীর গলায় জবাব দিলো, 'কিছু বলছো ?'

'হ্যাঁ, বলছি !' মিসেস দত্তমল্লিক রুষ্ট না-হ'য়ে পারলেন না, 'কানে শুনিস না নাকি ? এতোক্ষণে খেয়াল হ'লো ?'

ভেতর থেকে টুনির শিথিল গলা তেমনি নিরুৎসুক হ'য়ে দরজার বাইরে এসে পৌঁছোলো, 'কেন ?'

'কেন মানে ? সোমেশ্বর ব'সে রয়েছে আর তুই এতোক্ষণ ধ'রে স্নানই করছিস ?'

'তুমি যাও না—'

'সে-পরামর্শ তোমাকে দিতে হবে না। দয়া ক'রে একবার বেরিয়ে এসো। ওর গাড়ি এসে গেছে, ও এবার যাবে।'

'যান না। আমি কী করবো ?'

মিসেস দত্তমল্লিক মেয়ের কথা শুনে তাজ্জব হ'য়ে গেলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে জ্ব'লে গিয়ে বললেন, 'কী আবার করবি। লোকটা

যাবে, বিদায় দিবি। যেমন পাঁচজন ভদ্রলোক ভদ্রলোককে দিয়ে থাকে যাবার সময়ে।'

'তুমিই তো আছো। আমার একটু দেরি হবে।'

মিসেস দত্তমল্লিকের চাপা-চাপা ক্রুদ্ধ আওয়াজ সহসা প্রখর হ'য়ে উঠলো, 'যেমন জঙ্গল থেকে এসেছিস তেমনি জঙ্গুলে স্বভাব। ভদ্রতা-অভদ্রতার জানিস কিছু? আজন্মের ছোটোলোকি অভ্যেস যাবে কোথায়?'

অনেকদিন আগের আর-একজন ভদ্রমহিলাকে ঝাপসা-ঝাপসা দেখতে পেলো মানসী এই গলার শব্দে। আর-কিছু না-ব'লে বাথটব থেকে নেমে গা মুছে, জামার উপর শাড়ি জড়িয়ে বাইরে এলো।

চুল থেকে জল পড়ছে টুপটুপ। এখনো মানসীর কত চুল! নানা রকম আধুনিক খোঁপা করবার সুবিধের জন্য লম্বায় অনেকটা কেটে নিয়েছে সে, তবু আছে। ঘন, কালো, ঢেউ-ঢেউ। আয়নায় দাঁড়িয়ে ভেজা চুলটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবার মুছলো। মুখ মুছলো, হাতের পাতা মুছলো— তারপর চিরুনিটা ছোঁয়ালো কি ছোঁয়ালো না, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বিদায় দিতে শুধুমাত্র দোতলার ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত নয়, একতলার দরজা পর্যন্তই আসতে হ'লো তাকে মিসেস দত্তমল্লিকের ইঙ্গিতে। সোমেশ্বর খুশি হ'য়ে বললো, 'কাণ্ড ছাখো, আবার একতলায় নেমে এলে?'

'তাতে কী হয়েছে?' আবছা হাসলো মানসী।

সোমেশ্বর গাড়ির পা-দানিতে পা দিয়ে ঘাড় ফেরালো, 'তাহ'লে ঐ কথাই রইলো?'

'কী?'

'মঙ্গলবারই ঠিক হ'লো সব তোমার মা-র সঙ্গে। আমি নিমন্ত্রিতদের একটা লিস্ট নিয়ে আসবো'খন।'

'মঙ্গলবার! পরশু ?'

'তোমার মা! সত্যি! ওয়ানডারফুল! এরকম শিক্ষিত একজন মহিলা আমি দেখি নি। তিনি আমাকে প্রকৃতই ভালোবাসেন।'

মানসী দীর্ঘশ্বাস নিলো।

'তবে চলি!'

'আসুন।'

'কাল সকালে আসবো আবার, কেমন ?'

'আসবেন।'

'তোমার রিহার্সেল নেই তো কোনো ?'

'না।'

পা-দানি থেকে পা নামিয়ে একটু এগিয়ে এসে মানসীর হাতটা একটু ছুঁলো সোমেশ্বর, মৃদু হেসে বললো, 'রাত কাটাবার খোরাকটুকু নিয়ে যাই, যা কড়া তুমি, ভয়ই করে আমার।' মানসী ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলো, কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের মতোই একটা হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

কিন্তু কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ভাবলো সে। এর চেয়ে ভালো, সুন্দর, সুখের আর কী জীবন আমি আশা করতে পারি? সমাজে সোমেশ্বরের পদমর্যাদা প্রায় শীর্ষস্থানে, তার স্বামিত্ব যে-কোনো মেয়ের কাম্য। তবে আমার আটকাচ্ছে কোথায়? কেন আমি দিনের পর দিন তারিখের পর তারিখ পিছোচ্ছি— আর নিজেও গুটিয়ে যাচ্ছি শামুকের মতো? এর কারণটা কী?

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দত্তমল্লিক, বললেন, 'চ'লে গেলো?'

মানসী মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মেয়ে ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। এতোক্ষণে আবার খোলস ছেড়ে আসল মানুষটি বেরুলো তাঁর দেহ থেকে। পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলতে-খুলতে বললেন, 'ভালোয়-ভালোয় এখন দু-হাত এক করতে পারলে আমি বাঁচি।' গা থেকে আঁচলটা ফেলে ব্লাউজটা ছেড়ে নিলেন, ভেতরকার শাদা লেসের ছোটোহাত আঁটো বডিসটাও খুলে ফেললেন চলতে-চলতে। মিসেস দত্তমল্লিকের বৃদ্ধ বুকের দিকে এক পলক তাকিয়ে একটা সোফায় ব'সে পড়লো মানসী। পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে মিসেস দত্তমল্লিকও বসলেন মুখোমুখি, কোমরের পেটিকোটের দড়িটা খুলে ঢিলে ক'রে হাওয়া খেতে-খেতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন পার্টির কথা।

ব্রাহ্মণদের দ্বিজ বলে না? মা-র প্রশ্নের হুঁ-হাঁ জবাব দিতে-দিতে ভাবলো মানসী। কেন বলে? তাদের কি দু-বার জন্ম হয়? না তো। কিন্তু জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তো তারা ব্রাহ্মণ হয় না, হয় পৈতে নেবার পরে। পৈতে নেবার পরে তাদের আরেক জন্ম হয়, তাই তারা দ্বিজ। এতোকাল পরে এই ব্যাখ্যাটা বিশদভাবে মনের মধ্যে মানসী আলোচনা করলো। আর দ্বিজ বলে সাপেদের। তারা খোলস ছাড়ে। সেটা তাদের আরেক জন্ম। আর দ্বিজ আমার মা।

'সবই ঠিক হ'য়ে গেলো, কে জানতো ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে আমরা এখানে এসে দাঁড়াবো।'

মা-র বিগলিত কণ্ঠস্বর মানসীর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যাই, শুই গে।'

'কী-কী গান করলি আজ?'

মানসী আড়মোড়া ভাঙলো। 'ঐ তো সব আজেবাজে—'

'কেন ? আজেবাজে কেন ? "প্রিয়তম"-এর গানটা গাস নি ?'

মা-র চোখে চোখ রেখে, মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে মানসী বললো, 'না।'

'ও মা, তবে কী গেয়েছিস। ঐটাই তো সকলে শুনতে চায়। "বুকে এসো, নয়নে নয়ন রেখে ?" সেটা ?'

'না।'

'কেন ?'

'এমনি।'

'অমনি আবার কী ! একশোবার ব'লে দিলাম—'

রাগে গজগজ করলেন মিসেস দত্তমল্লিক, তারপর কোমরের আলগা কাপড় ধরতে-ধরতে চ'লে এলেন শোবার ঘরে, একেবারে নিজের বিছানায়। গা ঢেলে দিয়ে বললেন, 'কে কী বললো ?'

পাশাপাশি ঘর। মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে দু-জন দু-জনকে দেখতে পায়, দু-জন দু-জনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আগে মানসী মা-র সঙ্গে একঘরেই শুতো, এ-ঘরটা অমনি প'ড়ে থাকতো, কাপড়ের আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল বুকে নিয়ে। কিছুদিন যাবৎ একটা ছোট্টো খাট পেতে সে এ-ঘরে শুচ্ছে। খুট ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মা-র চোখের আড়াল হ'য়ে বললো, 'কী আর—'

'এই যে তুই আধখানা-আধখানা কথা বলিস না, আমার ভীষণ রাগ ধরে।'

'কী বলবো।'

'কে কে এসেছিলো, কী কী বললো, গান ভালো হয়েছিলো কিনা, সব বলবি তো ?'

'তুমি গেলে না কেন ? তোমার তো নেমন্তন্ন ছিলো।'

'তোদের সব সমানবয়সীদের মধ্যে আমি কী ক'রে যাবো ?'

'তুমি তো যাও।'

'গেলে তো আবার তুই-ই বিরক্ত হোস।'

'না তো।'

'না তো আবার কী ! আমি আর বুঝি না কিছু ?'

চাঁদের আলোতে ঘর অন্ধকার হ'লো না, হ'লেই ভালো ছিলো। আজ মানসী অন্ধকারকেই প্রার্থনা করছে মনে-মনে। হঠাৎ জানালা দুটো বন্ধ ক'রে দিলো, তারপর বিছানায় ডুবে গিয়ে বললো, 'বড্ডো ঘুম পেয়েছে, মা।'

মিসেস দত্তমল্লিক সন্ধ্যা থেকে লম্বা ঘুম দিয়ে জেগে উঠেছেন, তাঁর ঘুম পাবার কথা নয়, কিন্তু কী করেন, মেয়ের কাঁধে আজ আবার ভূত চেপেছে, আবার আগের মতো স্তব্ধ ভাব ধরেছে সে, বেশি না-ঘাঁটিয়ে চুপ ক'রেই রইলেন।

কিন্তু বেশ তো ছিলো যাবার সময়ে, কী হ'লো হঠাৎ ? কতদিন ধ'রেই তো বেশ আছে, কত ফুর্তি, আনন্দ, বেড়ানো খেলানো, নিজেই যেচে সোমেশ্বরের সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছে, আবার ঢং ধরলো কেন ?

'আচ্ছা মা,—' মানসী ও-ঘর থেকে বিছানায় শুয়েই বললো, 'মঙ্গলবার আমার জন্মদিন করছো কেন ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে মিসেস দত্তমল্লিক বললেন, 'জন্মদিন, তা-ই।'

'আমার তো কখনো জন্মদিন হয় না।'

'হয় না ব'লে যে কখনো হবে না তার কী মানে।'

'তাছাড়া আমার জন্মের তারিখও বোধহয় তোমার মনে নেই।'

'কেন থাকবে না। এই রকম শীত-গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই তুই জন্মেছিলি।'

'এই মার্চ মাসেই ?'

'তা হবে।'

'ঠিক কুড়ি তারিখে ?'

'ঐ রকমই—'

'কোন সনে ?'

'সন-ফন অত জানিনে।'

'তবে কেন করছো ?'

'থাম তুই।'

'কতগুলো লোককে ডেকে, একটা মিথ্যে জন্মদিনের অজুহাতে অনেকগুলো উপহার নেওয়াই কি তাহ'লে তোমার উদ্দেশ্য ?'

খুব কঠিন কথা। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো মিসেস দত্তমল্লিকের। মেয়ে তাঁর যত নামই করুক, বয়েস তার যতই বাড়ুক, ঠিক আগের মতোই শান্ত আছে সে, ভীরু নেই কিন্তু শিথিল, অন্যমনস্ক, মা যা করেন তাতে কথা কাটে না, প্রতিবাদ করে না। সে-অভ্যেস তার নেই। আজকের এই প্রতিকূলতার ছোট্টো একটু কণাই বৃহৎ ব'লে মনে হ'লো তাঁর। ঝাঁঝিয়ে উঠে কী বলতে গিয়েও গলা তাঁর থেমে গেলো, এতো বড়ো, এতো বিখ্যাত মেয়েকে আর আগের মতো দাবিয়ে রাখতে তিনি যেন সাহস পেলেন না সহসা। বললেন, 'এ-সব ব'লে তুমি আমাকে অপমান করতে চাইছো, না ? দশমাস পেটে ধ'রে জন্ম দিয়েছি কিনা, তারই এই শাস্তি।'

'জানি তুমি রাগ করবে বললে, কিন্তু এ-সব ছল-চাতুরী আমার ভালো লাগে না।'

'ছল-চাতুরী মানে ? তুই বলতে চাইছিস কী ?' এবার রাগ ফুটলো গলায়, 'নিজের মেয়ের জন্মদিন করবো সেটা আবার ছল-চাতুরী কী রকম ?'

'আমার বয়স কত ?'

'আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। মেঘে-মেঘে বেলা তোমার কম কাটে নি।'

'সেটাই তো আমি জানতে চাই।'

'যদি বলি ছাব্বিশ, বিশ্বেস করবি ?'

'কেন করবো না, মা ? তুমি লুকোলেও আমার অন্তর তো সবই জানে। কিন্তু তুমি বলবে সেদিন এ-কথা ?'

'কী ?'

'আমার ছাব্বিশ বছর বয়স ?'

'মেয়েদের বয়েস কেউ জিগ্যেস করে না।'

এবারে মানসী চুপ করলো, কিন্তু একটু পরে বললো, 'এই মার্চ মাসেই বাবা মারা গিয়েছিলেন মনে আছে তোমার ?'

মিসেস দত্তমল্লিকের বিছানা থেকে কোনো সাড়া এলো না এবার। মানসী একটু অপেক্ষা ক'রে বললো, 'বাবার বাৎসরিক কাজটা এবার খুব ভালো ক'রে করবো।'

মিসেস দত্তমল্লিক চুপ। তাঁর আরো কথা মনে প'ড়ে গেছে, মনে পড়েছে প্রিয়নাথবাবুর মৃত্যুর এক বছর আগে ঠিক এমন দিনেই নির্মলও বিদায় নিয়েছিলো তাঁদের কাছ থেকে। আর সেই বিদায়ই চির বিদায়। ভাগ্যিস ! সেই একটা কারখানার ছোঁড়া, তাকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকতে গেলেই হয়েছিলো আর কি। নিজেকে তারিফ করলেন। বিয়েটা বারে-বারেই ঠেকিয়ে রেখেছিলাম ব'লে তাই না আজ এখানে এসে পৌছোতে পারলাম। কে জানে বোকা মেয়েটার আবার সে-কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে না তো ?

যাচ্ছে না? যা একদিন এই মানসী দত্তমল্লিকের সারা বুকের পাঁজর খসিয়ে দিয়েছিলো, দুমড়ে-মুচড়ে একাকার ক'রে দিয়েছিলো দিন আর রাত্রির ব্যবধান, কালো ক'রে দিয়েছিলো সূর্যের আলো, তা কি এতো সহজেই ভুলে যাবার? মুছে যাবার? স্মরণশক্তি নামক পদার্থটা কি তবে এতোই তরল? না কি এ শুধু স্লেট-পেনসিলের একটি দাগ মাত্র?

দক্ষিণের হাওয়াভরা মস্ত ঘরের মস্ত জানালায় এক আকাশভরা তারা আর মুঠো-মুঠো নরম চাঁদের আলোয় তাকিয়ে ছাব্বিশ বছরের মানসীর কেবল আজ আঠারো বছরের টুনিকে মনে প'ড়ে যাচ্ছে বারে-বারে। যে-টুনি একখানা দরমার বেড়াঘেরা টিনের ঘরে শেয়াল-ডাকা-রাতে মলিন শয্যায় শুয়ে একজন মানুষকে ভাবতে-ভাবতে ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতো, ঘুঘু-ডাকা দুপুরের অসহ্য গরমে ঘামতে-ঘামতে রুমালে ফুল তুলতো, সন্ধ্যায় পাখির ডাক শেষ হ'তে-না-হ'তেই, বাঞ্ছিত মানুষটির আশায় উন্মুখ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো পথের দিকে।

সকাল থেকে তো শুধু কাজ আর কাজ। দশটার সময় আছে বাবাকে মাথা ধোয়ানো, খাবার এনে দেওয়া, বাতাস করা, মালিশ করা, বিছানা ঠিক করা— করুণ চোখে তাকিয়ে থাকতেন তিনি মেয়ের মুখের দিকে, আর শুধু সেই তাকিয়ে থাকা দিয়েই যে কত কথা বলতেন, কত বেদনা ঝরাতেন তা জানতো টুনি। তাই চোখ নামিয়ে নিতো সে, চোখে চোখ পড়লে যদি তার কান্না দেখতে পান তিনি। আর তারপর দুপুরে— কানা-উঁচু বড়ো থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে মা আর মেয়ের খেতে বসা, কখনো পুঁইয়ের চচ্চড়ি, কখনো কলমি-শাকের ঝোল, কখনো-সখনো ন্যাটামাছ, পুঁটিমাছ। মাছের অভাবে মা-র কষ্ট হ'তো, টুনি কিন্তু নির্বিকার। সুন্দর

হয়েছে খেঁসারির ঘন ডাল, সর্ষেবাটার পুঁই কিংবা লঙ্কাবাটা দিয়ে কলমিলতার ঝোল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পারলেই হ'লো, তারপর তো দুপুর আছে। সকালের পর যে-দুপুর, আর বিকেলের পর যে-সন্ধ্যা—এটাই তো জীবনের সব চেয়ে বড়ো কথা, বড়ো পাওনা। সেখানে খাওয়া-পরা নিয়ে খুঁতখুঁত করার কতটুকু মূল্য ? কিন্তু টুনির সেই ভাবা আর তার মা-র ভাবা, দুটো তো এক ছিলো না। পৃথিবীর আর কে-ই বা ভেবেছে সে-কথা ? তার আনন্দ যে কী গভীর তা কি আর-কেউ জেনেছে ? খেয়ে উঠে মা মাদুর বিছিয়ে, বালিশে চুল মেলে দিয়ে শুতেন। তাঁর হাতের কাছে পাখাটি রেখে একটি মস্ত পান সেজে দিয়ে, ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে এসে পুকুরঘাটে দাঁড়াতো টুনি। খেজুর গাছের গোল-গোল গুঁড়ি পাতা, ধাপে-ধাপে সিঁড়ি, জামরুল আর হিজলের ছায়ায় আচ্ছন্ন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার নিবিষ্টতা চমকে দিয়ে একটি ঢেউ উঠতো জলে। টুপ ক'রে একটি ছোট্টো ঢিল ডুব দিতো তার তলায়, তারপর সব অন্ধকার।

দুটি উত্তপ্ত হাতের পাতা থেকে চোখ ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াতো। বুকের ভেতরটা এতো ধকধক করতো যেন শাড়ির উপর থেকেও তার ওঠাপড়া চোখে প'ড়ে যাবে।

'কে ?'

কে আবার। রোদ্দুরে ঝলসানো অপরূপ সুন্দর একখানা হাসিমুখ। চোখের ভারি-হ'য়ে-আসা পাতাদুটি না-তুলেই তো সে-কথা টুনি বুঝতে পেরেছে। দেখতে পেয়েছে তার ঘামে ভেজা শার্ট, খোলা-বোতাম উন্মুক্ত বুকের তরুণ লাবণ্য।

নির্মল রুমাল বের ক'রে হাওয়া খেতে-খেতে বলেছে, 'জল। শিগগির একগ্লাশ ঠাণ্ডা জল দাও।'

'ঈশ্। এই রোদ্দুরে!' টুনি ছুটে গিয়ে মস্ত একগ্লাশ ঠাণ্ডা জল নিয়ে

এসেছে ; নিয়ে এসেছে ময়লা ছেঁড়া উনুনে হাওয়া দেবার ঝুলি-মলিন তালপাখা। কিন্তু তার দরকার কী ? ঝিরিঝিরি হাওয়া দিয়েছে জামরুল পাতা থেকে, হাওয়ার ঝাপটা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে পুকুর-পাড়ের সব আবর্জনা, জল তিরতির ক'রে কেঁপেছে শিহরিত আবেগে, তারপর মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকাতে-না-তাকাতেই শেষ, পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বিদায়।

'এবার যাই ?'

'এখুনি ?'

কবজির ঘড়িতে চোখ রেখেছে নির্মল।— 'কাঁধের উপর দুটো পাখা দিয়ে দিলে ভগবানের এমন কী ক্ষতি ছিলো বলো তো ?'

'তার চেয়ে খাবার ছুটিটা আর-একটু বেশি ক'রে নিলে ভালো হয় না ?'

'তার চেয়ে চাকরি না-ক'রে মাইনে পেলে আরো ভালো হয় না ?'

'ঠাট্টা কী ? কী তাত রোদ্দুরের ! এর মধ্যে যাওয়া যায় ?'

জ্বলন্ত পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে টুনির নিজের শরীর গরম হ'য়ে উঠতো, নিজেকে সে কল্পনা করতো ছায়াহীন খেতের উপর দিয়ে, মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্যের আগুনের তলায় সাইকেল চালাচ্ছে, প্রায় কান্না পেয়ে যেতো।— 'এই রোদে আর তুমি এসো না।'

'তাই তো ভাবছি।' নির্মলের চোখে-মুখে বিজ্ঞতার ঘন রেখা।

'কী ভাবছো ?'

'কথাটা ব'লেই ফেলি কাকিমাকে।'

'কী কথা ?' উৎসুক চোখে তাকিয়েই বুঝে ফেলেছে টুনি, কান গরম হ'য়ে উঠেছে, গাল গরম হ'য়ে উঠেছে, বুকের রক্ত ঘন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।

নির্মল হেসেছে তার দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু তার আগে তো টুনি পাখির মতটা জানা দরকার।'

'ধেৎ!'

'কোয়ার্টার পেয়েছি, সুন্দর লাল ইটের ছোটো বাড়ি, আর সেই বাড়িতে— বলো না?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে টুনি চুপ।

'বলো না, লক্ষ্মীটি।'

টুনির চোখ মাটিতে স্থির।

'বলো।' নির্মলের গাঢ় গলা যেন দুপুরের রোদকেও নিস্তব্ধ ক'রে দিয়েছে। প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো থরথর করেছে মুহূর্তগুলো। থরথর করেছে টুনি। টুনির দিন আর রাত ভ'রে উঠেছে সেইসব থরোথরো মুহূর্তের সোনায় আলোয়।

সে-সব দিন কি ভোলবার? ভোলা যায়? কালের প্রলেপ শুধু পলেস্তারাই ফেলতে পারে, উচ্ছেদ করবে এমন শক্তি তার কোথায়? আর কাকে উচ্ছেদ করবে? যার কথা ভেবে আজকের এই ভাগ্যের চরম চুড়োয় পৌঁছেও সে ছাব্বিশ বছরের কৌমার্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলো না, তাকে?

নির্মলের পর এই সুদীর্ঘ আট-দশ বছরের ব্যবধানে আর কি এমন কোনো মানুষের সান্নিধ্যে সে আসে নি যাকে তার ভালো লেগেছে, যাকে দেখলে আলো ফুটেছে চোখে, যার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখনো কোনো চকিত মুহূর্তে বুকও কেঁপে উঠেছে জোরে? সুমন্ত্রর কথাই তো মনে করতে পারে। অনেক দূর হেঁটেছিলো সে, মানসী তাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছিলো আমন্ত্রণ জানিয়ে, তারপর হঠাৎ কবে কোন রাত্রে ঠিক

এমনি ক'রেই টুনি এসে দাঁড়ালো তার সব মাধুরী নিয়ে, সব দুঃখ বেদনা, সুখ আর আনন্দ নিয়ে। মানসী দুইচোখ ভ'রে তাকে দেখলো, দেখলো তার টলটলে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুর শিশির, তারপর হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে গেলো কখন। হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে উপলব্ধি করলো, টুনির কাছে আজকের এই মানসী মৃত, জড়, অচেতন পদার্থ। টুনি তাকে এমন সর্বস্বান্ত ক'রে রেখেছে যে আজও সেই ক্ষতি মানসী সামলে উঠতে পারে নি। সুমন্ত্র সব শুনলো চুপ ক'রে, তারপর চ'লে গেলো নিঃশব্দে।

মন-খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো বৈকি। খুব খারাপ লেগেছিলো। কিন্তু তাই ব'লে ঠকাতে তো পারে না।

অভাব। অভাব। অভাব। মলিন মুখে মা হাত পেতেই আছেন। তাঁর ঐ এক ভঙ্গি,ঐ এক সুর,অভাবের বিলাপ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই তাঁর মুখে। কোনো আবেদন নেই। আজ তাঁর চাল নেই, কাল তাঁর ডাল। পরশু কাপড় নেই, তার পরের দিন প্রিয়নাথবাবুর একটি ওষুধ না-আনলেই নয়, কত যে তালিকা— অন্ত আছে কোনো? পাঁচটা টাকা দিতে পারো? দশটা দিতে পারো? পনেরোটা দিতে পারো? চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। আজ যে অমুক পাওনাদার আসবে, তাকে যে না-দিলেই নয়, কাল ভেবেছি তমুক করবো তার জন্যও ক'টা টাকা চাই— এই ক'রে-ক'রে মানুষটাকে মা যেন একেবারে টেনে নামিয়ে দিলেন, সামান্য কয়েকটা মাস অপেক্ষা ক'রে আই. এ.-টা পর্যন্ত পাশ করতে দিলেন না। অত বড়ো সংসারের অত চাহিদা যার মাথায় দিনরাত করাত চালাচ্ছে তার কি আর চাকুরে না-হ'লে চলে! দেখতে-দেখতে বাইশ বছরের যুবক বেয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের দায়িত্বে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠলো। তবু শান্তি নেই।

প্রিয়নাথবাবু অস্থির হ'য়ে বললেন, 'না, না, আর না। আর ওর কাছে কিছু বোলো না।' অবশ, পঙ্গু, দুঃখী প্রিয়নাথের ক্ষীণ গলা ননীবালার গর্জনে থেমে গেলো, 'তাহ'লে আর কী! হাটে গিয়ে নিজে বিক্রি বসি।'

বাবার মুখে অশেষ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে মুহূর্তে, তালপাতার পাখাটা হাতে নিয়ে হাওয়া করেছেন জোরে-জোরে, অসহায়ের সহায় ভগবান নামক অত্যন্ত জরুরি একটি কল্পনাকে ঘন-ঘন স্মরণ করেছেন মনে-মনে, তারপর নিঃসাড়ে চোখ বুজে প'ড়ে থেকেছেন মরার মতো। টুনি এসে আস্তে-আস্তে হাত রেখেছে কপালে, বাপ আর মেয়ের দুই জোড়া ব্যথিত চোখ মিলিত হ'য়ে যেন হালকা হ'য়ে গেছে সব দুঃখ। আচমকা টুনি ব'লে উঠেছে, 'বাবা, তোমার ডান পা-টা তো কই এখন আর বেশি সরু দেখাচ্ছে না!'

'অ্যাঁ,' যেন স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠেছেন প্রিয়নাথবাবু, 'ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ বাবা! আমার ক'দিন ধ'রেই মনে হচ্ছিলো, আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'তা হবে।' গলায় যেন সাগরের ঢেউ, 'কলকাতা থেকে এবার নিমু যে-মালিশটা এনেছে, তার দাম তো বড়ো সোজা নয়।'

'আমার মনে হয় কী জানো?'

'কী রে?'

'আমরা যদি একবার কলকাতা যেতে পারতাম, যদি একজন বড়ো ডাক্তার দেখাতে পারতাম—' টুনির গলা ভেঙে এসেছে, বুকের ভেতরটা একেবারে ব্যথা ক'রে উঠেছে, বাবার আরো-সরু-হ'য়ে-আসা পা-টার দিকে তাকিয়ে নিচু হ'য়ে সেই পায়ে সে মাথা রেখেছে, বাপকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অজস্র কান্নার আবেগে নিজেই ভেঙে পড়েছে আকুল হ'য়ে।

শেষে প্রিয়নাথকেই মেয়েকে শান্ত করতে হয়েছে হাসির আড়ালে কান্না লুকিয়ে।

কেন? কেন অত শাস্তি পেয়ে গেলেন তার বাবা? রাধানগর হাই স্কুলের অতি শান্ত, অতি সজ্জন, অতিশয় ভালোমানুষ প্রিয়নাথ মাস্টার? কী পাপ করেছিলেন তিনি? কী অপরাধে ঈশ্বর তাঁকে এতো বড়ো সাজা দিলেন? আজকেও মানসী তার কোনো ব্যাখ্যা পেলো না মনে-মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে। অসময়ে স্নান ক'রে চুলগুলো ভেজা, কেমন ভার লাগছে শরীরটা। রেকর্ডিং আছে এক সপ্তাহ পরে, কনট্রাক্ট করেছে বম্বের বিশিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, শিগগির যেতে হবে সেখানে, তার জন্যেও অন্তত সাবধান থাকা উচিত ছিলো। স্নান করাটা ঠিক হয় নি। মাথা ধ'রে উঠেছে। গলা ভেঙে গেলেই তো সব গেলো। উঠে নীল আলোটা জ্বেলে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা অ্যানাসিন বের ক'রে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে নিলো। মাথার উপর ঘূর্ণমান পাখার স্পীডটাও কমিয়ে দিলো এক মোচড়ে।

আজকে নির্মলকে ভাবতে গিয়ে প্রিয়নাথবাবুকেই বেশি ক'রে মনে পড়লো তার। ঘুম এলো না, কান্না এলো। জানালার কাছে উঠে এসে আধভেজা চুলে বিলি কাটতে-কাটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়?

থাকলে তো আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। এই বাড়ি তাঁর পায়ের ধুলোতে পুণ্যস্থান হ'তো, এই সব ঘরে তিনি হেঁটে বেড়াতেন। মানসী তাঁকে হাঁটবার উপযুক্ত চিকিৎসাই করাতে পারতো এখন। মা হাঁটলেন না? এই তো কয়েক বছর আগের কথা। অনভ্যস্ত পায়ে জুতো

প'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গোড়ালির হাড় ভেঙে গেলো। কী এসে গেলো তাতে ? এলো সার্জন, এলো ব্যাণ্ডেজ, ওষুধ এলো কত রকমের, ব্যবস্থা হ'লো কত-কিছুর, তিন মাস মাসাজ করা হ'লো লোক দিয়ে নিয়মিত। এখন কি তার চিহ্নও আছে ? সেই পায়ে আবার জুতো প'রে কত তিনি ঘুরে বেড়ান, কত তাঁর শখ, কত আনন্দ। তখনও মানসীর তার বাবার কথা মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো গ্রামের সরকারি হাসপাতালের বুড়ো দয়াল ডাক্তারের চিকিৎসায় প্রিয়নাথের পা জোড়া না-লাগলেও ইওরোপ-ফেরতা বত্রিশ টাকা ভিজিটের এই ডাক্তার সেহানবিশের চিকিৎসায় থাকলে নিশ্চয়ই লাগতো। তখন নির্মলও বলেছিলো, 'চাকরিটা পাকা হ'লেই মাস্টারমশাইকে আমি কলকাতার ডাক্তার এনে দেখাবো। আর তার জন্য টাকাও জমাবো আমি।'

কিন্তু সে-আশা আর তার পূরণ হ'তে পারলো না। কী আশাই বা পূরণ হ'লো তার ! মানসী ঠোঁটের কোণে হাসলো।

তারপর চকিত হ'য়ে ও-ঘর থেকে মিসেস দত্তমল্লিকের নিটোল ঘুমের ঘন নিশ্বাসের উত্থান-পতন শুনলো। শুনতে-শুনতে তার নিজের দীর্ঘশ্বাস ভাসলো বাতাসে। আর নির্মলের মাকেও মনে প'ড়ে গেলো হঠাৎ। ছোটোখাটো এইটুকু মানুষটি, ভালোবাসায় ভরা মন। ছেলের চেয়ে তাঁর গরজই শেষে বেশি হ'য়ে উঠেছিলো। 'ও ননীবালা,' পুজোর মধ্যে এক-দিন ডুরে শাড়ি হাতে ক'রে এলেন তিনি, 'আর তো বাপু খালি ঘরে আমার মন টেঁকে না। এবার দিয়ে দাও মেয়েটাকে।'

মা হাসলেন, 'আমার কি অনিচ্ছা দিদি ? আপনার ঘরে যাবে, আমার মেয়ের কত ভাগ্য, কিন্তু ভাবছি কী, এমন শুধু হাতে-পায়ে কেমন ক'রে ওকে বিদায় দেবো। ডাক্তার বলছে শীতটা পেরুলেই আপনার দেওর আবার ঠিক আগের মতো উঠতে-হাঁটতে পারবেন, আর ওঠা-হাঁটা

মানেই ইস্কুলে যোগ দেওয়া। ইস্কুলে গেলেই টাকাকড়িরও তো একটা সুরাহা হবে।'

'তা তো ঠিকই।' ভালোমানুষ সরোজিনী একেবারে গ'লে গেছেন, 'তা টাকাকড়ির জন্য তুমি ভাবছোই বা কেন ? আমি কি কিছু চেয়েছি ?'

'আপনি দেবী,' মা তাঁর মন-গলানো কথায় চিঁড়ে ভিজিয়েছেন, 'আপনি যে কিছু নেবেন না, চাইবেন না, তা তো আমি জানি। কিন্তু দিদি—' একেবারে হাত চেপে ধরেছেন, 'আমার তো সাধ আছে একটা ?'

তা আছে বৈকি ? নির্মল চাকরিতে পাকা হ'য়ে তো সেটা ভালো ক'রেই মিটছে তাঁর। তাঁর সংসার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে আস্তে-আস্তে, এতোদিনের জমাট ঘন অন্ধকার ঠেলে তিনি আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন। এর মধ্যে গলার হার ছড়া ছাড়িয়ে এনেছেন মহাজনের কাছ থেকে, শাঁখার পাশে চ্যাপটা দু-গাছা তামার পাতের চুড়িও গড়িয়ে নিয়েছেন। আর একখানা খয়েরি পাড় তাঁতের শাড়ি।

সেই শাড়িখানা প'রেই তিনি নির্মলের মৃত মাকে দেখতে গিয়েছিলেন, নতুন শাড়ির খসখসে আঁচলে চোখ মুছেছিলেন, তারপর বাড়ি এসে কেচে শুকিয়ে মাড় দিয়ে তুলে রেখেছিলেন ভাঁজ ক'রে।

আর টুনি ?

টুনিও গিয়েছিলো বৈকি। সরোজিনীর ঠাণ্ডা শাদা বুকে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলো নির্মলকে, দেখেছিলো নিঃসঙ্গ নিঃস্ব-হ'য়ে-যাওয়া একটি মানুষের কাঙাল কান্না, দেখেছিলো মৃত্যুর মহিমা। সুন্দর লেগেছিলো, স্বর্গের মতো লেগেছিলো, কেউ না-বলতেই সে চন্দন ঘ'ষে নিজে-নিজে সাজিয়ে দিয়েছিলো সরোজিনীকে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিলো, মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো। গ্রামের কর্তারা, গিন্নিরা বলাবলি করেছিলেন তাই নিয়ে, হাসি-মস্করা করেছিলেন, ছোকরারা টিটকিরি

দিয়েছিলো, অসভ্য বেহায়া নির্লজ্জ— কত-কিছু বিশেষণই যে উপহার পেয়েছিলো সেদিন তার আর অন্ত নেই। বাড়ি ফিরে ননীবালাই কি কম নির্যাতন করলেন? কেবল প্রিয়নাথবাবু তার পিঠে হাত রেখে ব'সে ছিলেন চুপচাপ। তাঁর বিষণ্ণ গম্ভীর বেদনা-সজল মুখের দিকে তাকিয়ে টুনির সব দুঃখ গ'লে জল হ'য়ে গিয়েছিলো, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো সে।

কেন কেঁদেছিলো? সরোজিনীর মৃত্যুতে তার কী? তবে কি সে তাঁকে ভালোবেসেছিলো? না কি তিনি নির্মলের মা ব'লে? না কি নির্মলের কান্না আর তার কান্না অভিন্ন ছিলো না?

ননীবালা তাতেও রাগ করেছিলেন। আদিখ্যেতা ভালো লাগে নি তাঁর। বলেছিলেন, 'কী ঢং! তবু তো এখনো যাস নি ওখানে। গেলে তো বুঝি আর নিজের মাকেই চিনবি না।'

তাই তো ননীবালা আগে থেকেই সাবধান হয়েছিলেন। মেয়েকে নিজের অধীনে রেখে হাতে রাখছিলেন নির্মলকে, 'সবুর করুক না একটা বছর। এই তো মা মরলো, এখুনি বিয়ে কী?'

প্রিয়নাথবাবু রাগ করেছিলেন, 'তুমি বলছো কী? আরো দেরি করতে চাচ্ছো?'

'তোমরা কি হিন্দু না খৃস্টান? মেয়ের না-হয় পাখনা গজিয়েছে, পা বাড়িয়েই আছে যাবার জন্য, সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও কি ভীমরতি ধরলো নাকি?'

'কী আশ্চর্য!' প্রিয়নাথবাবুর গলায় রাগ ফুটেছে, 'ভদ্রমহিলার কত শখ ছিলো বউ নিয়ে ঘর করবার; তা তো দিলেই না, আর এখন ওর এই শূন্য ঘরেও তুমি ওকে একা-একা থাকতে দেবে নাকি? থাকতে পারে? মা ছাড়া ওর আর-কেউ আছে নাকি দেখবার শোনবার?'

'ও-সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড আমি করতে পারবো না,' রাগে গজগজ করেন

ননীবালা, 'কেন, অস্থবিধেটা কী, শুনি ? বাড়িতে তো আর থাকে না। থাকে তো কাজের জায়গাতেই। কেবল রাত্তিরটুকুই যা বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ। তা রোজ-রোজ আসবার দরকারটাই বা কী ? খাওয়া-দাওয়ার তো আর অস্থবিধে নেই সেখানে।'

প্রিয়নাথবাবু তবু বলেছেন, 'তোমার যে কী ইচ্ছে তা আমি সত্যি বুঝিনে। মাইনে বেড়েছে, কোয়ার্টার পেয়েছে, বিয়ে ক'রে এখন বউ না-নিয়ে গেলে চলে ?'

ননীবালার চোখের দৃষ্টি জ্ব'লে উঠেছে এবার। এক ধমকে তিনি চুপ করিয়ে দিয়েছেন স্বামীকে, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো। ধারদেনাগুলো শোধ হ'লো না, দুটো পয়সা জমলো না হাতে, এখুনি বিয়ে। আরে বাপু, ও কি তোমার ছেলে যে বিয়ের পরেও তোমার এখানে তোমার দায় নিয়েই প'ড়ে থাকবে? সে-দায়িত্ব কি ওর আছে যে চিরদিন বসিয়ে খাওয়াবে তোমাকে ? সে-কপালটুকুও সঙ্গে আনো নি তুমি। ও হ'লো মেয়ে। বিয়ে দিলেই পর। তখন এই পেটের মেয়েই আলাদা ভাতে শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে।'

এই কথা !

স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন প্রিয়নাথবাবু। স্ত্রীর সঙ্গে বোধহয় আর কথা বলতে ইচ্ছে করে নি তাঁর। একেবারে চুপ হ'য়ে গেছেন, ঝরঝর ক'রে ঘাম নেমেছে সারা গায়ে। তিনি পঙ্গু, উপার্জনহীন, উপায়হীন। কী বলবেন তিনি ? কে শুনবে তাঁর কথা ? জোর ক'রে কিছু করার মতো মনের শক্তি তাঁর দেহের শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

একদিন নির্মল বললো, 'টুনি শোনো।'

'কী ?'

'তোমাকে একটা গ্রামোফোন কিনে দেবো আমি।'

'গ্রামোফোন ?'

'হ্যাঁ। অনেক রেকর্ড থাকবে, তাই থেকে তুমি গানগুলো তুলে নেবে।'

'না, না—'

'না না কী ? একে-ওকে খোশামোদ করার চাইতে ঢের ভালো।'

'না, গ্রামোফোন তোমাকে কিনতে হবে না।'

'তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না।'

'আমি শিখবো না গান।'

'তা তো ঠিকই। কেবল বাসন মাজবে, না ?'

'মন্দ কী ?'

'না মন্দ আর কী! "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি"—' বড়ো-বড়ো কালো চোখে নির্মল হেসেছে।

টুনি ভ্রুকুটি করেছে, 'পর আবার কে ? বাবা ? মা ? তুমি ?'

'নিজে ছাড়া সব পর। প্রথমে তুমি নিজে, তারপর তোমার গান, তারপর বাবা-মা। অবিশ্যি—' চোখ ভাসিয়ে মাথা নেড়েছে এখানে, 'সব চেয়ে আগে আমি, এই নির্মল নামক ভাগ্যবান যুবকটি।'

'কেন ?'

'বা রে, আমিই তো তোমার আত্মা, মন, প্রাণ সব!'

লাল হ'য়ে উঠেছে টুনি, 'কী অসভ্য।' যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে।

'শোনো, শোনো।' তৎক্ষণাৎ আঁচল টেনে ধরেছে নির্মল।

'কী ?'

'কাকিমা তো কিছুতেই ওস্তাদ রাখতে দেবেন না।'

'তোমার সত্যি মাথা-খারাপ হয়েছে।'

'তা তো হয়েছে। টুনি, আমি আর পারছি না একা থাকতে।'

টুনিই কি পারছে? কিন্তু কী করবে সে? তার চোখে জল এসে গেছে, জবাব দেয় নি, শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ।

'মা যে নেই এ-কথাটা একদণ্ডের জন্যও ভুলতে পারছি না আমি।'

টুনি চুপ।

'তুমি এলে আমি সব ভুলে যেতুম। জানো, রাত্তিরে ঐ একা বাড়িটায় আমার দু-চোখ আর বন্ধ হ'তে চায় না। কী যে আজেবাজে মনে হয়। ভয় করে, আর বুঝি আমি তোমাকে পেলাম না।'

'চুপ করো।' অস্থির হ'য়ে উঠেছে টুনি।

নির্মল চুপ করেছে। তাকিয়ে থেকেছে দূরের দিকে।

'কিন্তু গ্রামোফোন তুমি এনো না।' টুনি অনুনয় করেছে চোখে চোখ রেখে।

নির্মল বলেছে, 'কেন?'

'কেন মানে? একটা গ্রামোফোন কেনা বুঝি সহজ? কেন কিনবে? টাকা কই?'

'মা রেখে গেছেন।'

'মা?'

'তাঁর ক্যাশ-বাক্সে ছিলো।'

'থাকুক।' টুনি একেবারে পাকা গিন্নি, 'টাকা কি ফেলে দেবার?'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'তাই জন্যেই তো একেবারে তোমার গলায় গান ক'রে ধ'রে রাখতে চাই। চিরজীবন থাকবে।'

'আমি কি চিরজীবন গানই গাইবো?'

'যার যা কাজ।'

'আর বুঝি কাজ নেই ?'

'আমার ছোট্টো পাখি, বনের পাখি, টুনি পক্ষীর আর আবার কী কাজ ?' টুনির লম্বা চুলের একটা গোছা টেনে এনে হাতে জড়িয়েছে সে। 'তুমি কি ভেবেছো আমার কাছে গিয়েও রাঁধবে ? মসলা করবে আর বাসন মাজবে ? আমি এখন থেকেই একটা মেয়েকে ঠিক ক'রে রেখেছি, সব ক'রে দেবে সে।'

টুনি চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে, কথা বলে নি।

তারপর সত্যি নির্মল একটা গ্রামোফোন কিনে এনে হাজির করলো একদিন। আঠারোখানা রেকর্ড সুদ্ধু। আর মা সঙ্গে-সঙ্গে জ্ব'লে উঠলেন তেলে-বেগুনে। যতক্ষণ নির্মল রইলো গুম হ'য়ে রইলেন, আর সে যেতেই ফেটে পড়লেন বোমার মতো, 'এ-সব কী ? যা খুশি তা করলেই হ'লো ?'

প্রিয়নাথবাবু বললেন, 'এর আবার একটা যা-খুশি তা কী ? ভালোই তো করেছে। কী সুন্দর গানগুলো। আর গান মানুষের সুখে-দুঃখে !'

'টাকা কি গঙ্গার জলে ভেসে আসে যে খোলামকুচির মতো খরচ করলেও ফুরোবে না ?'

'কী আশ্চর্য !' প্রিয়নাথবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীর কথার জবাব না-দিয়ে পারেন না, 'ওর টাকায় ও যা-খুশি তাই করবে, তোমার কী ?'

'আমার কী মানে ? এই সংসারের পিণ্ডি তৈরি হবে কোথা থেকে ? একটা মড়া-পোড়া গ্রামোফোন, কতকগুলো ইস্‌কুরুপ বল্টুর স্তূপ, কার শ্রাদ্ধে লাগবে শুনি ? কী হবে ওই আপদ দিয়ে ?'

'সে তুমি বুঝবে না। বোঝবার মতো মন ভগবান দেন নি তোমাকে।'

'তা তো দেনই নি। যত দিয়েছেন তোমাকে আর তোমার মেয়েকে।

সাধে কি বলি, মেয়ে মেয়েই। মেয়ের মতো শত্রু পৃথিবীতে আর কেউ না। ওই হাঁদাকান্ত মেয়ে যদি একটু বুঝেরই হবে, বাপ-মায়ের দরদই বুঝবে তাহ'লে কি এভাবে জলে যেতে দেয় টাকাগুলো ? ও কী না পারে ইচ্ছে করলে ? নির্মল ওর কোন কথা না-শোনে ? সংসারের জন্য মায়া থাকলে টাকাগুলো ও বাঁচাতে পারতো না ?'

সারাটা দিন মা একেবারে মাথা ফাটালেন। টুনি নিঃশব্দে কাজ করতে-করতে সব শুনলো, সেই রাত্রে ঘুমুতে পারলো না সে। আর তার জের মিটতে-না-মিটতেই এলো এক হারমনিয়ম। ডবল রীডের মস্ত বাজনা। নির্মলের খুশির শেষ নেই, এটা দেখায়, সেটা দেখায়— টুনি কী করবে। টুনির বারণ শুনতে তার ব'য়ে গেছে।

দাও। দাও। আরো দাও। এর পর মা যেন মরীয়া হ'য়ে উঠলেন। যে-ছেলে হুপ ক'রে একটা গ্রামোফোন কিনে আনতে পারে, চক্ষের পলকে অত বড়ো একটা হারমনিয়ম এনে হাজির করতে পারে, তার হাতে যে বেশ ভালোরকম কিছু জুটেছে, শুধুমাত্র মাইনেটাই যে তার সম্বল নয়, এটা অনুমান ক'রে তাঁর আর লুব্ধতার সীমা রইলো না। এবার প্রিয়নাথবাবু শুয়ে-শুয়েই রাগারাগি করলেন, 'তুমি ভেবেছো কী ? যা তোমার খুশি করলেই হ'লো ?'

তাচ্ছিল্যভরে ননীবালা জবাব দিলেন, 'খুশিমতোই তো সারাজীবন সব পেলাম কিনা।'

'কী তুমি পাও নি ? দিনরাত তোমার এতো কিসের আক্ষেপ ? আমি কি কোনো শখ মেটাই নি তোমার ? কোনোদিন কিছু উপার্জন করি নি ?'

'সে-সব ব'লে লাভ কী।'

'লাভ এই যে নিজের অতীত ভেবে, ওদের কথা তুমি ভাবো। নিজেকে

এতো ছোটো কোরো না, এতো হীন হোয়ো না। ওদের সুখী হ'তে দাও, স্বাধীন হ'তে দাও। তুমি মা, সন্তানকে সুখী করার দায়িত্ব আছে তোমার। এ-রকম আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই।'

ননীবালা ফিরে তাকালেন। প্রিয়নাথবাবু আধখানা উঠে ব'সে যেন ছটফট করতে লাগলেন, 'না, না, এ হ'তে পারে না। এ অন্যায়। ছুটোছুটি করতে-করতে ছেলেটা রোগা হ'য়ে গেছে। এ-সব কী ধরনের স্বার্থপরতা? কেবল নিজের সুবিধেটুকুই সব! ছি! বিয়ে আমি দেবো, আমি নিজে বিয়ে দেবো, এ-মাসেই দেবো।'

এবার ননীবালা ছোট্টো একটি মন্তব্য ছাড়লেন, 'অসারের তর্জনগর্জন সার।'

জ্বলতে-জ্বলতে যেন দপ ক'রে নিবে গেলো সব আগুন।

টুনি সেদিন মুখ খুলেছিলো মা-র উপর। ভারি বুকে, ভারি নিশ্বাসে, জলভরা চোখে মা-র দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'বাবাকে তুমি ও-রকম বললে? বলতে পারলে?'

'খুব লেগেছে, না?'

'তোমার লাগে না কেন?' টুনির ব্যথিত স্বর ছলছলে হ'য়ে উঠলো, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। বাবার কষ্ট তুমি বোঝো না।'

'তা তো ঠিকই।' হিংস্র আবেগে ঝংকার দিয়ে উঠলেন ননীবালা, 'তুমি খুব বোঝো, আর সেই বোঝার ঠেলায় কখন এ-বাড়ির দরজা ডিঙোবে তাই জন্যে পা বাড়িয়ে আছো।'

মূর্খ, মূঢ়, ভীরু টুনি। একটা কথা কি আর বলতে পারলো তারপর? কেন পারলো না? কেন সে হ'তে দিলো এই অন্যায়, একটা মানুষের ওপর এই অবিচার? কেন সে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাধা দিলো না মা-র সেই অন্যায়ে?

মানসী জানালা ছেড়ে দ্রুত পায়ে মা-র ঘর আর তার ঘরের মাঝের দরজাটায় এসে দাঁড়ালো থমকে। কী জানি কেন। তারপর আবার ফিরে এলো জানালায়। রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে, হাত-পা জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে কান আর মাথা। বাথরুমে এসে ভেজা মাথায় আবার জলের ঝাপটা দিলো জোরে-জোরে, হাত-মুখ আর গলা সব ভিজে গেলো, ব্লাউজটাও ভিজলো পিঠের কাছে।

এই তো এমন দিনেই সে চ'লে গেলো তারপর। টুনির দু-চোখে আঁধার নামিয়ে, বুকের পাঁজর খসিয়ে।

আর তারপর, আজ।

আজ?

আজ কী? সত্যিই সে? নির্মল? নির্মলকেই দেখেছে? না কি মনের ভুল? যদি নির্মলই হয় তবে সে নামলো না কেন? না কি চিনতে পারে নি মানসীকে? খুঁজে পায় নি টুনিকে? কেমন ক'রে পাবে? টুনি কই? টুনির অস্তিত্ব আর কোথায় আছে এই পৃথিবীতে? টুনি ক্ষ'য়ে গেছে, মুছে গেছে। দুঃখের পাথারে ভাসতে-ভাসতে কোথায় তলিয়ে গেছে টুনি।

ভালো হয়েছিলো। খুব ভালো হয়েছিলো। অত দুঃখেও তখন মনে-মনে বলেছিলো টুনি। মা-র দু-চোখ ভরা জলের দিকে তাকিয়ে নিজের দুঃখ সার্থক মনে হয়েছিলো তার। নির্মল, তুমি খুব ভালো করেছিলে চ'লে গিয়ে, তুমি না-গেলে সেই সব দুঃসহ দুঃখভরা দিনের বীভৎস ছবি দেখে কেমন ক'রে মা শিহরিত হতেন? কেমন ক'রে ভাবতেন যে, যাকে তিনি একবিন্দু শান্তি দেন নি, সে-ই ছিলো তাঁর শান্তির আধার।

পরের বছর ঠিক তেমনি দিনে মারা গেলেন প্রিয়নাথবাবু। মানসীর স্পষ্ট মনে আছে সেই রাতটি। টুনিকে তিনি কাছে ডাকলেন, তাকিয়ে

রইলেন মুখের দিকে, অস্পষ্ট গলায় কী যে বললেন তখন টুনি বোঝে নি, অনেক পরে মনে হয়েছে, নির্মলের নামই করেছিলেন শেষ সময়ে। আস্তে হাতখানা উঠিয়ে কোলের উপর রাখলেন, টুনির চোখের জলে ধুয়ে গেলো সেই হাত। ননীবালা প'ড়ে আছেন মাটিতে, অনাহারে অনিদ্রায় ধূলি-ধূসরিত ননীবালা। তার মা। বাবা তাঁকে ডাকলেন না, যতক্ষণ পারলেন দু-চোখ ভ'রে টুনিকেই দেখলেন, তারপর এক সময়ে শ্বাস উঠলো তাঁর। চোখের পাতা দুটি বন্ধ ক'রে বুকের ওঠাপড়ায় অধীর হ'য়ে উঠলেন তিনি। টুনি হাত বুলিয়ে দিলো, মুখে মাথায় জল দিলো, তিনি ঠোঁট নাড়লেন বারে-বারে।

সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, রাত ঘন হ'তে-হ'তে মুষলধারে ঝরতে লাগলো, ঘরে জল পড়তে লাগলো টুনিদের ফুটো চালের কোণ চুঁইয়ে, দারুণ ঝড়ের বেগে মনে হ'লো বেড়াগুলো বুঝি এখুনি উড়ে যাবে। প্রিয়নাথবাবু তারই মধ্যে শ্বাস টানছেন আর টুনি ব'সে-ব'সে দেখছে তিল-তিল ক'রে একটা জীবনের অবসান।

শোক নয়, তাপ নয়, ভয়-ডর কিছুই না, অদ্ভুত একটা বোবা ব্যথা আর মৃত্যুর মুখোমুখি ব'সে দুরন্ত একটা কৌতূহল। কিসের কৌতূহল তা সে জানে না, তবু তাকিয়ে আছে একাগ্র হ'য়ে, কেমন ক'রে কোথা দিয়ে কে এসে এই এতোদিনকার মানুষটির প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তা দেখবার জন্য।

তারপর রক্তজবা কাপড় প'রে, পাথরের মতো শক্ত নিষ্ঠুর বুকের উপর বলিষ্ঠ দুইহাত জড়ো ক'রে, সূর্যের মতো ঝলসানো এক মেঘের মূর্তি এসে দাঁড়ালো সামনে। তার অমানুষিক আকৃতির দিকে তাকিয়ে টুনি সভয়ে ব'লে উঠলো, 'কে? কে আপনি? কেন এসেছেন? কাকে চান?'

মৃদু হাস্যে সে বললো, 'তোমার বাবার এইমাত্র আয়ু শেষ হ'লো। তাঁকে তাই এখন বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

টুনি বললো, 'ও, তাহ'লে আপনিই দেবতা যম? কিন্তু আপনি কেন এই ঝড়ে জলে কষ্ট ক'রে এলেন, আপনার দূতেরাই তো আসতে পারতো।'

এ-কথায় যম খুশি হ'য়ে সহাস্যে বললো, 'তোমার বাবা যে পরম ধার্মিক, সেজন্যে আমি নিজেই এলাম।' এই বলামাত্রই বেঁচে থাকার সমস্ত চেষ্টা থেকে মুহূর্তে বিরত হলেন প্রিয়নাথবাবু। আর তিনি শ্বাস টানলেন না। টুনি দেখলো তাঁর দেহ থেকে তাঁরই বুড়ো-নখের সমান একজন মানুষকে টেনে বা'র ক'রে নিয়ে এলেন যম, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

চোখ মুছে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো টুনি। তন্দ্রা ভেঙে উপলব্ধি করলো এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো ব'সে। আর বাবা? বাবা কেমন আছেন? কী আশ্চর্য! এতোক্ষণ তাঁর বুকের উপরই সে ঘুমোচ্ছিলো মাথা রেখে। 'বাবা। বাবা গো!' প্রিয়নাথবাবুর নিশ্বাসহীন মুখের দিকে তাকিয়ে হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলো সে।

সকাল হ'তে-হ'তে ঝড় থামলো, বৃষ্টি থামলো, কান্না থামলো, আকাশ জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো।

আজ প্রায় চার মাস নির্মলের কোনো চিঠি নেই, টাকা নেই, খবর-বার্তা কিচ্ছু নেই। টায়েটুয়ে খেয়ে-না-খেয়ে কোনোরকমে দিন চলছিলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। এখন একেবারে শূন্যের অঙ্কে ঠেকেছে। মৃতদেহও যে সৎকার হবে এমন একটি পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই তাদের। ননীবালা

চোখের জল মুছে ছুটলেন প্রতিবেশীদের ঘরে, টুনি ব'সে রইলো মড়া ছুঁয়ে। কিন্তু কে আর শুনবে ননীবালার কথা? এতোদিন না ননীবালা বড়ো ধরাকে সরা জ্ঞান করেছেন, এখন আবার আমাদের কিসের দরকার?

গ্রামের লোক শত্রু হ'য়ে উঠেছে সুযোগ বুঝে। ভাবী জামাই নিয়ে বেলেল্লাগিরির শোধ তুলবে না এবার? ভেবেছিলো বুঝি এক মাঘেই শীত যাবে, না? বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে জঙ্গলে বাস আর কুমিরের সঙ্গে লড়াই ক'রে জলে বাস আর ললিতবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে রাধানগরে বাস, এ তিনই সমান অসম্ভব।

মুখে চুনকালি মেখে ফিরে এলেন ননীবালা। কেউ এলো না মড়া পোড়াতে। কেন আসবে? অপদার্থ একটা ঠ্যাংভাঙা স্কুলমাস্টার, এক পয়সার যার মুরোদ নেই, সে কিনা শুয়ে-শুয়েই কালো বেড়ালের মতো বিশ্রী মেয়েটাকে দেখিয়ে তুক ক'রে ফেললো অমন একটা উপযুক্ত, গ্রামের সেরা ছেলেকে? আর তারা সব গোলাপি মেয়ে নিয়ে রুপোর তোড়া গলায় বেঁধেও গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে গেলেন বিয়ে দিতে? ললিতবাবুর চিরদিনের রোখ এই নির্মল, তাকে পর্যন্ত হঠ খাইয়ে দিলো ওরা?

বেশ। এখন বুঝুক তার ফল। মেয়ের বিয়ে না-দিয়েই পায়ের উপর পা তুলে জামাইয়ের রোজগারে তো দিব্যি চলছিলো। মাসে-মাসে মনি-অর্ডারে সই চলছিলো চমৎকার। গেলো কোথায় সব? তখন তো কই আমাদের কথা মনে ছিলো না, এখন এসেছো কেন? জামাই-ই আসুক। উদ্ধার করুক কাজ।

আস্তে-আস্তে নরম রোদ ছড়িয়ে পড়লো উঠোনে, চালের ফাঁকে, ঘরের মেঝেতে। ভেজা মাটি শুকিয়ে গেলো, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হ'লো তপ্ত ধরণী। চারদিকের গাছপালা স্নিগ্ধ সবুজে মনোহর

হ'য়ে উঠলো। বাবার মৃতদেহ ছেড়ে একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো টুনি, আবার ঘরে ফিরে গেলো।

ভাঙা তক্তপোশে লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছেন প্রিয়নাথ, চোখ দুটি বোজা। শান্ত, সমাহিত। এতোদিনের সব গ্লানি নিঃশেষে মুছে গেছে জীবন থেকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত টুনি চাদর চাপা দিয়েছে একটা, মাথার বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়েছে, হাত দুটি টান-টান হ'য়ে প'ড়ে আছে দু-পাশে। মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ঢেউয়ের মতো কান্না গড়িয়ে এলো টুনির। হাত রাখলো কপালে। ঠাণ্ডা। হিমের মতো ঠাণ্ডা। টান-হ'য়ে-থাকা একটা হাত ঝুলে পড়েছিলো খাট থেকে, সেটা তুলে দিতে গিয়ে যেন ছিটকে স'রে এলো। কী শক্ত! মরলে মানুষ কি এই রকম শক্ত হ'য়ে যায়? না কি এতোক্ষণ প'ড়ে আছে ব'লেই এ-রকম হ'য়ে উঠছে?

আর টিঁকতে পারলো না টুনি। দৌড়ে বেরিয়ে এলো, উঠোনে নামলো, উঠোন পেরিয়ে খোলা চুল হাতে জড়াতে-জড়াতে প্রতিবেশীদের সকলের দরজায় গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলো, 'দয়া করুন। দয়া করুন। বাবাকে আপনারা সৎকার ক'রে দিন। তাঁর তো কোনো অপরাধ নেই। তিনি তো কোনোদিন আপনাদের কোনো ক্ষতি করেন নি। আমাদের যে শাস্তি হয় দিন, কিন্তু মৃত মানুষটাকে দয়া করুন আপনারা।'

সব মুখ ফিরিয়ে চুপ।

বেলা দুই প্রহরে যখন সহস্র পিঁপড়ের দল প্রায় ছেয়ে ফেলেছে প্রিয়নাথকে, নীল মাছিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে, ঘামতে-ঘামতে সুশীলা-পিসি এসে হাজির। সর্বঘটে তিনি নারায়ণ। হলুদের গুঁড়ো। সব সময়ে সকলের বিপদেই তিনি আছেন বুক পেতে। অথচ তাঁর কোনো সামাজিক পরিচয় নেই, অতীত ইতিহাস তাঁর কলঙ্কিত। সাত বছর বয়সেই বিধবা হ'য়ে বাপের ঘরে বাস করছিলেন।

রূপের জৌলুসে মধুর মোহে প্রজাপতির মতো সব ছেলেছোকরার দল ইটপাটকেল ছুঁড়তো তাঁর শোবার ঘরের টিনের চালে, একবার ঘরের বেড়া কেটে কোন মহামান্য মাতব্বর নাকি ঢুকেও ছিলেন গভীর রাত্তিরে। ঝোলানো রামদা নিয়ে এমন তাড়া করেছিলেন এই সুশীলা-পিসি যে তখন আর বাছাধন পালাতে পথ পান না। সেই থেকে আর-কেউ বড়ো এগুতো না কাছে। বুঝেছিলো যে মানুষটির রূপই শুধু জলন্ত নয়, গুণেও সে জ্বালিয়ে ছাড়ে।

হঠাৎ এই মানুষই একদিন নুয়ে পড়লো, দুর্বল হৃদয় নিয়ে ছটফট করলো আপন মনে। বলা নেই, কওয়া নেই কাশি চ'লে গেলো হঠাৎ। ঘরে-ঘরে কমিটি ব'সে গেলো কেচ্ছার, যত নোংরা কথার ছড়াছড়ি চলতে লাগলো মুখে-মুখে, যত কুশ্রীতার ঘোঁট। একঘরে হলেন সুশীলার বাবা, সুশীলার মা কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললেন। তারপর একদিন মাথা মুড়িয়ে গলায় তুলসীর মালা দিয়ে আগুনের মতো সুশীলা আগুনের মতোই গনগনিয়ে এসে দাঁড়ালো। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, চোখে সূর্য হেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে একুশ বছরের মেয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলো, 'আয়, কে আসবি আয়। কোন সতী মায়ের সতী পুত আছিস এ-গাঁয়ে, একবার আয়, আমি দেখে নিই তোদের। উল্লুকের ঝাড় সব, শুয়োরের পাল। সব ঘরের খবর আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। কার বুকের পাটা আছে তার প্রতিবাদ করবি আয়।'

ব্যস। সব ঠাণ্ডা। সব চুপ।

আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, সততায় মমতায় সকলের কাছেই সুশীলা-পিসি সমান। তাঁর কাছে ছোটো নেই, বড়ো নেই, ধনী নেই, দুঃখী নেই, যেন দেবতার মতো বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গ্রামে। বুড়ো হ'য়ে গেলেন এই করতে-করতে। গ্রাম থেকে একটু দূরে এক বিয়েবাড়ির

রান্নার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো তাঁকে, এইমাত্র ফিরে সব শুনে ছুটে এসেছেন তাড়াতাড়ি।

এসেই তিনি একলা একশো হ'য়ে দাঁড়ালেন বুক পেতে। পুরুষের মতো বলিষ্ঠ হাতে ধরাধরি ক'রে উঠোনে নিয়ে এলেন প্রিয়নাথের মৃত-দেহ। চারপাশে কৌতূহলী জনতাকে এক দাবড়ায় কাঁপিয়ে দিয়ে মড়া ছুঁয়ে মেঘ-ছেঁড়া রোদের আলোয় ভরা উজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকের উপর ছুটি নরম হাত যুক্ত ক'রে উঁচু গলায় চিৎকার করলেন, 'হে গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ! হে আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তেত্রিশকোটি দেবতা! তোমরা সব সাক্ষী। আজ যারা এই মড়া সৎকার করলো না, বিপদে এগিয়ে এলো না, এই রকম সময়েও শেয়াল-কুকুরের চেয়ে অধম ব্যবহার করলো, তাদের তোমরা দেখো।' মটমট ক'রে সুশীলা-পিসি ছুই হাতের দশ আঙুল ফোটালেন। তারপর আবার হাত জোড় ক'রে বললেন, 'মরবে, মরবে। সবাই মরবে একদিন। টাকার গরমে আজ যতই চক্ষু গরম করুক সেখানে সবাই সমান। হে মুকুন্দ মুরারি, তখন যেন এর উপযুক্ত শাস্তি হয়।'

টুনি তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে, দেখছে, শুনছে। মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশের তলায় যুক্তকর মুদ্রিতচোখ সুশীলা-পিসিকে মনে হচ্ছে দেবীর মতো, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো। যিনি সব আপদে সব বিপদে সকল মানুষের শান্তি।

আর, আশ্চর্য! দেখতে-দেখতে পিলপিল ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সব কর্তার দল, এগিয়ে এলো গুটিগুটি। নাকের ডগায় চশমা রেখে ঘোলাটে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো তারা, 'এ-সব কী ব্যাভার তোমার সুশীলা? মড়া ছুঁয়ে অপরাহ্ণ বেলায় এ-সব শাপমুন্যি? কী! তুমি ভেবেছো কী?'

সুশীলা-পিসি যেন দেখলেনই না তাদের, ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন,

'ওরে আয়, আয়, টুনি আয়, মা কই তোর? চল তিনজনে ধরাধরি ক'রে হরিধ্বনি দিয়ে তোদের পুকুরঘাটে নিয়ে যাই। তুলসীর ঝোপ আছে সেখানে। প্রিয়নাথ নিজেই তো নারায়ণ, নারায়ণেই মিশে থাকুক। আর কাঠকুটো যা লাগে আমি টোনা ডোমকে দিয়ে এখুনি জোগাড় করিয়ে আনছি। আর সেইসঙ্গে অনাথঠাকুরকেও নিয়ে আসবো'খন, আবার তো নিয়ম-কাস্থন আছে কিছু। দেখিস, আমি যাওয়ামাত্রই যেন শকুনি-গৃধিনীগুলো এসে মড়া না ছোঁয়। চ্যালা-কাঠ নিয়ে ব'সে থাক।'

বাবার মাথার কাছে নিচু হলেন স্থশীলা-পিসি, 'প্রিয়নাথ, তুমি আমার ভাইয়ের বাড়া, গ্রামের অনেকগুলো পশু-পক্ষীর মধ্যে একটা মাস্থষ, চলো, তোমার শেষ কাজ আজ আমিই উদ্ধার করি।'

দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো টুনির। শোক নয়, তাপ নয়, একটা অপূর্ব পবিত্র দুঃখের অস্থভূতিতেই যেন গ'লে গেলো সে। জ্বলন্ত তাপে শীতল চন্দনের মতো স্থশীলা-পিসিকে সেদিন জড়িয়ে ধ'রে ঠাণ্ডা হয়েছিলো টুনি। ভালোবাসার আবেগে কাঁপছিলো বুকের ভেতরটা। বাবার মৃত্যুর অত বড়ো দুঃখটাও সহনীয়, রমণীয় হ'য়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে।

....চার

সব শেষ হ'য়ে গেলো। হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির ফাঁকের কতকালের সিঁদুররেখাটি ঘ'ষে-ঘ'ষে তুলে দিয়ে থান প'রে ঘরে এলেন ননীবালা। টুনি তেমনি ব'সে রইলো মাথায় হাত দিয়ে পুকুরধারে। টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে ডুবতে ইচ্ছে করলো তার।

কিন্তু সময় তো কাটলো তবু। টুনিও মরলো না, টুনির মা-ও মরলো না। সেই শূন্য বাড়ির ভাঙা ভিটে আঁকড়ে ধ'রে দিনরে পর দিন

খেয়ে, না-খেয়ে, অর্ধাশনে থেকে তবু তারা বেঁচে রইলো। নির্মলের আর কোনো খবর পাওয়া গেলো না, ভাবনায় চিন্তায় ভয়ে দুঃখে কত আলোড়ন উঠলো বুকের ভেতর, মনে হ'লো বুঝি ফেটে যাবে, আশ্চর্য, তবু— তবু ম'রে গেলো না টুনিরা।

ননীবালা কপাল কুটলেন। কত চিঠি লিখলেন। কত কান্না, কত রাগ, কত অভিমান। চুপ। টুনির রাত ভেসে গেলো, দিন ভেসে গেলো, চোখের জলের ঝাপসা আলোয় জগৎ-সংসার মিথ্যে হ'য়ে গেলো, তবু নির্মল চুপ। 'কেন ? কী হ'লো ? তোমার কী হ'লো ? তুমি কেমন আছো ? শুধু সেইটুকু, সেইটুকু আমাকে জানতে দাও। তুমি আছো তো ? না—কি—'

একটা সুদীর্ঘ হাহাকারে বুক চেপে ধ'রে মাটিতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে যায় টুনি, প'ড়ে থাকে গিয়ে বনতুলসীর ঝোপে, স্তম্ভিতের মতো শ্মশানের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। এমন যে মুখরা ননীবালা, সে-ও একটা কথা বলতে সাহস পায় না মেয়েকে। সন্তর্পণে চলে, ফেরে, ঘটিবাটি বন্ধক দেয়। অতি কষ্টের ছাড়িয়ে-আনা-গলার-হারটা বিক্রি হ'য়ে যায় অর্ধেক দামে। তামার পাতের চুড়িটাও কি আর থাকে ? যায়। সব যায়। কেবলমাত্র প্রাণ দুটি ছাড়া। ননীবালা সময়ে-অসময়ে কেঁদে ওঠেন গলা ছেড়ে, 'হায়, হায়। এ আমি কী করলাম। কী করলাম।' টুনি মা-র সেই ক্রন্দনরত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠাণ্ডা চোখে। এই বুক-ভাঙা অনুতাপের কান্না দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তার।

তারপর কোনো এক দারুণ দুর্যোগের রাতে, মেঘের গর্জনে, মুষলধার বৃষ্টিতে, বিদ্যুৎচমকে সারা পৃথিবী যখন ভেসে যাচ্ছিলো, টুনিদের ভাঙা চাল দিয়ে অঝোরে জল পড়ছিলো, খ'সে-আসা-বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে

ঝড়ের দাপট ক্রমাগত হুমকি ছাড়ছিলো উন্মত্ত বিক্রমে, তখন ছেঁড়া মাদুরে, ছেঁড়া বালিশে, শতছিন্ন মলিন বসনে চুপচাপ ভিজে সারাটি রাত সারা ঘরময় একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য, এ-কোণ থেকে ঐ কোণ, ছুটোছুটি করতে-করতে ক্লান্ত টুনি একসময়ে স্থির হ'য়ে বসলো। বললো, 'মা, আর না। চলো এবার চ'লে যাই আমরা।'

ননীবালা কেঁদে উঠলেন, 'কোথায় যাবি ? কে আছে আমাদের ?'

কে না ছিলো ? একজনই তো সব জন হ'য়ে ঘিরে ছিলো জীবন। দু-হাতে বৃষ্টির ছাঁট সামলে নিয়ে সহজ গলায় টুনি বললো, 'কলকাতা যাবো। তোমার কোনো আত্মীয় নেই ? চেনা নেই ?'

'থাকলেই বা এমন কে আছে যার বাড়ি গিয়ে আমরা উঠতে পারি ? তাছাড়া বোমা পড়ছে, যুদ্ধ লেগেছে।'

'যুদ্ধ!' টুনি ভেজা মুখে কেমন একরকম হাসলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তোমার এক মামা ছিলেন না কালিঘাটে ?'

'মামা ?'

'একবার আমাদের এখানে এসেছিলেন বেড়াতে ? বাবা ভালো ছিলেন তখন।'

কপালে করাঘাত হানলেন ননীবালা, 'হায় রে কপাল। তারা কি আজ চিনবে আমাদের। সুখের দিনে অমন মামা-মাসি অনেক থাকে।'

'মা।'

'উঁ।'

'সেখানেই চলো।'

'পাগল !'

'ঠিকানা জানো ?'

'তা জানবো না কেন ? সে তো আমার মুখস্থ। কালিঘাটে সেবার

পৌষকালি উৎসব হ'লো, বরেনমামা নিজে এসে কত গরজ ক'রে নিয়ে গেলেন। তোর বাবা পুকুর থেকে দশ সের ওজনের এক বিরাট রুইমাছ ধরিয়ে দিলেন, তালপাটালি নিলাম পাঁচ সের, সে কত ধুম-ধাড়াক্কা—'

'তবে আর কী। কলকাতায় আমরা সেখানে গিয়েই উঠবো।'

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'না, সে হয় না। বরেন মিত্তির আমার সম্পর্কের মামা নয়। গ্রাম-সুবাদে— কেবল ডাকাডাকি।'

'তা হোক।' টুনি অস্থির বেগে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো, 'আর আমি এখানে থাকতে পারছি না মা।'

ননীবালা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে বললেন, 'উপায় কী? সেখানেও তো এই দুঃখই। কী খাবে, কী পরবে।'

'দুঃখ কি কেবল খাওয়া-পরারই। তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি দুঃখ এখানে, এ-বাড়ি আমাকে দিনরাত চিবিয়ে খাচ্ছে। না মা, না, এখানে আর নয়। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবো কলকাতা গিয়ে, লোকের বাড়িতে বাসন মাজবো। হয়তো বা কোনো-একদিন তার সঙ্গে—' চুপ করলো টুনি।

ননীবালাও চকিতে একবার মেয়ের মুখে চোখ বুলিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। নির্মলের শতস্মৃতি-জড়ানো এই গ্রাম, এই বাড়ি, এই বাড়ির আনাচ-কানাচ যে তাঁর মেয়ের কাছে কত অসহ্য তা তিনি ঠিক অতটা বুঝে উঠতে না-পারলেও কিছু বুঝলেন।

সব শুনে সুশীলা-পিসি বললেন, 'কেন যাবি? গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে? অমন একটা না-জানা না-চেনা শহরে এমন হুট ক'রে কেউ যায়? আর তার মধ্যে সেখানে তো শুনছি সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে, আকছার সেই গোরা পল্টনগুলো বেইজ্জত করছে মেয়েদের।'

ননীবালা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এখানেই বা কী ইজ্জতে আছি ঠাকুরঝি ? মান নেই, সম্মান নেই, সমাজ নেই, খিদেয় ধুঁকে মরলেও খাবার নেই। আর মাথার চালখানা তো দেখছো।'

সুশীলা ব্যথিত গলায় বললেন, 'তবু তোরা যাসনে। আমি বলছি যাসনে। গেলে শেষে পস্তাবি। থাক না আর ক'টা দিন কষ্ট স'য়ে। ছ্যাখ না কী হয়।'

'কোনো আশা নেই।' ননীবালা কপাল চাপড়ালেন, 'এতো বড়ো মেয়ে গলায়, দু-দিন পরে তো সেই অপরাধেই কর্তারা আমাদের তাড়িয়ে দেবে গ্রাম থেকে।'

'ঈশ্। দিলেই হ'লো। কেন, মাথার উপর কি ভগবান নেই নাকি ? তিনি দেখছেন না ?'

'আর তিনি !'

তেলহীন রুক্ষ চুলে একটা থামের হেলানে এলিয়ে-ব'সে-থাকা টুনির একটু হাসি ফুটলো এ-কথা শুনে। তিনি তো সত্যিই দেখছেন। তা যদি না-ই দেখতেন তবে আর এই শাস্তি কিসের ? ননীবালার কি আজ মনে হচ্ছে না সে-কথাটা ?

সুশীলা-পিসি তাকে টেনে নিলেন কাছে, 'আয়, চুল বেঁধে দিই। এমন সুন্দর তোর চুল, সব যে উঠে যাবে অযত্নে। তখন নির্মল এসে বলবে কী ?'

হঠাৎ ননীবালা ঠংঠং কপাল ঠুকতে লাগলেন বারান্দার থামে, 'ঠাকুরঝি, আমার দোষেই এই হ'লো।'

'তবে শোনো বলি,' সুশীলা-পিসি ফিসফিস করলেন, 'আমি জানি নির্মল তোমাদের ঠিকই চিঠিপত্র লেখে, কিন্তু তোমরা পাও না।'

'অ্যাঁ ?'

'এই যে গ্রামের কতকগুলো নরক আছে না, যেগুলোকে যমও নিয়ে যেতে ভয় পায় সেগুলোই সব শলা-পরামর্শ ক'রে ডাক আটকাচ্ছে। গাপ করছে চিঠিপত্র। টাকাকড়ি।'

'তুমি ঠিক জানো ঠাকুরঝি?'

'জানবো না কেন? খুব জানি। তবে হাতে-নাতে কি আর ধরা যায়?'

'কে, কে সেই পাষণ্ড, আমি একবার যাবো তার কাছে, আমি দেখে নেবো তাকে—' ননীবালার চোখ আগুনের মতো জ্বললো, নাকের বাঁশি ফুলে-ফুলে উঠলো।

সুশীলা-পিসি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব? এতো বড়ো অন্যায় করবে, তার কি কোনো প্রতিবিধান নেই?'

'কিছুই নেই সহ্য করা ছাড়া। তোদের হাতে কি কোনো প্রমাণ আছে? পিওন ব্যাটা ওদের মুঠোয়, আর ঐ হারামজাদা রামসদয়টা, সেটা কি একটা সোজা ভেড়া? ওদের ভয়ে যেন একেবারে কাঁপে। আমি বলি, তুই ব্যাটা একটা পোস্টমাস্টার, তুই-ই যদি জেনেও না-জানি ভাব দিস, দেখেও না-দেখি ভাবে চোখ বুজে থাকিস, তবে যা না, গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মর গিয়ে। নয়তো লাল-পাড় শাড়ি প'রে হাতে চুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়া।'

'তার চেয়ে বড়ো কোনো জায়গা নেই ঠাকুরঝি, যেখানে নালিশ করলে এর সাজা হয়?'

'তা কি আর না আছে বোন। কিন্তু পরামর্শ দেবে কে? ছুটোছুটি করবে কে? দুটো মেয়েমানুষ তোরা, এতোগুলো লোকের বিরুদ্ধে এই গাঁয়ে ব'সে কী করতে পারিস?'

'তবু— তবুও তুমি আমাদের থাকতে বলো পিসি!' টুনি আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরলো সুশীলা-পিসিকে।

পিঠে হাত বুলিয়ে সুশীলা হাসলেন, 'তবু বলি মা, তবু বলি। মিথ্যা একদিন প্রকাশিত হবেই, একদিন সে নিজেই আসবে। বুঝবে সব।'

ননীবালা বললেন, 'কিন্তু নির্মলই বা কেমন, ঠাকুরঝি? এই যে ফেলে গেছে, একবার তো তার আসা উচিত।'

'আসবে।'

'আর আসবে! যুদ্ধে গেলে মানুষ মানুষ থাকে না। মায়া-মমতা ভুলে যায়। কিন্তু আমরাও তো কত চিঠি লিখি তা তো সে পায়?'

'তোমাদের চিঠিও যায় না ওর কাছে। ডাকবাক্স থেকেই নষ্ট হ'য়ে যায়। মাথা নাড়লেন সুশীলা-পিসি, 'অনাদি কী বলে জানো? টুনির নামে নাকি যত জঘন্য-জঘন্য কথা লিখে পাঠাচ্ছে ওরা। টুনি কার সঙ্গে ভাব করেছে, কার সঙ্গে পালিয়ে গেছে, আবার কাকে বিয়ে করেছে। এই সব আর কী। কী আর বলবো, এমন একটা নরককুণ্ড গ্রাম আর কোনোখানে নেই।'

স্তম্ভিতের মতো ব'সে রইলো টুনি আর টুনির মা। আর কোনো কথা ফুটলো না মুখে।

হায় রে নির্মল! তুমি কি জানো তারপর কেমন ক'রে একদিন মা আর মেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে, গ্রামের আল বেয়ে, ঢাল বেয়ে, ঝোপঝাড় বনবাদাড় ডিঙিয়ে, লোকচক্ষুর আড়ালে-আড়ালে পাঁচ মাইল রাস্তা ডিঙিয়ে স্টেশনে এসেছিলো। গাড়ির সময় জানে না তারা, কোন গাড়ি কোথায় যায় তাও কি তারা জানে? চাদরে মুখ ঢেকে টিকিট কিনে প্রত্যেক মুহূর্তের ভয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে ম'রে গিয়ে— দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে কেবল অনন্তকাল অপেক্ষা। নীরব স্টেশনের কোনো-একটি নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকতে-থাকতে অপেক্ষাটা অনন্তকালই মনে হয়েছিলো। কত সন্দিগ্ধ চক্ষু তখন পীড়িত করেছিলো দু-জন অসহায় মানুষের দেহকে তাও আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। সঙ্গে পুরুষ নেই এটা কি সেই গ্রামের পক্ষে একটা কম কথা! কিন্তু না, কেউ জিগ্যেস করে নি কিছু, কোনো চেনা মুখ সেদিন ছিলো না সেই স্টেশনে।

ঘন রাতে যখন হাওড়া স্টেশনে এসে নামলাম, অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায় কী মনে হ'লো তখন আমাদের? কলকাতা শহরের আমরা কী চিনি? কী জানি? গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে এসেছে। দু-জন দু-জনের হাত ধ'রে কাঁপা-কাঁপা পায়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। টুপি-পরা সব রহস্যময় ভয়-পাওয়ানো আলো, এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটোনো জনতা। মা অস্ফুটে ডাকলেন, 'টুনি।'

টুনি অস্ফুটে জবাব দিলো, 'মা।'

তারপর আবার চুপ।

শাদা পোশাক পরা, কালো ব্যাণ্ডের টুপি মাথায় কোনো সহৃদয় রেল-কর্মচারী যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। হয়তো বা অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলেন। তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করলেন, 'সঙ্গে আর-কেউ নেই? কোনো পুরুষ?'

মা ঘোমটা টেনে বললেন, 'না।'

'কোথায় যাবেন?'

'কালিঘাট।'

'কত নম্বর?'

'একচল্লিশের বি, বরেন মিত্তিরের বাড়ি। আপনি কি চেনেন সে-বাড়িটা?' মা-র গলা ব্যাকুল শোনালো।

রেল-কর্মচারীটির মনে যদি বা তাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের কারণ ঘ'টে থাকে তাহ'লে মা-র সেই আনাড়ি ব্যাকুল প্রশ্নেই হয়তো কেটে গেলো। মৃদু হেসে নরম গলায় বললেন, 'না মা, সে-বাড়ি আর আমি কি ক'রে চিনবো।'

'তবে কেমন ক'রে যাবো ব'লে দিতে পারেন?'

'এখান থেকে পাঁচ নম্বর বাসে চড়লেই আপনি কালিঘাটে গিয়ে নামতে পারবেন। কণ্ডাক্টরকে ব'লে দিলে সেই নামিয়ে দেবে ঠিক জায়গায়, তারপর নম্বর মিলিয়ে নেবেন। কিন্তু এখন এই রাত বারোটায় তো আপনি যেতে পারবেন না।'

মা আতঙ্কিত হ'য়ে বললেন, 'কেন?'

'আপনারা কি জানেন না রাত দশটার পরে আজকাল সব বন্ধ হ'য়ে যায়। কেউ রাস্তায় বেরোয় না। জাপানিরা যে রেঙ্গুন এসে গেছে। এই তো পরশু বোমা পড়লো।'

মা চুপ।

'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'রাধানগর।'

'সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই দেখছি।'

'না, বাবা।'

'নগদ টাকাকড়ি বা গয়না-পত্র?'

আমাদের আবার টাকাকড়ি আর গয়না-পত্র। সম্বলের মধ্যে তো সেই হারমনিয়ম আর গ্রামোফোন বিক্রির অবশিষ্ট বাহান্নটি টাকা।

তাও তুমি! তোমারই টাকা। নির্মল। তুমি ছাড়া আর আমার কী ছিলো তখন? মন, প্রাণ, অস্তিত্ব সবই তো তুমি। তোমাতেই জড়ানো। সেই তুমি দেখলে না, জানলে না, কোনোদিন ধারণাও করতে পারবে না

তোমার সেই টুনিকে, সেই অনাদৃত লাঞ্ছিত প্রিয়নাথের ততোধিক নির্যাতিত মেয়ে রাধানগরের সেই সন্ধ্যামণি দত্তমল্লিককে জগৎ থেকে মুছে ফেলে আজকের দিনের এই মানসী দত্তে পৌঁছে দিতে আমাকে কত দীর্ঘ রাত্রি পার হ'তে হয়েছিলো। দুঃখের কী মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে আকণ্ঠ জলের পিপাসার পরে এই জলের স্পর্শ।

মা মুখ তুলে বললেন, 'আমরা বড়ো গরিব। আমাদের সঙ্গে সে-সব কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে আপনারা এক কাজ করুন। আমি ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং-রুমটা খুলে দিই আপনাদের, রাত্তিরটা সেখানেই থাকুন। তারপর কাল সকালে যেখানে যাবার যাবেন।'

বিশ্বাসে ভর ক'রে গুটিগুটি এগুলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি শুধু ঘরে পৌঁছে দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন না। একটা কুলিকে ডেকে পাহারায় রাখলেন, খাবার আনিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'তবে আমি যাই?'

মা দুই চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন। হয়তো বা বিস্ময়। মানুষ মানুষের শত্রু, এটাই তো বহুদিনের অভিজ্ঞতা তাঁর।

কিন্তু সূর্য উঠলেই তো আর সকাল হয় না? টুনিদেরও সকাল হ'লো না। বাসে চ'ড়ে কালিঘাটে নেমে, রাস্তার প্রত্যেকটি বাড়ির নম্বর দেখতে-দেখতে, রাস্তার প্রত্যেকটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে-করতে ভীত-চকিত দুটি মানুষ হয়রান হ'য়ে বরেন-মামার দরজায় এসে কড়া নাড়লো, দরজা খুলে দিয়ে প্রথমে মামার বড়ো মেয়ে দুটি অবাক হ'লো, তারপর মামী নিজে, আর তারপর আপিশ থেকে ফিরে মামা। মেয়ে দুটির অবাক হওয়ার সঙ্গে তাদের মা-বাবার অবাক হওয়ার অবিশ্যি কোনো সম্বন্ধ ছিলো না। মেয়ে দুটি কখনো ছাখে নি তাদের, তাছাড়া তাদেরই সমবয়সী

যে-মেয়েটি মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো দরজা ধ'রে, তার বেশভূষা দেখেও হয়তো অবাক হ'য়ে থাকবে। কেননা সেই অতি জীর্ণ, অতি দুঃখী টুনির সঙ্গে এদের মিল কোথায় ?

কিন্তু মামা মামী অবাক হলেন তাদের অবিমৃষ্যকারিতায়। কত-কালের মধ্যে দেখা নেই, শোনা নেই, সত্যি বলতে যাদের সঙ্গে কোনো ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক নেই, তারা যে এমন বেয়াকুবের মতো খেতে-পরতে এখানে এসে উঠতে পারে এ যেন তাঁরা ভাবতেই পারলেন না। শুধু থ হ'য়ে রইলেন। দোষই বা কী। একে তো কলকাতা শহরে নিজেরা থাকাই দায়, দু-খানা ঘরের ফ্ল্যাটের মধ্যে ঠাসাঠাসি গুঁতোগুঁতি, তার উপরে এই সেদিন গুচ্ছের ক্ষতি ক'রে বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আট মাস থেকে কত কাণ্ড ক'রে আবার কলকাতা এসেছে. আর তার উপরে এই ?

ননীবালা একেবারে হাত জড়িয়ে ধরলেন মামীর। 'কয়েকটা দিন, মামী, কয়েকটা দিন থাকতে দাও আমাদের। তার বদলে যা করতে বলবে তাই করবো।'

মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'না, না, এসেছো যখন তখন থাকবেই তো, কিন্তু কথাটা হচ্ছে গিয়ে, মানে প্রিয়নাথ এমন অনাথ ক'রে থুয়ে মরলো কেন ?'

তাই তো। কেন মরলো তার কৈফিয়ৎ কে দেবে।

কিন্তু তাদের নিয়ে তখন খুব কি অসুবিধে হয়েছিলো মামা মামীর ? এখন ভাবলো মানসী। ঠাকুর ছিলো না রান্নার, ননীবালার সাহায্যে সে অভাব তাদের খুব ভালো ক'রেই পূরণ হয়েছিলো। সাত সন্তানের জননী বরেন-মামার স্ত্রী বাঁচলেন আগুনের উত্তাপ থেকে। আর টুনি ? সে-ই

কি কোনোদিন একদণ্ড বসতে পেরেছে সেখানে? বোমার সময়ে ঝিয়েরা একজনও ছিলো না সেই শহরে। তবে? আর যে-বাড়িতে একুশ থেকে এক বছরের পর্যন্ত বাচ্চার ভিড়, তাদের নাওয়াতে হয় নি? খাওয়াতে হয় নি? কাঁথা-কাপড় কাচতে হয় নি? ঘুম পাড়াতে হয় নি? পড়াতে হয় নি অ আ, ক খ? বড়োদের রাশি-রাশি কাপড়-জামার স্তূপ বাথরুমে, মামীর শুচিবায়ুর দোষ, কেবল মোছো আর ঝাড়ো। কিন্তু লোক কই। এই তো টুনি। এতোগুলো লোকের সেলাই-ফোঁড়াই তা-ই বা করবে কে টুনি ছাড়া? সে-বাড়ির বড়ো মেয়েরা তো সকালে পড়ে, দুপুরে স্কুলে থাকে, বিকেলে বেড়াতে যায়, আর সন্ধ্যায় গানের মাস্টার আসে সপ্তাহে তিনদিন ক'রে। তাদের সময় কই?

আবার গান! এখানেও গান।

টুনি অস্থির বোধ করে আর ননীবালা স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন যখন গান শেখে মেয়েরা। রান্না করতে-করতে খুন্তি হাতে অন্যমনস্ক হ'য়ে যান। কী তাঁর মনে পড়ে কে জানে। হঠাৎ একদিন বললেন, 'মেয়েদের গান শেখাও কেন মামী? মেয়েমানুষ, গান দিয়ে হবে কী?'

মামী হেসে আকুল, 'শোনো কথা, গান কি একটা সোজা জিনিস আজকাল? জানো এই গান দিয়ে কত মেয়ে আজকাল কত রোজগার করছে? আর কী নাম, কী খাতির।'

টুনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা-র দিকে। বুকটা কি ধক ক'রে উঠলো মা-র? ভাবে মনে-মনে। মা যে এই নিয়ে এ-কথাটা দু-বার শুনলেন সে-কথা কি মনে পড়লো তাঁর?

মেয়ে দুটির একটি বললো, 'আমার সব চেয়ে বড়ো অ্যামবিশন কী জানো, টুনি?'

বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে টুনি বলে, 'কী?'

'সিনেমায় প্লে-ব্যাক করা। কখনো তো ছাখো নি, তাতে যে গান হয়, আজকাল তো সব প্লে-ব্যাকই করে।'

'প্লে-ব্যাক ?'

'অর্থাৎ আগে ছিলো যে পার্ট করতো তাকেই গান গাইতে হ'তো, এখন কিন্তু তা নয়। সে মুখ নাড়ে, আর অন্য মেয়ে পেছন থেকে গেয়ে যায়।'

'তা-ই নাকি ?'

'হ্যাঁ। একদিন তোমাকে দেখিয়ে আনবো তাহ'লেই বুঝবে। যদি ঈশ্বর আমাকে জিগ্যেস করেন তুমি কী বর চাও, আমি বলবো— সুখ চাই না, শান্তি চাই না, টাকাকড়ি কিছু চাই না বাপু, একবার যেন কোনো সিনেমায় প্লে-ব্যাক করতে পারি।'

টুনি হাঁ ক'রে চেয়ে-চেয়ে শোনে।

'তা-ই তো এতো খাটি এর পেছনে। এই যে আমাদের মাস্টার-মশাইকে দেখছো, ইনি তো নিয়মিত গ্রামোফোনে গান দেন, রেডিওতে গান করেন—'

'ও।'

'ফুটকির কিছু হবে না, কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন, আমি চেষ্টা করলে খুব শিগগির রেডিও আর্টিস্ট হ'তে পারবো।'

'ও।'

'তখন আর পায় কে ? যেমন নাম, তেমন টাকা।'

'টাকাও দেয় ?'

'দেয় না ?'

'কী ক'রে জানবে যে তুমি গাইতে পারো ?'

'কী ক'রে আবার ? আমি যাবো, অডিশন দেবো—'

'অডিশন ?'

'বোকচন্দ্র, এ-ও বোঝো না ?' হেসে গ'লে যায় মেয়েটি। 'তুমি যদি ওদের লেখো যে আমি গান করবো ওখানে, অমনি ওরা তোমাকে অডিশনে ডাকবে অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ে দেখবে তুমি তার যোগ্য কিনা। যদি যোগ্য হও তখন গানের তারিখ দেবে।'

'ও।'

এর পরে মেয়েটি তার নতুন-শেখা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে চ'লে গেলো আঁচল ঘুরিয়ে, ভাবতে বসলো টুনি। হাতের কাজ হাতে রইলো, বাচ্চারা উদ্দাম সুখে তছনছ করতে লাগলো ঘরবাড়ি, খাবার জায়গা দিতে ভুল হ'য়ে গেলো, বকুনি খেলো সক্কলের, তবু সে ভাবতে লাগলো।

সেই ভাবনা কি সেই মেয়েটির একবেলা তুবেলাতেই ফুরিয়ে গেলো ? একদিন তু-দিনেই ফুরিয়ে গেলো ? হাঁটতে, চলতে, ঘর ঝাঁট দিতে, কাপড় কাচতে, বাচ্চাদের নোংরা ঘাঁটতে, ক্লান্তিতে, অপমানে, অসম্মানে ভাঙতে-ভাঙতে তিনটি মাস ধ'রে এই ভাবনা ভাবলে সে।

তারপর একদিন এসে মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'একটা কথা।'

মাস্টারমশায় অবাক, 'কী কথা, মা ?'

তিনি তখন গান শিখিয়ে বাইরে ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। টুনিকে তিনি দেখেছেন, নানা ভাবেই দেখেছেন, মেয়েরা যখন গান শিখতে বসবে তখন শতরঞ্জি বিছোতে দেখেছেন, হারমনিয়ম বের ক'রে এনে দিতে দেখেছেন, বাঁয়া-তবলা ঠিকঠাক রাখতে দেখেছেন, দরকার হ'লে গান গাইতে-গাইতে মেয়েরা যখন হাঁক দিয়েছে 'এই টুনি কয়েকটা লবঙ্গ দিয়ে যাও তো।' কিংবা, 'আদা দিয়ে বেশ কড়া এক কাপ চা ক'রে

আনো তো'— হুকুমমতো সেই সবই মেয়েটিকে নত মুখে তালিম করতে দেখেছেন। অথবা তাদের দু-বছরের ভাই তিলু যখন ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হারমনিয়মের উপর, সব রীডের উপর হাঁটু চেপে বেলো টেনেছে আর একটা বুকচাপা কাতর আর্তনাদ উঠেছে হারমনিয়মে (সেই শব্দটার সঙ্গে টুনি তখন কোথায় যেন নিজের মিল পেয়েছে মনে-মনে), তখনও মাস্টারমশায় ধমক খেতে দেখেছেন টুনিকে, 'করিস কী সারাক্ষণ, ছেলেটাকেও সামলাতে পারিস না?' ভেতর থেকে ওদের মা চেঁচিয়ে উঠেছেন এই ব'লে, আর ভাইয়ের পিঠে চড় মারতে-মারতে মেয়েরা বলেছে, 'কী করো তুমি? হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো? দেখতে পাও না? নিয়ে যেতে পারো না ওকে এখান থেকে?'

শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ ক'রে হাত-পা-ছোঁড়া বাচ্চা ছেলেকে তুলে আনতে রীতিমতো পরিশ্রম হয়েছে টুনির। সেই সবই দেখেছেন মাস্টারমশায়। আজকে হঠাৎ এমন ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে যদি একটা জরুরি কথা বলতে চায় তাঁর সঙ্গে তাহ'লে তিনি তো অবাকই হবেন।

নিঃশব্দ নতমুখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টুনি বললো, 'আপনি তো কত ছেলেমেয়েকে গান শেখান, আমাকে কি একটা কাজ দিতে পারেন না?'

'তোমাকে! তোমাকে আমি কী কাজ দেবো?'

'গান শেখানোর। এই যারা ছোটো, যারা প্রথম শিখছে।'

'তুমি গান জানো?'

'শিখেছিলে কখনো?'

'দেশে থাকতে একটু-একটু—'

'এখানে তো অল্প-অল্প, একটু-একটুতে কিছু হয় না মা, যাচিয়ে, বাজিয়ে, সব দেখে শুনে নেয় যে।'

মাস্টারমশায়ের কথা বড়ো মিষ্টি লেগেছিলো টুনির। ভারি নরম। যেন তার মধ্যে আশা আছে, আশ্বাস আছে। সাহস পেয়ে বললো, 'আর আপনার কাছেও তো শিখছি তিন মাস ধ'রে।'

'আমার কাছে?'

'ওদের শেখান, আমি তো শুনি?'

'তাইতেই কি শেখা হয়? এ বড়ো কঠিন কাজ।'

টুনি চুপ ক'রে রইলো। কে জানে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশায়ের দুঃখ হ'লো কিনা। আস্তে বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করো তুমি। আমার মেয়েকে শেখাও, মাইনে দেবো।'

'আপনার মেয়েকে!' বুকটা কেঁপে ওঠে টুনির। 'আমি আপনার মেয়েকে শেখাবো?'

'সে খুব ছোটো, হাতে খড়ি দিয়ে দাও, শেষে একটু স্বর এলে তখন আমি ধরবো। কেমন?'

প্রায় পঞ্চাশ-প্রৌঢ় গায়ক তার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এলো টুনির।

সেই তো জীবনের শুরু। সেই মাস্টারমশায়। সেই রামেন্দু ভট্টাচার্য। তারপরে যেদিন এলেন তিনি, মেয়েদের গান-টান শিখিয়ে বললেন, 'কই, সেই মেয়েটি কোথায় তোমাদের? ডাকো দেখি।'

'কাকে। টুনিকে?'

পায়ে-পায়ে, ভয়ে-ভয়ে টুনি নিজেই ঘরে এসে দাঁড়ালো। মাস্টারমশায় সস্নেহে বললেন, 'এসো মা, এসো। একটা গান শুনবো তোমার আজ।'

মেয়ে দুটি বিনা ভূমিকায় হেসে উঠলো, 'ও মা, টুনি গাইবে কী। ও গান জানবে কোথা থেকে ?'

'আহা। জানতেও তো পারে ?' কাঁচা-পাকা মাথাটি আন্দোলিত হ'লো মাস্টারের, 'দেখি না।'

টুনি বসলো। পিঠের শিরদাঁড়া ভিজে গেলো ঘামে, ঘামলো কপাল, হাতের তেলো। কিন্তু দাঁড়াতে হ'লে এর চেয়ে সাহস চাই, শক্তি চাই। আস্তে টেনে নিলো হারমনিয়মটি।

মেয়েরা হাসছে মুখ টিপে। মাস্টারমশায় লক্ষ্য ক'রে গম্ভীর হলেন। ততোক্ষণে ভিড় জমেছে ঘরে। ছোটো ছেলেমেয়েরা এসে ঠেলাঠেলি, ঠেসাঠেসি করছে, তাদের মা মোটা শরীরে হাঁপাচ্ছেন, এককোণে রান্না ফেলে ননীবালাও ময়লা কাপড় দরজার আড়ালে ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মনে-মনে টুনি তার দেবতাকে ডাকলো, যে-দেবতা তাকে চিরদিন সাহস জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, খরচ জুগিয়েছে, সকলের সব চোখ-রাঙানি অবহেলা ক'রে হারমনিয়ম কিনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে আঠারো-খানা রেকর্ড স্বদ্ধু গ্রামোফোন। হঠাৎ মা-র দিকে তাকালো সে, করুণ, বিধুর, দুঃস্থ বিধবা। বরেন মিত্তিরের রাঁধুনি। আর আশ্চর্য ! মা-র চোখে তো সে সেই আলো দেখলো। যে-আলো নির্মলের। কোনো গাইয়েকে ডেকে এনে সে যখন টুনির গান শোনাতো, গান শেখাতে অনুরোধ জানাতো, গাইতে ব'সে টুনি তখন তাকাতো নির্মলের মুখের দিকে। ঠিক, ঠিক, এই ভাষা, এই আশা, এই আলো জ্ব'লে থাকতো তখন তার বড়ো-বড়ো চোখ দুটিতে।

মুহূর্তে ভয় ভাবনা লজ্জা দুঃখ সব ভুলে টুনি গেয়ে উঠলো গান। পাখির গান। বনের গান। বন্দনার গান। যে-গান অলৌকিক, যে-গানের স্পর্শে দুঃখ পবিত্র হয়, সুখ ভেসে ওঠে, শান্তি অবগাহন করায়। সেদিন টুনি

হয়তো বা কয়েক মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরকেও নামিয়ে নিয়ে এসেছিলো তার গানের কান্নায়। নির্মল! তুমিও কি সেই মুহূর্তে টুনির কথা ভেবেছিলে? টুনি তো সেই গানের কান্না দিয়ে তোমাকেই ডেকেছিলো, তোমাকেই খুঁজেছিলো। যত কান্না পাষাণ হ'য়ে চাপা ছিলো বুকের মধ্যে, সব তো সে ঝরিয়ে দিয়েছিলো সেদিন। তার ভালো লেগেছিলো। ভীষণ। ভীষণ ভালো। শুধু কি ভালো? গান গাইতে পেয়ে সে যে সেদিন বেঁচেছিলো। একটার পর একটা, একটার পর একটা। এই তিন মাসের মাস্টারমশায়ের গানও বাদ দিলো না সে।

তারপর থামলো।

পার্থিব জগতে ফিরে এসে টুনি হারমনিয়মের উপর ভেঙে পড়লো মাথা রেখে।

আর তারপর?

তারপর তো এই।

রামেন্দু ভট্টাচার্য। ভারতবিখ্যাত প্রোফেসর আলম খাঁর যিনি প্রিয়তম শিষ্য। যাঁর জুড়ি ঠুংরি গায়ক বিরল। খেয়ালের আটঘাট যার নখদর্পণে। আধুনিক গানের জন্মদাতা ব'লে সবাই যাঁকে পুজো করে মনে-মনে। সেই তিনিই তারপর মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন তাকে। তাঁর সব ঢেলে দিলেন এই আঠারো বছরের মেয়েটির গলায়। টুনি পাখি হ'য়ে উড়লো, বাঁশি হ'য়ে বাজলো, তানপুরোর চারটে তার তার গলায় পোষা ময়না হ'য়ে ধরা দিলো। নির্মলের ভবিষ্যতের স্বপ্ন টুনি রাধানগরের সন্ধ্যামণি দত্তমল্লিক নাম বদলে সারা বাংলার কিন্নরীকণ্ঠী মানসী দত্ত হ'লো।

তৃতীয় খণ্ড

....এক

রাত ভারি হ'য়ে উঠেছে, আস্তে-আস্তে লেকের জলে অস্ত গেলো চাঁদ, ঘর অন্ধকার হ'য়ে উঠলো ; দিগন্ত-জোড়া কালো আকাশে সোনার বুটি হ'য়ে ফুটে উঠলো অজস্র তারা। শেষ-ফাল্গুনের এক ঝলক বাতাস মরমর ক'রে পাতা ঝরিয়ে ব'য়ে গেলো হাহাকারের মতো। দূরে চিকচিক ক'রে কেঁপে উঠলো লেকের জল, লাইটপোস্টের আলোগুলো শিহরিত হ'লো জলের তলায়।

ক'টা বাজলো? ভোর হ'য়ে এলো নাকি? পাখিরা তবে ডানা ঝাপটাচ্ছে কেন? মানসী জানালা ছেড়ে এসে দেয়ালের সুইচবোর্ডে হাত রাখলো, আলো জ্ব'লে উঠলো দপ ক'রে। পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ঘর। ধবধবে বিছানার উপর ফরাসি নেটের মশারি। দুধের ফেনার মতো ফুলে-ফুলে উঠছে বাতাসে, দুটো-একটা মশা কালো বিন্দুর মতো লেপটে আছে রক্তের আশায়। মানসী দুই হাতের সংঘর্ষে পিষে ফেললো তাদের। আলপিনের মাথায় এক ফোঁটা লাল কালির মতো একটুখানি রক্ত লেপটে গেলো হাতের চেটোতে। পাৎলা মশারি ঢেউ হ'য়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে স্থির রইলো খানিকক্ষণের জন্য।

রাধানগরেও মশা ছিলো। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলেই ভন্‌ন্‌ন্‌ ক'রে পাক খেয়ে লাখ-লাখ মশা উঠে আসতো পুকুরঘাট থেকে, নাকে মুখে বসতো। সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার ক'রে দিতো টুনি। অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রিয়নাথবাবু বলতেন, 'দম বন্ধ হ'য়ে গেলো যে, তার চেয়ে তুই আমাকে মশারিটা ফেলে দে,

জানলাটা খোলা থাক।' চারদিকে চারটে পেরেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা তুলে-রাখা মশারিটা টুনি পাখার বাতাস দিয়ে-দিয়ে ফেলে দিতো, লাভ হ'তো না কিছু। চৌখুপি চারখানার শতচ্ছিন্ন মশারির তলায় শুয়ে প্রিয়নাথবাবু মশার কামড়েও অতিষ্ঠ হতেন, গরমেও সেদ্ধ হতেন। টুনি কখনো-কখনো লণ্ঠন নিয়ে ভেতরে ঢুকে মশা মারতো, কখনো বা বিরক্ত হ'য়ে তুলে দিয়ে বলতো, 'তার চেয়ে আমি তোমাকে বাতাস করি বাবা, গরমও লাগবে না, মশাও কামড়াবে না।'

শুধু কি মশারি? প্রিয়নাথবাবুর পিঠের তলায় একটা আস্ত তোশক'ও ছিলো না শেষের দিকে, তুলোগুলো দলা বেঁধে গিয়েছিলো, উপরের কাপড়টা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিলো সেগুলো। তারই উপরে একখানা পুরোনো শাড়ি দু-ভাঁজ ক'রে পেতে সারাদিন শুয়ে থাকতেন।

নিজের বিছানার আরামে গা ঢেলে দিতে গিয়েও উঠে বসলো মানসী, বসলো এসে চেয়ারে। কর্নার-শেল্‌ফে হৃৎপিণ্ডের মতো টিকটিক করছে দামি টাইমপীসটি, তার কালো-কালো ডানা দুটির দিকে তাকালো। সুন্দর জিনিসটি। মাস্টারমশায় দিয়েছিলেন। কালিঘাটের বাড়ি ছেড়ে তেরো টাকা ভাড়ায়, সরকার গলির এক অন্ধকূপে, এক অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা হ'য়ে মাকে নিয়ে যখন মানসী স্বাধীন হ'লো, তখন। নতুন সংসার পাতবার জন্য যেমন নতুন হাঁড়িকুড়ির দরকার হয়েছিলো, নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপের জন্য তেমনি এই ঘড়িটি। মাস্টারমশায় বলেছিলেন, 'সারাদিন যত খুশি রাঁধো বাড়ো, খাও, বেড়াও, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় এটির দিকে তাকিয়ে বসতে হবে তোমাকে। সেখানে ফাঁকি দিলে চলবে না।'

নতুন বাড়িতে আসবার দিন তিনেক পরে ছোট্টো একটি অনুষ্ঠানও

হয়েছিলো। ভাড়া-করা তক্তপোশে শাদা চাদর পেতে, ঘটিতে জল ভ'রে ফুল সাজিয়ে মাঝখানে রেখে, ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিলো। মাস্টারমশায় সেদিন ডোর বেঁধে দিলেন তার হাতে। মানসী মাস্টারমশায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো, গুরু গ্রহণ করলেন তাকে। ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করলো এই গুরুর প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে সে, আগুন ছুঁয়ে বললো, গুরুর দান এই গান তার প্রাণ হবে, মন হবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব-কিছু সে সমর্পণ করবে এই গানের পায়ে। গুরু বরণ ক'রে মাস্টারমশায়কে প্রণাম করলো, মাস্টারমশায় সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। আর তখুনি তিনি এই ঘড়িটি বের করলেন পকেট থেকে।

হারমনিয়ম ছিলো না, বাঁয়া-তবলাও না। হারমনিয়ম একটা মাস্টার-মশায়-ই জোগাড় ক'রে আনলেন কোথা থেকে, আর বাঁয়া-তবলার বদলে রইলো এই ঘড়ি। একটু অদ্ভুত ঘড়ি। এই ঘড়িটাই শব্দ ক'রে তাল দিতো গানের সঙ্গে-সঙ্গে। একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে দিলে প্রত্যেকটি টিকটিক আওয়াজ রীতিমতো জোরে তবলার বোলের মতো টকটক ক'রে উঠতো। আর সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক লয়ে গান শিখতো টুনি। তারপর অবিশ্যি সব যন্ত্রই একদিন কিনতে পারলো। চারশো টাকা দামের ডবল রীডের নতুন ধরনের নরম স্বর হারমনিয়ম, তামার বাঁয়া-তবলা, দস্তার হাতুড়ি, তানপুরো, দরজি ডাকিয়ে সাটিনের জামা হ'লো সকলের, আরো কত প্রাচুর্য। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, 'সারাদিন তুই তবলচি কোথায় পাবি রেওয়াজ করতে? তোর এই কলের তবলচিই সব চেয়ে নিরাপদ। এর মতো লয়দার বাঁটও আর তুই কিছুতে পাবিনে। এটা আমার গুরুদেব আমাকে দিয়েছিলেন, আমি তোকে দিলাম। যত্ন ক'রে রাখিস।'

তা সত্যি। সময়ে-অসময়ে সব সময়ের সঙ্গী তো তার এই ঘড়িটিই। এই ঘড়ি না হ'লে তার চলে না। গেল বছর শীতকালে যখন মাস্টার-মশায় মারা গেলেন, তখনও মানসী এই ঘড়ি হাতে নিয়ে তাঁর শিয়রে বসতো, তিনি গুনগুন করতেন, এই ঘড়ি টকটক করতো, মানসী তুলে নিতো নতুন স্বর। শেষের দিকে মাস্টারমশায় গলা দিয়ে পারতেন না, হাতে বাতাতেন, নোটেশন লিখে দিতেন, তখনও কত স্বর ছিলো তাঁর বুকের মধ্যে, দেবার মতো কত সম্পদ ছিলো। মাস্টারমশায় ছটফট করতেন, মানসী চোখ ভরা বেদনা নিয়ে তাকিয়ে ব'সে থাকতো। একটি সবুজ আলো জ্বলতো শিয়রে, নিঝুম হ'য়ে মাস্টারমশায় প'ড়ে থাকতেন বিছানায়, আস্তে-আস্তে গান করতো সে, মাস্টারমশায় শুনতেন। ঐটুকুতেই তাঁর যেন অনেক যন্ত্রণার অবসান হ'তো।

তারপর একদিন মারা গেলেন। নিঃশব্দে। নিঃসাড়ে। সারা শহর ভেঙে পড়লো। কত ছাত্র, কত ছাত্রী। কত ভক্তের দল। কত ফুল আর কত মালা। মাস্টারমশায়কে কে না ভালোবাসতো ? তাঁর সান্নিধ্যে এসে কে না মুগ্ধ হয়েছে ? কে না পেয়েছে ? একেবারে কল্পনার চরিত্র। দু-হাতে উপার্জন করেছেন, খরচ করেছেন দশভুজ হ'য়ে। হাত পেতে কেউ ফিরে যায় নি, এমন মানুষ ছিলেন তিনি।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যে-গলায় তাঁর স্বরের মন্দাকিনী ব'য়ে যেতো, সে-গলায় তাঁর ক্যানসার হয়েছিলো। পুরো ছ'টি মাস এই গলার ঘায়ে ভুগে সর্বস্বান্ত হ'য়ে শেষে তিনি গেলেন। সেই সময়ে মানসীর দিন-রাত ছিলো না, আহার-নিদ্রা ছিলো না, যেন সুখ-দুঃখেরই বোধ ছিলো না কোনো। মাস্টারমশায়ের যোগ্য স্ত্রী, মাস্টারমশায়ের সব কাজের অনুরাগিণী, সমভাগিনী, ক্লান্ত অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকতেন তার আশায়। তার উপর নির্ভর ক'রে আশা পেতেন তিনি, শান্তি পেতেন।

মানসী কারো দিকে তাকাতো না, কোনো কিছু ভাবতো না, শুধু এই চিন্তাই তাকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো, কেমন ক'রে ভালো হবেন মাস্টারমশায়। কী করলে অন্তত আরো কয়েকটা দিন তাঁকে ধ'রে রাখা যায় এই পৃথিবীতে।

বিরক্ত হলেন ননীবালা। বিরক্ত তিনি অনেকদিন আগেই হয়েছিলেন। এইবার তার প্রকাশ আরম্ভ হ'লো। প্রথম দিন মেয়েকে আড়ে-ঠারে বললেন, দ্বিতীয় দিন শুনিয়ে-শুনিয়ে আপন মনেই গজগজ করলেন, তৃতীয় দিন ঝংকার দিলেন, 'লোকে বলতেই বলে উদরি বাঁদরি যক্ষ্মা, তিন হ'লে নেই রক্ষা। যমের অসাধ্য যে রোগ, তার জন্য এতো ঘটাপটার কোনো অর্থ হয়? এ কেবল খোদার উপর খোদকারি। আর ডাক্তারগুলোও তেমনি। যেন জঙ্গলের নেকড়ে। ওৎ পেতেই আছে অছিলা ক'রে টাকা খাবার জন্য। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে এক ঘা, আর উকিলে ছুঁলে আঠারো ঘা; এখন দেখছি কলকাতার এই ডাক্তারগুলো বাঘকেও ফেল ফেলেছে, উকিলকেও ফেল ফেলেছে। ছিনে জোঁকের বাবা। রক্তশোষা বাদুড়। কেন রে বাপু, মিথ্যে আশা দিস। জানিসই তো বাঁচবে না, ঢং ক'রে স্যুটবুট লটকে, গলায় নল ঝুলিয়ে স্তোক দিস কেন? সোজাসুজি বলতে পারিস না, করবার কিছু নেই?'

এক নিশ্বাসে এতো কথা ব'লে গেছেন ননীবালা, মানসীর কানে এক বর্ণও পৌঁছোয় নি। সে-সবে কান দেবার সময় তার ছিলো না। এক ডাক্তার ছেড়ে সে তখন অন্য ডাক্তার ধরেছে, এক পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতির শরণ নিয়েছে। ডীপ্ এক্স-রে করাবার পরামর্শ চলেছে মাথায়-মাথায়। যা লাগে, যত লাগে। এতো বড়ো একটা প্রাণের জন্য কী না ভাবতে পারে মানসী? কী না করতে পারে?

এর পরে ননীবালা রীতিমতো বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন, মেয়ের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন, তুই-ই কি একা গান শিখেছিস নাকি যে তোরই এতো মাথাব্যথা ? আর কেউ নেই ? আর কেউ করতে পারে না ?'

'সবাই করে মা—' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছে মানসী, 'যে যা পারছে সে-ই তাই করছে।'

'তোর উপরেও আরো কারো করবার দরকার হয় নাকি ? তুই তো একাই একশো দেখছি। আর এ-ও তো কম তাজ্জবের কথা নয় বাপু, নিজের টাকা এক পয়সা খরচ করবে না, পরের টাকায় দরদ নেই। টাকার তো আর অভাব নেই লোকটার ? অন্যেরটা এমন নিচ্ছেই বা কেমন ক'রে ? কাঁড়ি-কাঁড়ি রোজগার করেছে জীবন ভ'রে—'

বেরুবার জন্য প্রস্তুত হ'তে-হ'তে থেমে গেছে মানসী, ফিরে তাকিয়েছে, এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলেছে, 'মাস্টারমশায়ের কিছু নেই।'

'নেই তো গেলো কোথায় ? তার মানে উড়িয়েছে।'

'না উড়োলে আমাদের মতো দুঃস্থদের খাওয়াপরার ভাবনা ঢুকতো কিসে ?'

'কী !' ফোঁস ক'রে উঠেছেন ননীবালা, 'ও-রকম বলবিনে টুনি, গরিব থাকতে পারি, তাই ব'লে ভিক্ষুক ছিলাম না। লোকের কাছ থেকে এমন হাত পেতে নিই নি কোনোদিন।'

'নাও নি বুঝি ?' উদাস ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোণে একটু হেসে পায়ে জুতো গলিয়েছে মানসী। আর মেয়ের রকম-সকম দেখে ননীবালা আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠেছেন, 'না, নিই নি। কক্ষনো নিই নি।'

'তাহ'লে ভুলে গেছো। যাক গে, দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

ননীবালা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, 'ভেবো না তোমার এই ঠেস দিয়ে কথা বলার অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু তবু আমি এ-কথা বলবোই যে দিয়েছে সে সাধ ক'রে দিয়েছে, দিয়ে কিছু পেয়েছে ব'লেই দিয়েছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে মানসী, অনেক কথা তার বেরিয়ে আসতে চেয়েছে বুক ঠেলে, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। কী লাভ?

'আর তুমিও এমন কিছু একটা নবাবজাদি নও—' ননীবালা শেষ করেছেন কথা, 'তোমারও কিছু অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই যে জলের মতো দু-হাতে যেমন খুশি ঢালতে পারো, ফেলতে পারো।'

'একে কি তুমি ঢালা বলো? ফেলা বলো?'

'হ্যাঁ, বলি। একশোবার বলি। তারপর তোমার কিছু হ'লে কেউ কানাকড়ি দিয়েও জিগ্যেস করবে না।'

'হয়তো করবে। হয়তো আমার জন্যও কেউ ঢালবে, ফেলবে। এ-ভাবেই চলে।'

ননীবালা রুখে উঠেছেন, 'ভারি স্বাধীন হয়েছিস, না? মাকে আর গ্রাহ্যই নেই। টিটকিরি দিয়ে কথা! গলা বেচে দুটো টাকা রোজগার করিস ব'লেই বুঝি ভাবিস, মস্ত দিগগজ হয়েছিস? আমার আর বলবার কিছু থাকতে পারে না?'

এবার মার মুখের উপর শীতল চোখে তাকিয়েছে মানসী। মেজাজ তার ঠাণ্ডা; বরফের মতো গলায় জবাব দিয়েছে, 'বলবার কথা তো সবই তোমার। আমার তো কোনোদিন কিছু ছিলো না, তোমার কথামতোই সারাজীবন চ'লে এসেছি, এখনো চলছি। তবু কি তোমার সাধ মেটে না?'

'যদি তা-ই বলিস তাহ'লে আমার এ-কথাটাও তোকে রাখতে হবে।'

'কী ?'

'নিত্য তিরিশ দিন ঐ ঘা-কোপের খরচ আর তুমি জোগাতে পারবে না। আর সারাদিন অমন মাখামাখি ঘেঁষাঘেঁষিও করতে পারবে না।'

'এই তোমার কথা ?'

'হ্যাঁ। এই আমার কথা।'

এর পরে আর মানসী এক মুহূর্ত দেরি করে নি, একবার তাকায় নি, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে নেমে এসেছে নিচে, রাস্তার খোলা হাওয়ায়, আকাশের তলায় এসে মা-র হ'য়ে মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, চলতে-চলতে হঠাৎ নির্মলের মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখে, অবিশ্যি নিমেষের জন্যই।

....দুই

রাধানগর থেকে কলকাতা আসবার প্রায় ন-দশ মাস পরে, যখন টুনি টুনিই ছিলো, যখন মাস্টারমশায় অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে তাকেও গানের সময় ডাকতেন, শেখাতে-শেখাতে একাগ্র হ'য়ে উঠতেন, আর সেই কারণেই কালিঘাটের বরেন-মামার বাড়িতে বাস করা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, হঠাৎ একদিন বিকেলে রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেলো সুশীলা-পিসির সঙ্গে।

একখানা ঘর খুঁজতে বেরিয়েছিলো তারা। সে আর ননীবালা। এখানে গান শেখা অসম্ভব। মেয়ে দুটি হিংসেয় জ'লে গিয়ে যে-সব বিশ্রী কুশ্রী ভাষা প্রয়োগ করতো, শুনতে-শুনতে কাটা কইয়ের মতো বুকের ভেতরটা যেন দাপাতে থাকতো টুনির। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতিত্বে

মামা-মামী আগুন হ'য়ে উঠেছেন, আর তার তাপ বড়ো কম নয়। মা মেয়ে সারাদিন চোর হ'য়ে আছে, চকিত হ'য়ে আছে। মন জোগাবার জন্য সারাক্ষণ ঘুরছে চরকির মতো, হাতের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, গোছানো ঘর আবার গুছিয়ে দিচ্ছে, কথা বলছে খোশামোদ ক'রে, যদি সপ্তাহের এই তিনটে দিনে, তিনটি ঘণ্টার জন্য তাঁরা ক্ষমা করেন টুনিকে। মেয়েদের গান শেখবার সময় একটুখানি বসতে দেন দয়া ক'রে।

অসম্ভব। যে-মেয়ে আশ্রিত, অবনত, তার সঙ্গে একাসনে ব'সে গান শিখবে মামার মেয়েরা, তাদের অসম্মান হয় না? অপমান হয় না? আভিজাত্যে আঘাত লাগে না? তাই নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্য ভাবেই রাগা-রাগি আরম্ভ করলেন, কোনো আড়াল-আবডাল ভদ্রতা বা সৌজন্যের ধার ধারলেন না। মাস্টারমশায় বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, সমানবয়সী তিনটি মেয়ে, দু-জন তো শেখেই, বসুক না আর একজন, ক্ষতি কী? আর তার জন্য আমি তো কিছু বেশি চাইছি না।'

তা না-ই বা চাইলেন, কিন্তু মামা তো তাঁর নিজের মেয়েদের জন্যই মাসের শেষে অতগুলো টাকা মাস্টারের হাতে তুলে দিচ্ছেন? এতে কি সেটার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে? দুই মেয়ের জন্য যেটা দেন, সেখানে যদি আর একজন এসে ভাগ বসায়, ফাঁকতালে তার কাজটি হাসিল হ'তে পারে বটে, কিন্তু অন্য দু-জনের নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়।

এ-কথারও প্রতিবাদ করলেন মাস্টারমশায়, হেসে বললেন, 'মেয়েটি তো শুনেই শিখে ফেলে, কাছে ব'সে থাকলেই কি অন্যদের ক্ষতি হ'তে পারে? কখনো সম্ভব? গান-বাজনা ব্যাপারটাই তো বহু লোকের। গায় একজন, ঘিরে বসে দশজন। ওর যখন এ-বিষয়ে প্রতিভা আছে, সেটাকে অবশ্যই—'

এইখানেই বাড়িসুদ্ধু সকলের ব্যথা, টুনির সম্পর্কে মাস্টারমশায়ের

এই উক্তিই টুনির সর্বনাশ। শেষে মাস্টারমশায় বললেন, 'বেশ, আপনারা যদি তা-ই মনে করেন তাহ'লে ওদের সঙ্গে আর শেখাবো না। সপ্তাহে আরো একদিন আমি আসবো, তার জন্যে আমাকে আলাদা মাইনে দিতে হবে না, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে ওর জন্য সময় চাইবো খানিকটা, অন্তত ঘণ্টা খানেকের জন্য ওকে আপনারা কাজ থেকে ছুটি দেবেন।'

অপ্রসন্ন মুখে বরেন-মামা বললেন, 'ওর জন্য আপনারই বা এতো গরজ কিসের?'

মাস্টারমশায় বললেন, 'গরজ ওর গলা। আপনাদের তো অনেকবার বলেছি গানের শক্তি ওর অসামান্য। ঈশ্বরের দয়া পেয়েছে ও।'

'ইঃ। কী গলা!' ঠাট্টায় বেঁকে গেছেন মামা, 'দস্তুরমতো কর্কশ। এ-গলাকে আপনি ভালো বলেন?'

'আমার এই কারবার। কার ভেতরে কী রত্ন লুকোনো আছে তা আমরা পলকমাত্র শুনেই বুঝে ফেলি। আপনাকে আমি বলছি, যত্ন নিলে ওর তুল্য গাইয়ে বাংলা দেশে বিরল হবে।'

এবার মামীমা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে, 'দেখুন মাস্টারবাবু, মনে আপনার ঘুণ ধরেছে, নুন-লবণ জ্ঞান করতে পারছেন না। তাই কান শুনতে ধান শোনেন, কাকের ডাকে কোকিল দেখেন। কিন্তু সে-কথা যাক, আপনাকে বলাই ভালো, মেয়েদের জন্য আর আমরা আপনাকে রাখবো না।'

অসম্মানে লাল হ'য়ে উঠেছেন মাস্টারমশায়। থমকে গেছেন অনেকক্ষণের জন্য। শুধু তো অসম্মানই নয়, হাজার হোক, পঞ্চাশটা টাকা মাইনে; এই তো তাঁর পেশা। এই ক'রেই তিনি খান। সাধারণত অন্যান্য গাইয়েদের আয়ের যে-সব পন্থা তা তিনি নানারকম অসুস্থতাবশত গ্রহণ করতে পারেন নি। সারাটা বর্ষা হাঁপানিতে ভুগতেন, গলার ব্যবহার

একেবারে বন্ধ রাখতে হ'তো সেই সময়ে, আর ভালো হবার পরেও গলা সেরে উঠতে আরো অনেকটা সময় নিতো। একটুও ভাঙা নয় এ-রকম মাজা-ঘষা গলা বছরের মধ্যে দু-মাস থাকতো কিনা সন্দেহ। অল্পবয়সে অবিশ্যি এ-রকম ছিলো না, সংসারক্ষেত্রে নেমে, যখন উপার্জনের প্রয়োজন বেড়ে গেলো, বয়স বাড়লো তখুনি গলা তাঁকে নানারকম কষ্ট দিতে আরম্ভ করলো। সব চেয়ে বেশি টাকা পেতেন সিনেমার প্লে-ব্যাকে, সেটা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, রেডিওর প্রোগ্রামও নিয়মিত নিতে পারতেন না, কত সময় গ্রামোফোন-স্টুডিওতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে হঠাৎ গলা ধ'রে যাবার দরুন। এই টিউশনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবিকা। নিজের বাড়িতেও ক্লাশ নিতেন, এসেও শেখাতেন। আর ভালো ছাত্র-ছাত্রী পেলে টাকার কথা ভুলে যেতেন।

মামীর কথায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সে তো বেশ কথা, মা। আমিও ছাড়বো-ছাড়বোই ভাবছিলাম। আমারও মন লাগছিলো না ঠিক।'

'তা লাগবে কেন ? বুড়ো বয়সে মাস্টারমশায়ের যে ভীমরতি ধরেছে।' পাশের ঘরে ফিসফিস ক'রে ঠেলাঠেলি করেছে মেয়েরা।

সারা শরীরে গরম হ'য়ে উঠেছে টুনি।

মাস্টারমশায় বেরিয়ে গেলেন তখুনি, একেবারে সোজা রাস্তায়। মাসের আটাশ তারিখে, প্রায় একমাসের মাইনে তেমনি বাকি প'ড়ে রইলো। বরেন-মামারও যেমন দিতে হ'লো না ব'লে বাঁচলেন, ঐ নোংরা হাত পেতে নিতে হ'লো না ব'লে মাস্টারমশায়ও বোধহয় কম লাঘব হলেন না।

দ্রুতপায়ে টুনি এসে দাঁড়ালো কাছে, তার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। কী বলতে চাইলো, বলতে পারলো না, শুধু

থরথর ক'রে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। মুখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত রেখে হাসলেন মাস্টারমশায়, 'কী রে পাগলি ? কী হ'লো ?'

'আমি— আমি—' টুনি তার অসহায় করুণ মুখ তুলে তাকালো।

মাস্টারমশায় সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'ভেতরে যা, ক'টা দিন থাক কষ্ট ক'রে, তারপর ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

'ব্যবস্থা ?'

'ব্যবস্থা মানে একটা ঘর খোঁজা আর কি।'

'ঘর !'

'আলাদা থাকবি। এখানে থাকলে এই ক'রেই জীবন কাটবে। অমন সুন্দর গান অমনিই ঝ'রে যাবে।'

'আমাদের যে কিছুই সম্বল নেই।'

'সম্বল নেই, হবে। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠি লিখে খবর জানাবো তোকে।'

'মাস্টারমশায়!' হাত চেপে ধরেছে টুনি। মাস্টারমশায়ের হাত নয়, তার বাবার হাত, প্রিয়নাথবাবুর হাত। মাস্টারমশায়কে ছুঁয়ে সে প্রিয়নাথবাবুর স্পর্শ অনুভব করেছে। আশ্চর্য! সেইসঙ্গে নির্মলকেও যেন অনুভব করেছে বুকের মধ্যে, মনে হয়েছে সে আছে। আছে। এমনি ক'রেই ছড়িয়ে আছে আত্মায়-আত্মায়।

ননীবালা কেমন ক'রে জানবেন তার সেই সব অনুভূতিময় মুহূর্তের কথা। কেমন ক'রে বুঝবেন মাস্টারমশায়ের মধ্যে সে কী পেয়েছিলো, কী দেখেছিলো। মাস্টারমশায়ের জীবনের কত মূল্য তার কাছে। টুনি কেঁদে ফেলেছিলো সেদিন।

ব্যস্ত হ'য়ে মাস্টারমশায় বললেন, 'তাহ'লে এই কথা রইলো। একটা শস্তা ঘরটর কোথাও খুঁজে বের করি, আর তোর জন্যে সত্যিই এবার

দু-একটা টিউশনি জোগাড় করি।' তারপর হাসলেন, 'রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ, কী বলিস ? নিজেই শিখলিনে, আবার শিক্ষক।' প্রশান্ত হাস্যে টুনির হৃদয় উদ্ভাসিত ক'রে চ'লে গেলেন তিনি, সেদিকে তাকিয়ে দুঃখের আঘাতে টুনির নুয়ে-পড়া ভেঙে-যাওয়া নড়বড়ে মনটা হঠাৎ যেন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

প্রায় দু-সপ্তাহ পরে একটা চিঠি এলো। মাস্টারমশায় লিখেছেন, ঘর তিনি দেখেছেন একটা, মন্দ নয়। একটু কষ্ট হয়তো হবে ও-রকম বাড়িতে থাকতে, কিন্তু উপায় কী ? একটা বাচ্চা মেয়েকে গান শেখানোর কাজও ঠিক করেছেন, তাছাড়া রেডিওতে অডিশনের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি নিজেই নিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট তারিখে। আরো-একটি সুখবর, সম্ভবত একটি সিনেমার গানে, কোরাসে গলা দেবার জন্য শিগগিরই তার ডাক পড়বে, পরীক্ষায় উৎরোতে পারলে বেশ কিছু উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।

জরুরি কথায় ঠাসা মাত্রই কয়েক লাইনের চিঠি। কিন্তু পড়তে অনেকটা সময় লাগলো টুনির। ননীবালাও চোখে-মুখে অদম্য উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের নত দৃষ্টির দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মানুষ নয়, দেবতা। দেবতা। ভগবান যদি কোনোদিন মুখ তুলে তাকান, বুঝবো এঁর জন্যেই তিনি দয়া করেছেন। গোবিন্দ। গোবিন্দ।' তিনবার কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন কী জানি কার উদ্দেশে। তারপর গলা খাটো ক'রে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কাউকে বলিস নি যেন, কাকপক্ষীটি যেন জানতে না-পারে। এরা যা লোক, বাবা। আমার হাতে চিঠিটা দেখে থেকে কেবল বলছে, "কার চিঠি, কার চিঠি ?" আমি কি আর বলি সে-কথা ? বললাম, "গাঁয়ের এক জ্ঞাতি দেওরের।" বলে, "কী লিখেছে, যেতে লিখেছে নাকি ?" আরে

বাপু, যদি সত্যি আজ কেউ যেতে লেখে তোরা কি ছাড়বি আমাদের! এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে দু-মুঠো ভাত দিয়ে দুটো ঝি— পাবি কোথায়। তোদের রাবণের সংসার চলবে কেমন ক'রে?'

তবু কিন্তু টুনি বাড়ি দেখতে যাবার আগে ভেবেছিলো। বলেছিলো, 'এটা কি ঠিক হবে মা? শেষে যদি সব ভার মাস্টারমশায়ের ঘাড়েই পড়ে, সে ভারি লজ্জার। তার চেয়ে বরং— '

এতো বড়ো সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে-ঠেলতে হাড় কালি হ'য়ে উঠেছে ননীবালার। ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণ দেহে তিনি ঝাঝিয়ে উঠেছেন মেয়ের উপর, 'তোর আবার সবটাতেই বেশি চিন্তা। মাস্টারমশায় নিজে বলছেন; তিনি কি না-বুঝেই বলেছেন? আর এ-ভাবে তুই গান শিখবি কী ক'রে?'

বিছানার অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে এই গানের জন্যে ননীবালার গরজ দেখে আবছা হেসেছে টুনি, তারপর ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে উঠেছে বুক।

সুশীলা-পিসি একেবারে জড়িয়ে ধরলেন পথের মধ্যে, 'ও মা, টুনি! তোর এই চেহারা হয়েছে? আহা, অমন সুস্থ মেয়েটা।'

টুনি নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিলো তাঁর। ননীবালা বললেন, 'হবে না? কী সুখে আছি আমরা তা তো জানো না?'

'আর তোমারই বা কি হাল হয়েছে বউ? অমন রং পুড়ে একেবারে কালি।'

'দাসীবৃত্তি করছি, ঠাকুরঝি।' প্রায় গলা ভেঙে এসেছে মা-র। সুশীলা-পিসি মাথা নাড়লেন, 'আর ইদিকে গ্রামে কী কাণ্ড!'

'কী, পিসিমা?' চোখ তুলেছে টুনি।

'আর কী ? কত বললাম একটু র'য়ে-স'য়ে থাক দুটো দিন, তা তো তোদের সইলো না।'

টুনির বুকের ভেতরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। ননীবালা সাগ্রহে বললেন, 'কেন ?'

'আর কেন ? সেই ছেলে ফিরে এসে একেবারে খুনোখুনি।'

'অ্যাঁ ?'

'চিঠি-ফিঠি না-পেয়ে, যত সব উদ্ভট খবর শুনে ছুটে এসেছে পাগল হ'য়ে।'

'এসেছিলো ?'

'আসবে না ? না-হয় খালি মন্ত্রই পড়ে নি। কিন্তু প্রাণ মন তো তার এখানেই ?'

ননীবালা বিমনা হলেন। টুনি দূরে কোথায় ভাসিয়ে দিলো চোখ।

'আর তোরাই বা কী রে ? বললি না, কইলি না, হুট ক'রে চ'লে এলি চুপে-চুপে ?'

'তুমি তো তখন ছিলে না ঠাকুরঝি। সাতগাঁয়ে গিয়েছিলে।'

'আহা, আমি কি চিরতরে গিয়েছিলাম ? আমার ফেরা পর্যন্ত অন্তত তোমরা অপেক্ষা করতে পারতে।'

'কী অবস্থা হয়েছিলো আমাদের— সে তো তুমি দ্যাখো নি।'

'তা তো ঠিকই।'

টপটপ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে বুকের কাপড় চুপসে গেলো টুনির, কেউ লক্ষ্য করলো না। টুনি মুছে ফেললো তাড়াতাড়ি। কিন্তু আবার দুই চোখ ঝাউপাতার মতো ঝাপসা।

অর্ধোদয়-যোগে সুশীলা-পিসি গঙ্গাস্নানে এসেছেন, তিনদিন থেকেই চ'লে যাবেন। কী ভাগ্য যে তারই মধ্যে কেমন দেখা হ'য়ে গেলো। তবু

তো খবর পাওয়া গেলো, তবু তো টুনি জানলো সে আছে, তারই জন্যে আছে।

ননীবালা স্তিমিত গলায় বললেন, 'ছুটি নিয়ে এসেছিলো বুঝি ?'

'হয়তো তা-ই হবে।'

'ক'দিন ছিলো ?'

'ক'দিন আর! আরে বাবা, তারই মধ্যে কী রেষারেষি, হুলুস্থুল। এদের রকম-সকম দেখলে হাসবো, না কাঁদবো ভেবে পাই না।'

'কেন ?'

'কেন আবার ? ভালোবাসাবাসির ঘটা ? এ টানে, সে টানে। খাতির কত ? চৌধুরী-বাড়ির বসন্ত বলে, আমার এখানে থাকো, বোসদের সেই কুঁজোটা, বজ্জাতের ধাড়ি, সেটা আবার বলে, চিরদিন আমি তোমাকে নিজের ছেলে জ্ঞান ক'রে এসেছি, তোমার তো আমার এখানেই থাকা উচিত। ঘোষের বাড়ি, দাসের বাড়ি, ললিত বুড়োটার কথা আর বলবো কী! যার বাড়িতেই মেয়ে আছে তার বাড়িতেই টানাটানি। অবিশ্যি যাদের নেই তাদেরও বড়ো কম গরজ নয়।'

'হঠাৎ এতো আদর কিসের ? আগে তো কেউ দু-চক্ষে দেখতে পারতো না।'

'ও মা, বলো কী গো ? তার যে তখন দু-হাত ভর্তি টাকা। খোলাম-কুচির মতো ছড়াচ্ছে, ছিটোচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে। কী পোশাক, কী চেহারা। সাহেবদের মতো একেবারে টকটক করছে। দেখলে বাপু সত্যি ভক্তি হয়।'

ননীবালা ডুবে যেতে-যেতে বললেন, 'তারপর ?'

'থানে-থানে সব কত কাপড় এনেছিলো, কত সাবান, টিনে-টিনে কত খাবার, কত ফল, যুদ্ধের টাকা আর যুদ্ধের খাবার, তার কি অন্ত আছে ?'

'এনেছিলো ?'

'আরো কত কী কে জানে, কে দেখেছে। অনাদি বলে, ও নাকি মস্ত কী একটা হ'য়ে মস্ত মাইনে পাচ্ছিলো। সৈন্যদের তো ও-ই কর্তা ছিলো।'

এর পরে ননীবালা একটি প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছাড়লেন।

সুশীলা-পিসি কপাল চাপড়ালেন, 'যেমনি বরাত তেমনি তো হবে ? নইলে অমন ছেলেকে জামাই পেয়ে তুমি হারাও ?'

'তাই তো। পরের বাড়ির দাসীপনা ক'রে-ক'রে এই হাঁড়ির হাল না-হ'লে মা-মেয়ের দিনই বা কাটবে কেন, বস্তির মধ্যে সব অজাত-কুজাতের মধ্যেই বা ঘর খুঁজে বেড়াবো কেন ? ক'দিন ছিলো ?'

'ক'দিন আর। সব মিলিয়ে বোধহয় দিন সাতেক। থাকবেই বা আর কিসের টানে বলো ? তোমাদের না-দেখে না-পেয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালো কেবল। শেষে একদিন সব ফেলে ছড়িয়ে কবে যেন চ'লে গেলো, জানতেও পেলুম না।'

'চ'লে গেলো ?' এতোক্ষণ পরে এই প্রশ্নটা কান্না হ'য়ে বেরুলো টুনির গলায়।

ননীবালা বললেন, 'কোথায় গেলো ?'

'তা কী আর ব'লে গেছে বোন ? যাবার সময় কি সে দেখা করেছে কারো সঙ্গে ?'

সেই রাত্রে ভাগ্যের এই বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের এই অদ্ভুত পরিহাসে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করেছিলো টুনির। কালিঘাটের বাড়ির সেই সরু দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিলো। সারারাত জেগে থাকতে-থাকতে অন্ধকারে চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে

হয়েছিলো। ননীবালা পাশাপাশি শুয়ে অনেক পরে হাহাকার ক'রে বলেছিলেন, 'তুই-ই অপয়া। তোর কপালে কিছুই জোড়া লাগে না।'

হয়তো। চোখের জলে বালিশ ভাসিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলো টুনি। ঘরটায় কোনো জানালা ছিলো না, ওদের কাপড় ছাড়বার ঘর। ট্রাঙ্ক বাক্সে ঠাসা দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই কেটে গেলো সেই রাতটা।

শুধু সেই রাতই নয়, অমন নির্ঘুম আরো অনেক রাত কাটালো টুনি, আগুনের মতো জ্বলন্ত আরো অনেক দিন। শেষে কবে একদিন নিবে গেলো সেই তাপ, জ্বালা জুড়োলো, বাড়ি বদলে কালিঘাটেরই অন্য কোনো পাড়ায়, কোনো বস্তির ছোট্টো একটি ঘরে এসে গানকে পেলো সে। গানের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। দিনে রাত্রে একমন, এক-চিত্ত হ'য়ে শুধু গান আর গান। গভীর ক্ষত পুরন্ত হ'য়ে এলো, তারপর কালের ভীষণ প্রলেপে নির্মল নামক তরুণ যুবকটি কী জানি কখন হারিয়ে গেলো মনের অহরহ ছবি থেকে। কড়া প'ড়ে গেলো সেখানে। আর তারপর আবার ভ'রে উঠলো সব। বস্তি ছেড়ে পাকাঘর, পাকা-ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়ি, কালিঘাট ছেড়ে বড়ো রাস্তা, বড়ো রাস্তা ছেড়ে লেকের ধার। টুনি ধাপে-ধাপে উঠলো না, লাফ দিয়ে উঠলো। কোরাসে গলা দিতে গিয়ে নজরে প'ড়ে গেলো মিউজিক ডিরেক্টরের, তিনি গুণী লোক, কানের পর্দা দুরস্ত, এ-আর্টিস্টকে তিনি ছাড়তে পারেন না। একই সঙ্গে আরো একখানা ছবিতে একা গাইবার সুযোগ দিলেন তাকে, নামে ফেটে গেলো শহর।

রামেন্দু ভট্টাচার্য খুশি হ'য়ে মাথা নাড়লেন ঘন-ঘন, তালিম দিতে-দিতে ব'লে উঠলেন, 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।' ননীবালা মুঠো ভ'রে টাকা তুললেন বাক্সে, আড়ালে ব'সে ছুঁলেন, ছানলেন, গুণলেন, সতৃষ্ণ নয়নে

তাকিয়ে রইলেন পাঁচখানা একশো টাকার নোটের দিকে। দেখতে-দেখতে পাঁচখানা নোট দশখানা হ'লো, দশখানা কুড়িতে পৌঁছলো, কুড়িখানা চল্লিশে— ঝড়ের বেগে এই আট বছরের মধ্যে রাধানগরের প্রিয়নাথ মাস্টারের মেয়ে, ছিন্নবস্ত্র টুনি, সন্ধ্যামণি নাম বদলে মানসী দত্তমল্লিক হ'য়ে বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করলো।

সঙ্গে-সঙ্গে ননীবালা খালি গায়ে শেমিজ তুললেন, শেমিজের উপর ব্লাউজ ধরলেন, পায়ে দেবার জুতো কিনলেন। আরো পরে মিল ছেড়ে তাঁতের ধুতি, সুতি ছেড়ে সিল্কের ব্লাউজ, চামড়া ছেড়ে সুয়েডের জুতো, শূন্য গলাটা ভ'রে নিলেন মোটা ঘষা গোট-হারে, হাতেও সরু অথচ বেশি সোনার দু-গাছি জলতরঙ্গ চুড়ি গড়িয়ে নিলেন। বিধবা মানুষ, আর কী সাধই বা মিটোতে পারেন। লেকের ধারের আড়াই শো টাকার প্রশস্ত ফ্ল্যাটে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচলেন। মেয়ের রোজগারের বড়ো অংশটা একদম লুকিয়ে ফেলে তাঁর নিজস্ব পুরোনো একটি স্টিল ট্রাঙ্কে লিনেনের ঢাকনা পরিয়ে এনে রাখলেন খাটের তলায়। খাটের পায়ার সঙ্গে লোহার মোটা শেকলে তালা দিয়ে আটকে দিলেন, টুনি লক্ষ্য ক'রেও উপেক্ষা করলো।

মেয়ে মেয়েই। কোনদিন তার কী মর্জি হবে, কাকে না কাকে বিয়ে ক'রে মাকে ফেলে উধাও হবে, ঠিক আছে কিছু? সময় থাকতে তাই গুছিয়ে নেওয়া ভালো। নিশ্চয়ই এই সব ভেবেই এই সাবধানতা ননীবালার, বুঝেছিলো টুনি। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত কপালে যে তাঁর রাজার শাশুড়ি হওয়া লেখা আছে তা কি তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন? হয়তো অতদূর যায় নি তাঁর ভাবনা। অবিশ্যি এ-পর্যন্ত যা হ'লো কোনটাই বা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন। টুনিই কি পেরেছিলো? টুনির মরা

ডালও যে কচিপাতার কলরোলে ভ'রে উঠবে, কুঁড়ি দেখা দেবে, ফুল ফুটবে—

ফুল ফুটবে ? না না, ফুল নয়। ফুল আর ফুটবে না। ফুল তো কবেই ঝ'রে গেছে জীবন থেকে। কিন্তু ফুল ছাড়া একে আর কী বলে মানসী ?

সকাল হ'লেই সে আসবে। সোমেশ্বর বাগচি। তোমার ভাবী স্বামী। তোমার বিয়ের ফুল কি তবু ফুটলো না ?

তাই তো উচিত। তুমি তো কবেই ভুলে গিয়েছো তাকে। তোমার পুরোনো জীবনের আর কী অবশিষ্ট আছে এখানে ? কাল যদি হঠাৎ তাকে তুমি না দেখতে, (সত্যিই কি সে ?) তবে আজ সে কোথায় থাকতো ? একবারও কি ভাবতে তার কথা ? শেষ কবে ভেবেছো তাই কি তোমার মনে আছে ? ও-সব আর থাক। আর তুমি তাকে ভেবে নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত কোরো না। সে নেই, সে মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে, তুমি নতুন ক'রে নতুন জীবনে বেঁচে ওঠো, সেটাই তোমার একমাত্র প্রার্থনা হোক।

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। সকালের কচি রং দুপুরের ছোঁয়ায় প্রায় কড়া হ'য়ে উঠেছে। রোদ্দুর কমলা রং শিকের ফাঁকে লম্বা-লম্বা রেখা টেনেছে। খাটের কার্নিশে, বিছানার বালিশে, মানসীর পায়ের উপরকার ধূসর-রং রেশমি চাদরে তার আলো। গয়লার দুধ দোয়া শেষ, লেকের প্রাতঃভ্রমণকারীরাও ফিরে গেছে যে যার ঘরে, এখন রাস্তাটা আবার নিঝুম।

'কী রে, উঠবিনে?' চৌকাঠে পা রেখে পর্দা সরিয়ে মুখ বের করলেন ননীবালা।

মানসী চারদিকে তাকালো, বালিশের রোদ থেকে সরিয়ে নিলো মাথাটা। গলাটা ঘেমে উঠেছে।

'ব্যাপারটা কী বল দেখি?' ননীবালা ঘরে ঢুকলেন, 'রাত্তিরে ঘুমুস নি নাকি, সকাল পর্যন্ত অত বড়ো একশো পাওয়ারের আলোটা জ্বলছিলো?'

'আলো জ্বলছিলো?'

'খানিক আগে আমি এসে নিবিয়ে দিলাম। কেন? রাত জেগে কী করছিলি?'

আড়মোড়া ভাঙলো মানসী। মৃদু হেসে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'রাধানগরের কথা মনে পড়ছিলো, ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—'

'রাধানগর!' ঠোঁটের কোণে যেন বিদ্বেষ জমা হ'লো ননীবালার, 'কেন?' চোখ টান করলেন তিনি, 'হঠাৎ আবার রাধানগরের কথা কেন?'

'মনে পড়ে না? কতকাল সেখানে ছিলাম, কত সুখ, কত দুঃখ—'

'সুখও? ঈশ্বর করুন আর যেন কোনোদিন অমন সুখের আর অমন দেশের মুখ দেখতে না হয়।'

মানসীর মাথা টিপটিপ করছে, ভার লাগছে শরীরটা, আলস্যে মাখামাখি। দু-হাত উপরে তুলে বাঁকিয়ে চুরিয়ে এলোমেলো হাই তুললো সে। বিছানা থেকে নেমে, ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে টুথব্রাশ বের ক'রে তার মাথায় পেস্ট লাগাতে-লাগাতে বললো, 'সেখানে কি তোমার সবই দুঃখের স্মৃতি? কোনোদিনের কোনো সুখ কি তোমার মনে পড়ছে না?'

'জঘন্য। নরককুণ্ড। লোকেরা বলে শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ভিটে। ও-সব মেয়েমানুষের ঢঙের কথা। আমার জন্মেও সেখানে ভালো লাগে নি।'

'নতুন বিয়ের পরেও না?'

মেয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন ননীবালা। দূর থেকে শোনা গানের কলির মতো পাতলা ফর্শা ছিপছিপে একটি বি. এ.

পাশ যুবক স্মৃতির সমুদ্র বেয়ে যেন সহসা ভেসে এলো কাছে। লাজুক মানুষ, গুরুজনদের ভয়ে তটস্থ, আর তারই মধ্যে অবনতমুখী বুক-ঘোমটা এক তরুণীর সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দিনে অন্তত দশবার চোখোচোখি। ননীবালার মুখে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই কেমন একটি নরম স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়লো। চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যত সব বাজে চিন্তা। নে, চল, চা খাবি। ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।'

পশ্চিমের বারান্দায় এলো মানসী। বারান্দাটি চৌকো, তিনদিক ঢাকা, একদিকে সবুজ-রং চিকের ব্যবস্থা। তার একপাশে রান্নাঘর, ওপাশে বসবার ঘর। *এটি* মানসীর খাবার ঘর। মাঝখানে মেহগনি-রং নতুন-কেনা আয়না-পালিশ নতুন খাবার টেবিল, চারদিকে চারখানা চেয়ার। কোণে সাইডবোর্ডে কাচের বাসন সাজানো। এ-বাড়িতে এসেই এই সব ব্যবস্থা হয়েছে, তার আগে পর্যন্তও ননীবালা ননীবালার ধারণা মতোই ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেন, মানসী মনোযোগ দিতো না। কিন্তু এখন অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, বন্ধুতা, সব-কিছুর সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজন বেড়েছে, মনের গতিও বদলে গেছে বৈকি।

এ-সব সাহেব-সাহেব খেলাতে মনে-মনে খুশিই হয়েছিলেন ননীবালা। মেয়ের সঙ্গে কত জায়গায় যান, কত কিছু দেখেন, ফিরে এসে নিজের বাড়ির হালচাল আর ভালো লাগে না তাঁর। কিন্তু অমনোযোগী মেয়ের কাছে কিছু বলতে কোথায় যেন আটকায়, হয়তো বা লজ্জাও করে। এ-বাড়িটাতে আগে কোনো-এক হাকিম বাস ক'রে গেছেন সাত বছর। তিনিই যাবার সময় ফ্ল্যাটটি দিয়ে গেছেন মানসীকে। মানসীর গানের ভক্ত। নয়তো এমন বাড়ি আজকাল পাঁচশো টাকা ভাড়া দিলেও কি লোকে পায়? বাড়িটিতে এসেই মানসীর মন বদলে গেলো, রুচি বদলে

গেলো। শেষ রেকর্ডের দুরন্ত বিক্রির একটা মোটা অংশই সে ফস ক'রে খরচ ক'রে ফেললো এই বাড়ি সাজানোতে, আর বাড়ি সাজিয়েই জুটে। কনট্রাক্ট পেয়ে গেলো মস্ত।

এই টেবিলে খেতে প্রথম দিকে একটু-একটু আপত্তি তুলেছিলেন ননীবালা, বিধবা মানুষ কেমন ক'রে এ-সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারে মত দেন। কিন্তু তাই নিয়ে বেশি সাধতে হয় নি মানসীকে, একদিন শুধু বলেছিলো, 'কলকাতায় ও-সব কেউ মানে না।'

'সে তো ঠিকই। সে তো ঠিকই।' অমনি ননীবালা প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলেন। 'যখন যে-রকম, যে-দেশে যে-রকম সে-রকম না-চললেই লোকে গেঁয়ো বলে।'

মানসী মুখ নিচু ক'রে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে বললো, 'সে তো ঠিকই।'

অতএব তিনিও তাঁর নিরিমিষ থালাটি নিয়ে টেবিলে বসলেন। আগে একজন পরিচারিকাতেই তাদের মা-মেয়ের সংসারের কাজ অকাতরে চ'লে যেতো, এখানে এসে মানসী আরো একজন মহিলা রাখলো। ঝাড়পোঁচ করবার জন্য, একটা ছোট্টো ছোকরা রইলো ফুট-ফরমাশের জন্য। ননীবালার বয়স হয়েছে, আরাম দরকার, আর মানসীর কাছে প্রত্যহ কত ধরনের লোক আসে, স্বচ্ছন্দ লোকজন হাতের কাছে না-থাকলে অসুবিধে হয়।

পরিচারিকা ফিটফাট কাপড়ে, ঝকঝকে পেয়ালায় মা-মেয়ের চা পরিবেশন করলো। ননীবালা টোস্ট মাখন আর দুধের হালুয়া খান, মানসীর একটা হাফবয়েলড্ ডিম। খিদে তার ভারি কম। পোষা বেড়ালটা লাফ দিয়ে উঠে এলো কোলে, ল্যাজ দুলিয়ে ম্যাঁও-ম্যাঁও করতে লাগলো মুখের দিকে তাকিয়ে। নন্দর মা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধ দিয়ে

ডাকলো, 'আয়, আর নালিশ করতে হবে না।' মানসী হাত বুলিয়ে দিলো নরম পিঠে।

'আমি সোমেশ্বরকে গোটা নয়েকের সময় আসতে বলেছি।' চামচে দিয়ে চা নাড়তে-নাড়তে ননীবালা বললেন।

মানসী একবার তাকালো, জবাব দিলো না।

'একদিনের মধ্যে সব তো ক'রে উঠতে হবে? ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলতে হয় কিছু, কী বলিস?'

'আমি আর কী বলবো।'

'তোর এবারকার ছবির গানের চুক্তির সব টাকাটাই তো জমা আছে, না?'

'সে তো তুমিই ভালো জানো।'

'কী জানি বাপু, টাকাকড়ির কথা অত আমার মনে থাকে না। পার্টিটা আমাদের লনেই করবো ভেবেছি, খরচা একটু বেশি পড়বে অবিশ্যি। সোমেশ্বর আবার আর-এক তাল তুলেছে—' সস্নেহে ননীবালা হাসলেন।

মানসী তাকিয়ে থেকে বললো, 'খরচাটা উনি দেবেন, না?'

'তবে তোকেও বলেছে? ঐ দ্যাখ, আমার কাছে সায় না-পেয়ে আবার তোকে গিয়ে ধরেছে। তা, তুই কী বললি?'

'আমি?' গলার স্বর গম্ভীর হ'লো মানসীর, 'আমি বললাম এ-সব আমার ভালো লাগে না।'

'কী ভালো লাগে না?' হাতের হালুয়া মুখে উঠতে-উঠতে থেমে গেলো ননীবালার।

'যা তুমি আরম্ভ করেছো— কিছু ব'লে ফেলেছো নাকি?'

ননীবালা গোঁজ হলেন, 'জানতাম না এ-বাড়িতে আমাকে তোমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'হুকুমের কথা নয়, সমস্ত মিলিয়ে ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে আমার।'

'আমি যা-ই করি তাই তো তোর বিশ্রী লাগে।'

মানসী আর জবাব দিলো না। অস্থির হ'য়ে নন্দর মা বললো, 'তর্ক রেখে, খেয়ে নাও তো তোমরা।'

'আমি আর খাবো না।' চেয়ার ঠেলে মানসী উঠে দাঁড়ালো।

'ও মা, সে কী গো, চায়েও তো ভালো ক'রে চুমুক দিলে না।'

'গা গুলোচ্ছে।'

'ওদিকে কাল রাত্তিরেও বসলে আর উঠলে। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

'নে নে, আদিখ্যেতা না-দেখিয়ে তুই যা তোর কাজে। বেলা আটটা বাজতে চললো, এখনো ঘর ক'খানা পুঁছে উঠতে পারলিনে।' ননীবালা এক ধমকে সরিয়ে দিলেন নন্দর মাকে। উঠে এসে হাতের উল্টো পিঠটা তিনি মেয়ের বুকের কাছে ছোঁয়ালেন, 'ও মা, গা দেখি ছ্যাকছ্যাক, চোখমুখ ছলছলে। আবার জ্বর-টর বাধালি নাকি?'

'না, জ্বর হবে কেন।'

'গলায় মাফলারটা জড়া দেখি।' গলার জন্যেই ননীবালার সব চেয়ে বেশি ভয়, 'এ-সব ঋতু-পরিবর্তনের দিনে আজ ঠাণ্ডা, কাল গরম, সাবধানে থাকতে হয়।'

একটু হাসলো মানসী, 'একটা অসুখ-বিসুখ হ'লে নেহাৎ মন্দ কী? কয়েকটা দিন চুপচাপ শুতে পারি।'

'অমন অলক্ষুনে কথা মুখেও এনো না বাপু। সবাইকে ডেকেছি, শেষে কি—'

ননীবালার কথার শেষটুকু না-শুনেই মানসী ঘরের চৌকাঠ পেরুলো,

নিজের ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। সত্যিই শরীরটা আজ ভালো লাগছে না তার।

সোমেশ্বর এলো একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ন'টাতেই। খাঁ-খাঁ রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক, আপিশের ভিড় লেগেছে রাস্তায়। মানসীদের আসমানি ম্যানশনেও তারই ব্যস্ততা। একতলা, দোতলা, তেতলার মুখোমুখি সব বর্মা টিকের লম্বা-লম্বা দরজার পাল্লাগুলো খুলে যাচ্ছে ফটাফট, চিকচিক ক'রে উঠছে ব্রাসো-মাজা পেতলের নেমপ্লেটগুলো, পোর্ট-ফোলিও হাতে ছোটোসাহেব, বড়োসাহেব, মেজোসাহেবরা সব বেরুচ্ছেন একে-একে। দু-একটি চেনা মুখকে অভিবাদন জানিয়ে, অচেনাকে পাশ কাটিয়ে, সোমেশ্বর এসে টোকা দিলো দরজায়।

খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ননীবালা, 'এসো, তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। মেয়ে তো আবার জ্বর ক'রে বসেছে।'

'জ্বর! কই, কাল তো ছিলো না।' সোমেশ্বরের চেহারায় রীতিমতো উদ্বেগ ফুটলো।

'তেমন কিছু নয়।' ননীবালা মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিলেন, 'ব্যস্ততার কিছু নেই। কাল আবার বাড়িতে একটা ব্যাপার, তাই—' একটু গলা খাটো ক'রে, 'রেজিস্টারির বিষয়টা কি কিছু স্থির করলে?'

'হ্যাঁ। ঠিক ক'রেই আসছি। তাই ভাবছিলাম আবার অসুখ-বিসুখ—'

'আটকাবে না। তুমি যাও না ওর ঘরে।' ননীবালা একেবারে গদ্গদ হলেন।

'শুয়ে আছে বুঝি?'

'আর বলো কেন, সকালে চা খেলো না, কাল রাত্তিরেও নামে মাত্র

বসলো— এসো।' এঘর-ওঘর ডিঙিয়ে সোমেশ্বরকে মেয়ের ঘরের দরজায় পৌঁছে দিলেন তিনি।

একটু ইতস্তত করলো সোমেশ্বর, না-ব'লে না-ক'য়ে পর্দার ও-পিঠে একজনের শোবার ঘরে চট ক'রে ঢুকে পড়তে হয়তো তার শোভনতায় আটকাচ্ছিলো। এক পা থমকে বললো, 'বরং একটা খবর দিলে হয় না ?'

'ও মা, খবর আবার কী। তুমি যাবে তাও খবর দিয়ে ?'

সোমেশ্বর এবার মৃদু হেসে ছটফটিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরে। 'কই, কী হ'লো আবার ?'

মানসীর অনিদ্রাক্লান্ত চোখে একটু তন্দ্রা নেমেছিলো, কপালের উপর থেকে হাত সরিয়ে বড়ো-বড়ো ক'রে তাকালো।

'শেষে একটা অসুখ বাধালে তো ? কী কাণ্ড ! ডক্টর পাকড়াশিকে খবর দিই একটা ?'

মানসী এবার উঠে বসলো, অবাক হ'য়ে বললো, 'আপনি ! এ-ঘরে ?'

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেও সহজভাবে হাসলো সোমেশ্বর, 'কী করবো, বলো ? তোমার অসুখ আর আমি শান্ত হ'য়ে বাইরের মানুষের মতো বাইরের ঘরে অপেক্ষায় থাকবো, তা পারবো না।'

মানসী পায়ের উপর বেডকভারটা টেনে দিয়ে বললো, 'বসুন।'

খুশি হ'লো সোমেশ্বর। সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে ব'সে ঘরের চারদিকে তাকালো। এ-ঘর সে নতুন দেখছে। মোটা শরীরে এ-ভাবে এই মেয়েলি অপরিসর চেয়ারটিতে বসতে তার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। হালকা কচুরিফুল-রং এইমাত্র-ভেঙে-প'রে-আসা রেয়নের পাৎলুনে ক্রীজ পড়লো। দেহের স্ফীতিতে ফাটো-ফাটো করতে লাগলো ওপরের পা দুটো, নাইলনের স্বচ্ছ শার্ট ভিজে উঠলো ঘামে। বুকের বোতামটা খুলে দিতে-দিতে বললো, 'কখন থেকে হ'লো ?'

'কী ?'

'জ্বর।'

'কই, জ্বর না তো।'

'তোমার মা বললেন যে।'

'তিনিই বোধহয় আপনাকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন ?'

'তোমার ঘরে আমি আসবো তার জন্য কি আর কারো পারমিশন লাগে ?' হা-হা ক'রে হাসলো সোমেশ্বর। তারপর বললো, 'ঠিকই ধরেছো। উনিই বললেন, "স্ত্রীর কাছে তার স্বামী যাবে, এজন্যে আবার অত ফর্মালিটির কী দরকার ?" কেন, রাগ করলে নাকি ?'

'চলুন ; বসবার ঘরে যাই।'

'না, না, রেস্ট নিচ্ছিলে, তাই নাও। মাথা-টাথা ধরে নি তো ?'

'সামান্য।'

'মাথা ধরেছে ?' সোমেশ্বর ব'সে-ব'সেই চেয়ারটা ঘষটে এগিয়ে নিয়ে এলো সামনে, 'শোও তো, শুয়ে পড়ো তো।'

'কেন ?'

'এখুনি আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনিই সারবে।' খোলা চুল হাতে জড়ালো মানসী, 'আপনার বোধহয় এখানে বসতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'মোটেও না, নট অ্যাটল। বরং এই নিরিবিলি নির্জন ঘরটিতে, জানালা-বন্ধ পর্দা-ফেলা ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু তুমি আর আমি— দ্যাখো মণি, এখানে এসে থেকেই আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?'

মানসী পায়ের ধাক্কায় বেডকভারটা সরিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলুন।'

'কোথায় ?' সব উচ্ছ্বাস এক নিমেষে যেন থমকে দিলো মানসী।

'বসবার ঘরে।'

'কেন? এখানে তো বেশ। আমার সত্যি কোনো কষ্ট হচ্ছে না বসতে।'

'আমার হচ্ছে।'

'অ্যাঁ,' অপ্রতিভ হ'লো সোমেশ্বর, 'আমার জন্যে?'

'না না, তা কেন?' মানসী ভদ্রভাবে হাসলো, 'বিছানায় থাকলেই ভারি অসুখ-অসুখ মনে হয় কিনা।'

'ও,' সোমেশ্বর আশ্বস্ত হ'লো, 'তাহ'লে চলো। কিন্তু একটা কথা।'

'বলুন।' পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা দিলো মানসী।

সোমেশ্বর তাকে অনুসরণ করতে-করতে বললো, 'একটু বেরুতে হবে আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'সে তুমি তখুনি জানবে।'

'আজ আমার বেরুনো হবে না।'

'লক্ষ্মীটি।'

'আজ থাক।' নিজে থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মানসীর।

সোমেশ্বর পেছন থেকে আস্তে তার পিঠে হাত ছোঁয়ালো, 'আজই যে যেতে হবে।'

'এমন কি জরুরি কাজ?'

'ভীষণ জরুরি।' চোখ টিপে হাসলো সে, 'কালকে আমরা যে-জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আজকের এই যুগলযাত্রা হবে তারই একটি বিশেষ অংশ।'

মানসী মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থাকলো, তারপর বললো, 'আমার ভালো লাগছে না।'

'কী ভালো লাগছে না ?'

'কিছুই না।'

'কবে তোমার ভালোলাগবে বলতে পারো ?' সোমেশ্বরের গলা এবার ভারি শোনালো।

মানসীর ঠোঁটে ছোট্টো হাসি ফুটলো, 'লাগবেই একদিন।'

'আসল কথা, আমার সঙ্গে কোথাও একা বেরুতেই তোমার আপত্তি। সত্যি কিনা বলো।'

'তা কেন। একা কি কখনো বেরুই নি ? আর তাছাড়া আমার আবার দু-জন কে আছে ?'

'মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কী, সবই আমি বুঝি।' বসবার ঘরে এসে বড়ো সোফাটার উপর নিজেকে ন্যস্ত করলো সোমেশ্বর, 'শুধু এটুকুই বুঝতে পারছি না তোমার বিরাগভাজন হবার মতো এই রাতটুকুর মধ্যেই আমি আবার কী অপরাধ করলাম।'

মানসী ব্যস্ত হ'লো একটু, গলার স্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রে বললো, আপনি তো দেখছেন, আমার শরীর আজ ভালো না, তাই বলছিলাম—'

'তা অবিশ্যি বলতে পারো, কিন্তু আমি তো তোমাকে আর এখুনি যেতে বলছি না।'

'বেশ তো, বিকেলে না-হয় যাবো।'

এবার সোমেশ্বর রাগ ভুলে একটু হাসলো, 'আজ একটা সারপ্রাইজ দেবো তোমাকে।'

'তা তো আপনি রোজই দিচ্ছেন।'

'রোজের কথা জানিনে, কিন্তু এটা আন্দাজ করো তো।'

'আমার বুদ্ধি ততো প্রখর নয়। আপনিই বলুন না।' ম্লানমুখে হাসলো মানসী।

রহস্য ক'রেও আর দেরি করতে পারলো না সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি বললো, 'কাল সকালে আমাদের রেজিস্ট্রি হচ্ছে।'

'রেজিস্ট্রি! কাল সকালে!'

হাসলো সোমেশ্বর, 'এ তো বরাবরই ঠিক। কেবল সুখের দিনগুলোকে আর একটু এগিয়ে আনা গেলো, এই যা।' একটু থেমে: 'ভালোই হ'লো, কী বলো? কাল তো এমনিতেই আয়োজন হচ্ছিলো, তার সঙ্গে এই উৎসবটিও জুড়ে দেওয়া গেলো।' সোমেশ্বরের মোটা গালে গভীর গর্ত হ'লো হাসতে গিয়ে। পকেট থেকে পাইপ বের ক'রে ধরাতে-ধরাতে বললো, 'আসলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, বুঝলে? রেজিস্ট্রার শিশির আচার্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন মাসখানেকের জন্য, কাল দিন ভালো, রেজিস্ট্রিটা সেরে যেতে চান আর কি। তোমার মা জানেন। এবার তোমার মুখের কথাটি খসুক, অভাগা ধন্য হোক।'

মানসীর গলা অনেক দূর থেকে ভেসে এলো, 'কাল!'

'সকালে রেজিস্ট্রিটা হ'য়ে যাক, বিকেলে যেমন একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার ছিলো তেমনি থাক। তোমার মা তো তোমার জন্মদিনটাকে উপলক্ষ ক'রে আসলে আমাদের বিয়ের খবরটাই জানাচ্ছিলেন সকলকে।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো সোমেশ্বর, 'আমি দু-জন রিপোর্টারকেও খবর দিয়েছি, ফোটোগ্রাফারকে বলেছি, আর—'

'কাল! কালই?'

'আহা, কাল না হোক পরশু, তরশু কি তার পরের দিন, এ-মাসের মধ্যেই তো হ'তো? সেটা রেজিস্ট্রারের দয়ায় কালই হ'য়ে গেলো। বাস্তবিক শিশিরবাবুকে সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'না, না,' মানসীর বেদনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

অবাক হ'লো সোমেশ্বর। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কেন?'

'আমাকে তো বলেন নি আগে।'

'কী আশ্চর্য! এ তো তুমি জানোই।'

মানসী অবোধের মতো বললো, 'কী জানি?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের রেজিস্ট্রি হবে তা তুমি জানো না?'

'জানি।'

'তবে?'

'কিন্তু কাল ব'লে তো জানি না।'

'নাই বা জানলে, তাতে কী হয়েছে?'

'আমার যে বম্বে যাবার কথা আছে।'

'বেশ তো। বিয়ের পরে যাবে।'

'বিয়ের পরে?'

'ওটা আমাদের হানিমূন হবে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সহসা মানসী অনুনয়ে ভেঙে পড়লো, 'আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন।'

এবার জমিদারি মেজাজ চিড় খেলো সোমেশ্বরের। আত্মদমন করতে থুৎনি আর গলার মাঝখানকার নরম মাংসগুলো মোটা হ'য়ে ঝুলে পড়লো। অনেকক্ষণ শব্দ বের করতে পারলো না মুখ দিয়ে। কিন্তু এই মেয়েকে পেতে হ'লে তার যে আরো খানিক ধৈর্যের প্রয়োজন, সে-কথাটাই মনে-মনে আরো অনেকবারের মতো এবারেও মেনে নিতে হ'লো তাকে। বললো, 'আরো ভাববে? এক বছরেও ভাবনা তোমার শেষ হ'লো না?'

অস্থির মানসী ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো, 'না, না, ভাবনা-টাবনা কিছু নয়, সব ঠিক। কেবল আর কয়েকদিন সময় দিন দয়া ক'রে।'

সোমেশ্বর স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো। ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কোনো

শব্দ রইলো না। মাথার উপরকার ফ্ল্যাটে অসময়ে কয়লা ভাঙার আওয়াজটা বড়ো হ'য়ে কানে লাগলো, খাবার ঘর থেকে নন্দর মা-র গলা স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, রান্নাঘর থেকে নবলক্ষ্মীর হাতা-খুন্তির ছ্যাঁকছ্যাঁক অসহ্য মনে হ'লো। ছোকরা চাকর ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলো কী আনতে। জানালার ফাঁকে শিক গ'লে রুল-টানা রোদ ডোরা কাটলো লাল-সবুজ কার্পেটের উপর। মানসীর বেড়ালটা পর্দার তলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে চুপ ক'রে দাঁড়ালো একটু, নীল চোখ তুলে তাকালো এদিক-ওদিক, তারপর আলস্যে এলানো সেই ডোরা-কাটা রোদে নরম ক'রে গা ঢেলে দিয়ে থাবা চাটতে লাগলো নিঃশব্দে।

'ঠিক ক'রে বলতে পারো, মানসী,' সোমেশ্বর সেদিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বললো, 'সত্যি তোমার সময় কখনোই হবে কিনা।'

'আমি— আমি তো—'

'কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না, শুধু দয়া ক'রে বলো—'

ননীবালা ঘরে ঢুকলেন। বেরুবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন। দামি পাড়হীন গরদের শাড়িতে, সোনালি রং মুগার ব্লাউজে, বাছুরের চামড়ার শাদা জুতোতে, হাতের শাদা সিল্কের বটুয়াতে সহসা তাঁকে নিজের মা ব'লেই চিনতে পারলো না মানসী। মাথার কাঁচাপাকা চুল সুন্দর ফোলানো ফাঁপানো। মুখে পাৎলা পাউডারের প্রলেপ। নরম গলায় বললেন, 'তাহ'লে আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে বেরুই একটু।'

'নিশ্চয়ই।' সোমেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোফা থেকে। মানসী লক্ষ্য করলো, মা আজকে সোমেশ্বরকে 'তুমি' বলছেন।

'সময় তো নেই, যা বলা-কওয়া জোগাড়-যন্ত্র এটুকু সময়ের মধ্যেই তো—' মাথা নাড়লেন ননীবালা।

'সে তো ঠিকই। গাম্ভীর্য ছেড়ে মুহূর্তে সোমেশ্বর গদ্‌গদহাস্যে ঘাড় কাৎ করলো।

'তাহ'লে তোমরা দু-জনে মিলে কালকে সকালের ব্যাপারটা ঠিক ক'রে নাও।'

'হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। আপনি তো বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন।'

'আর কত। কেন, অসুবিধে হবে তোমার?'

'না, না, অসুবিধে কী! একে নিয়ে একটু বেরুবো ভাবছিলাম, তা এর তো শরীর ভালো না—'

'বেরুনো কি জরুরি দরকার?'

'এই কিছু কিনবো-টিনবো আর কি। মেয়েদের জিনিস, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে ভালো।'

'তা যাবে'খন। শরীর কি আর সারাদিন খারাপ থাকবে। বিকেলে গেলেই হবে। আচ্ছা, আসি—' কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেলেন ননীবালা।

মানসী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। দরজার ভারি পর্দাটা একটু ন'ড়েই স্থির হ'য়ে গেলো। একটু সময় ব'য়ে যেতে দিয়ে সোমেশ্বর বললো, 'আমার কথার জবাব দাও।'

'কী?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছো এতোদিন ধ'রে?'

'কৌতুক!'

'তবে একে কী বলে? এতোদিন সব ঠিক, হঠাৎ আজ তোমার মতি বদলালে তাকে আর এ-ছাড়া কী ভাবতে পারি।'

মানসী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

'কিছু বলছো না কেন ?'

'কী বলবো ?'

'তোমার ইচ্ছেটা কী ?' সহসা সোমেশ্বর তার অত বড়ো শরীরটা নিয়ে, আঁটো স্যুট নিয়ে, হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মানসীর পায়ের কাছে, 'দয়া ক'রে বলো, বলো, কী তোমার ইচ্ছে, কী তুমি চাও।'

বুকের ভেতরটা কেমন করলো মানসীর। সোমেশ্বরের ব্যাকুলতা দেখে, না কি নিজেরই মনের কোনো গহন বেদনায়, কে জানে। দুটি চোখ তার আপনা থেকেই বুজে গেলো। মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ঝাপটানি চললো খানিকক্ষণ, তারপর যন্ত্রণার মতো অধীর গলায় বললো, 'কিছুই চাই না, আমার আর কিছুই নেই চাইবার, কেবল আর-একটু সময়—'

'ক'দিন ?'

'যে-ক'দিন পারেন।'

'তোমাকে তো বললাম শিশিরবাবু চ'লে যাবেন পরশু রাত্রে। কাল বাদ দিলেও পরশু তো বাদ দেওয়া যাবে না।'

'পরশু ?'

'পরশু সকালে হোক।'

'পরশু সকালে ?'

'তখনো কি আপত্তি করবে তুমি ?'

'আপত্তি। না, আপত্তি কী।' মানসীর ছটফটানি যেন হঠাৎ শান্ত হ'য়ে গেলো। যেন ঝাঁপ দিলো জলে, 'তবে তাই হোক। কালই হোক।'

'কাল। বলছো তুমি ? তাহ'লে ঠিক করি সব ?' উঠে বসলো সোমেশ্বর।

দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে মানসী বললো, 'যদি এই মুহূর্তে সম্ভব হ'তো তাতেও আমার আপত্তি ছিলো না, মিস্টার বাগচি।'

'উঁ। তাই বলো। এতোক্ষণ তবে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছিলো !'

মানসী এবার একটু হাসলো।

'ও মাই প্রেশাস্, মাই ডার্লিং,' আবেগে অস্থির হ'য়ে সোমেশ্বর নিজের পরিপুষ্ট মোটা নরম হাতে জড়িয়ে ধরলো মানসীর দুই হাত, 'এতোদিনে তবে আমার প্রতীক্ষার সত্যি অবসান হ'লো?'

ক্লান্ত দুর্বল ভঙ্গিতে মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে মানসী প্রায় ধুঁকতে-ধুঁকতে বললো, 'এই অসহ্য অবস্থা আমারও অবসান হোক।'

'কী?' সঙ্গে-সঙ্গে ভুরু কুঁচকোলো সোমেশ্বর।

মানসী বললো, 'আমারও প্রতীক্ষার অবসান হ'লো।'

এর পরে সোমেশ্বরের ভালোবাসা আর বাঁধ মানলো না। আরো আপন হ'য়ে, নিবিড় হ'য়ে সে কাছে এলো, মুখ নিচু করলো মুখের উপর। আতঙ্কিত হ'য়ে স'রে যাচ্ছিলো মানসী, কিন্তু মৃদু হেসে সোমেশ্বর তাকে জোর ক'রে টেনে নিলো, বললো, 'অনেক দিন তো কষ্ট দিয়েছো, এখনো কি দূরেই থাকবে?'

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে এলেন ননীবালা।

ভাবী জামাইয়ের গাড়িতে চ'ড়ে কয়েকটা জরুরি দরকারের সঙ্গে-সঙ্গে মানস।র দু-চারজন বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতেও সুখবরটা জানিয়ে এলেন। অহংকার তৃপ্ত হ'লো, শত্রুরা আহত হ'লো। তবু সেই ভরা-সুখের মধ্যেও বুকটা যেন হঠাৎ-হঠাৎ কেঁপে উঠতে লাগলো তাঁর। যতবার মানসীর আজ সকালবেলাকার মুখটা ভাবলেন ততোবার একটা ভয় ঘিরে ধরলো তাঁকে। মেয়ে তাঁর, মেয়ের মনের ছবি তাঁর নখদর্পণে। এই মুখের চেহারা তো অচেনা নয়। তিন বছর আগেও তিনি অহো-রাত্র এই চেহারাতেই দেখেছেন মানসীকে। মান, সম্মান, অর্থ, খ্যাতি, কিছুতেই যেন কিছু এসে যেতো না। একটা শুকনো, নিষ্প্রাণ, নীরস

যন্ত্র মাত্র। যখন যে যেখানে গাইতে বলছে, গাইছে, টাকা দিলে নিচ্ছে, না-দিলে তাকিয়ে দেখছে না, আজ গ্রামোফোন, কাল রেডিও, পরশু সিনেমার প্লে-ব্যাক, দিনরাত তার রিহার্সেল, দিনরাত তার হৈ-হল্লা হট্টগোল, দিনরাত ঐ একটি গলা দিয়ে সব। ছুটোছুটি করেছে, প্র্যাক্‌টিস করেছে, অন্যের বাড়িতে টিউশনিতে গেছে, নিজের বাড়িতে ক্লাশ নিয়েছে, নিজে শিখেছে,—এক মুহূর্ত বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, যেন এই-ই চেয়েছে সারাদিন, আর সারাদিনের পরে একা হওয়া মাত্রই নিবে গেছে আলো, ম'রে গেছে মানুষটা, সদ্য শোকে আচ্ছন্ন বিধবার যন্ত্রণা নিয়ে নিঝুম হ'য়ে থেকেছে।

একমাত্র মানুষ মাস্টারমশায়। শুধু মাস্টারমশায়কে দেখলেই হাসি ফুটেছে মুখে, কথা বেরিয়েছে ঠোঁট ফাঁক হ'য়ে। আদিখ্যেতার অন্ত দেখেন নি ননীবালা। সমস্ত মনপ্রাণ যেন সমর্পণ ক'রে দিয়েছে মাস্টার-মশায়ের কাছে। মাস্টারমশায়ের কথাই কথা, মাস্টারমশায়ের ইচ্ছাই ইচ্ছা। এক-এক সময় ননীবালা রীতিমতো সন্দেহই করেছেন, রীতিমতো খারাপ লেগেছে। না-হয় মাস্টারমশায়ের সাহায্য সে পেয়েইছিলো একদিন। গুণ ছিলো ব'লেই তো পেয়েছিলো? এ তো আর ছাঁটকাটের জিনিস নয় যে মাস্টারমশায় তৈরি ক'রে দিয়েছেন, এ হচ্ছে ভগবানের দান। গলা না-থাকলে তো আর মাস্টারমশায়ের চেষ্টায় এতো লোক এমন মুগ্ধ হ'তো না। গ্রামোফোনের রেকর্ডই বলো, রেডিওর গানই বলো, আর সিনেমার প্লে-ব্যাকই বলো, এ-সব থেকে যে এতো টাকা উপার্জন করেছে আর করছে, তা তো ওর নিজের যোগ্যতাতেই? তাই নিয়ে মাস্টারের সঙ্গে এতো বাড়াবাড়ি করবার কী ছিলো ভেবে পান নি তিনি। আর মরবার আগে কী ভোগান্তিটাই না ভুগিয়ে গেলো লোকটা, কী অর্থদণ্ডই না হ'লো।

কিন্তু ব্যাধি তো সেরেছিলো এতোদিনে, দিব্যি তো হাসিখুশি হ'য়ে উঠেছিলো, রাধানগরের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো ভুলে গিয়ে গানে-গল্পে একটা স্বাভাবিক মানুষের মতোই তো বাস করছিলো, কিন্তু সত্যিই কি নির্মলকে ভুলতে পেরেছে টুনি? মনের কোথায় যেন কামড় পড়লো একটু, ব্যথার মতো চমকে উঠলো স্মৃতি। নির্মলকে মনে ক'রে আজ একটু আনমনা হ'লেন ননীবালা। নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া তখন আর কোনো কারণেই তো এই ছেলেকে ভাবেন নি, কিন্তু আজ তো কোনো স্বার্থ নেই, আজ নির্মলকে তিনি ভালোবেসেই ভাবলেন, সন্তানের মতো ক'রেই ভাবলেন। স্বভাবের সংকীর্ণতা ডিঙিয়ে নির্মল আজ তাঁর হৃদয়ের দরজায় আঘাত করলো।

কিন্তু বাজে চিন্তা বেশিক্ষণ ধ'রে রাখতে পারলো না তাঁকে, যে-চিন্তা আজ তিনি সারা সকাল বহন করেছেন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাড়িতে ঘুরতে-ঘুরতে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে-করতে যে-ভাবনা তাঁকে আতঙ্কিত করেছে, সেই ভাবনাতেই জর্জরিত হ'লেন আবার।

কে জানে, মেয়ের মত হ'লো কি না, না কি বেঁকে বসলো? না জিগ্যেস ক'রে হয়তো এতোটা অগ্রসর হওয়া উচিত হ'লো না—এখানে আহত দর্পে ঘা লাগলো ননীবালার। নিজের কথার নিজেই জবাব দিলেন: জিগ্যেস আবার কী? আমি ওর মা, ওর গুরুজন, পেটে তো আমিই ধরেছিলাম, দশমাস দশদিন গর্ভযন্ত্রণা তো আমিই ভোগ করেছিলাম, আর আমারই কোনো অধিকার থাকবে না কিছু করবার? না, সেটা হবে না। যতদিন বেঁচে আছি, মানতেই হবে আমার কথা, না-মানলে আমিই বা ছাড়বো কেন? আর তাছাড়া তাঁর সপক্ষে আছে সোমেশ্বর। সোমেশ্বরের শক্তিকে তিনি সত্যিই তারিফ করেন। এই ক'বছরের নতুন

জীবনে, নতুন জগতের খবর কিছু তো কম পেলেন না। আরো কত লোক এলো, গেলো, দু-দিন চারদিন এগুলো পিছোলো, তারপরেই ফুস্। কিন্তু লেগে রইলো এই সোমেশ্বরই শুধু। ননীবালার ভাগ্যেই রইলো, ননীবালা যা চেয়েছিলেন, যতখানি চেয়েছিলেন ঠিক ততোখানি পূরণ করবার জন্যই এই সোমেশ্বরকে এতো ধৈর্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ঈশ্বর। সোমেশ্বর ছাড়া সোমেশ্বরের জুড়ি কি আর একটা পাত্রও আছে এই বাংলা দেশে, যাকে জামাই করতে ননীবালা এতোখানি উদ্যোগী হ'য়ে উঠতে পারতেন ?

ধীর মন্থর গতিতে সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। সোমেশ্বর একা ব'সে আছে, একটা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে ব'সে-ব'সে।

একা কেন ? একা হবার যে-সুযোগ তিনি দিয়ে গেলেন তা কি একজনের একা হওয়া ?

'টুনি— মানে মানসী— মানসী কোথায় ?'

ননীবালা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন খেয়াল করে নি সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি এলানো থেকে সোজা হ'য়ে বসলো, উৎসাহভরে বললো, 'হ'লো, কিছু কাজ কি এগুলো ?'

'তা এগুলো, কিন্তু তুমি যে একা ব'সে রয়েছো ?'

'ও একটু মুখ-হাত ধুতে গেছে, বলছিলো বড্ডো মাথা ঘুরছে, তাই—'

'ও,' আশ্বস্ত হলেন ননীবালা, 'কথাবার্তা সব হ'লো তোমাদের ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে কালকের মধ্যেই হ'য়ে যেতে পারবে সব ?'

'নিশ্চয়ই।'

ননীবালা উপচে পড়লেন খুশিতে। এতোদিনে তবে সত্যি তাঁর সব

সাধ পূর্ণ হ'লো ? জাতে উঠলেন। সমাজের একেবারে উঁচুস্তরে। একেবারে রাজার ঘরে ঠাঁই মিললো ? আনন্দের আবেগে যেন থইথই করলেন নিজের মধ্যে, নিজের ঘরের মসৃণ মেঝের শাদা সিমেণ্টে দাঁড়িয়ে।

এই ফাল্গুন মাসেই কী গরম পড়েছে কলকাতা শহরে। বাব্বা! পাখার স্পীডটা শাঁ ক'রে বাড়িয়ে দিলেন। এদিকের দরজায় এসে খামকাই একটা ধমক দিলেন নন্দর মাকে, ছোকরা চাকরটাকে ডেকে অকারণে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বেড়ালটাকে ম্যাঁও-ম্যাঁও করতে শুনে পা দিয়ে ঠেলে ছিটকে দিলেন ও-পিঠে, জানালার মাথায় ব'সে যে-কাকটা ধূর্ত চোখে তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে-দেখতে গান ধরেছিলো, হুস্-হুস্ ক'রে মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেন তাকে, একবার রান্নাঘরে এলেন, খাবার ঘরের টেবিলের চাদরটা টান করতে লাগলেন— হাতে-পায়ে যেন বেগ নেমেছে একটা, ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন। শেষে অনেক পরে, অনেক চেষ্টায় শান্ত হ'য়ে এ-ঘরে এসে বসলেন। শাশুড়িসুলভ সস্নেহ গাম্ভীর্যে বললেন, 'তাহ'লে আজ রাত্রেই একটা ঘরোয়া পার্টি করি, দু-চারজন আসুক, একটু খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা হোক, তোমার আশীর্বাদটাও সেই সঙ্গে হ'য়ে যাক।' হাসলেন একটু, 'অবিশ্যি তোমাকে আশীর্বাদ করতে আমার তোমার বাড়িতেই যাওয়া উচিত, কিন্তু আমার কী ততো ক্ষমতা আছে ? তোমার মতো যোগ্য জামাইকে উপযুক্তভাবে বরণ করতে যাবো, এমন শক্তি আমার নেই।'

'কী আশ্চর্য !' বিগলিত সোমেশ্বর বিনীত হাস্যে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো, 'আমার বাড়ি আপনার বাড়িতে কি আজ আর কোনো তফাৎ আছে ? যখন খুশি যাবেন, যেমন ক'রে খুশি যাবেন। কিন্তু আমি তো জানেন, লক্ষ্মীছাড়া গোবিন্দ। বাড়ি আমার শূন্য। একমাত্র বিবিই আমার সঙ্গী।'

বিবি হচ্ছে সোমেশ্বরের অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নাম। কুকুর

ননীবালার চক্ষুশূল, কিন্তু তাই ব'লে কি এই কুকুর? বিবির উপর সোমেশ্বরের টান তো তিনি জানেন। কতদিন নিয়ে এসেছে সঙ্গে ক'রে, দেখে হাত-পা হিম হ'য়ে এসেছে, তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন গায়ে হাত দিতে, তারপর বাথরুমে গিয়ে হুস্‌হুস্‌ ক'রে স্নান করেছেন।

এ-কথা শুনে একগাল হেসে বললেন, 'তোমার বিবিকে এবার আমিই এনে রাখবো। আমার মেয়ে তোমার বাড়ি যাবে আর তোমার মেয়ে আমার বাড়ি আসবে, কী বলো?'

উচ্চকণ্ঠে হাসলো সোমেশ্বর, ননীবালাও গলা মিলোলেন।

'তাহ'লে তা-ই ঠিক করি, কী বলো?'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর বললো, 'এ-বিষয়ে আর আমার কী বলবার থাকতে পারে? আপনি যা ঠিক করবেন তা-ই হবে। তবে আশীর্বাদ তো আপনার সারাদিনই পাচ্ছি, তার জন্যে আবার আলাদা—'

'তা তো পাচ্ছোই—' ননীবালার দুই চোখে আদর ঝ'রে পড়লো, 'তবু তো আমার একটা সাধ আছে?'

'বেশ তো।'

'তারপর কাল সকালে যেমন রেজিস্ট্রি হবার হোক, বিকেলে যাকে যেমন নিমন্ত্রণ করেছি, তা-ই থাক—'

'বেশ তো।'

'আর-একটা কথাও ভাবছি—'

'বলুন।'

'সেই সঙ্গে একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠানও করি।'

'অনুষ্ঠান!'

'মানে, একটুখানি শালগ্রাম-শিলা সাক্ষী ক'রে, পুরুৎ ডেকে, হিন্দুমতে

বিয়ে আর কি। বুঝতেই তো পারো, আমরা সব সেকেলে মানুষ, বিয়ে বলতে তা-ই জানি, তা-ই দেখেছি, ও-সব না-হ'লে মনটা কেবল খুঁতখুঁত করে, তৃপ্তি হয় না।'

সোমেশ্বরের হাসি বিস্তৃত হ'লো, 'আপনার যাতে তৃপ্তি তাই করুন, এ নিয়ে আর এতো বলাবলি কিসের?'

'তোমরা আজকালকার ছেলে, হয়তো সে-সব মানো না, ভালো লাগে না, কিন্তু শুভদৃষ্টি না-হ'লে, মালাবদল না-হ'লে যেন বিয়েই মনে হয় না।'

'না, না, ও-সব অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লাগে। ওতে আমি বিশ্বাসও করি।'

'এই তো, কথার মতো কথা। তুমিই বলো তো বাবা, কনে যদি লাল শাড়ি না পরে, ঘোমটা না দেয়, স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে মন্ত্র পাঠ না করে, তাহ'লে কি একটা গাম্ভীর্য আসে বিয়েতে?'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু আমি বলছিলাম যে এ-সব হিন্দু বিয়ের ব্যাপারে তো অনেক খুঁটিনাটি, ঠাকুর পুরুৎ লাগে, লগ্ন তারিখের দরকার হয়, আর তাছাড়া—'

'সে-সব তুমি ভেবো না। কাল আটই ফাল্গুন বিয়ের তারিখ আছে, লগ্নও খুব সুন্দর সময়ে, একেবারে সন্ধ্যা সাতটা। তাহ'লে সেই মতেই সব করি, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই। আমাকে কী করতে হবে সেটা বলুন।'

'তোমার দিকে তো কোনো হাঙ্গামা নেই। আত্মীয়-পরিজনেরা একটু চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তুলে দেবেন, বিয়েতে আসবেন, খাবেন-দাবেন, ফুর্তি করবেন—'

'তাহ'লে যত ঝামেলা বুঝি মেয়ের পক্ষই পোহাবে?'

'তা পোহাবে না ? আর ঝামেলাই বা বলছো কেন ? আপন জিনিস পরকে উৎসর্গ করার একটা আয়োজন তো নিশ্চয়ই থাকবে ? জীবনে কি এ একটা সোজা ঘটনা।'

'তা তো ঠিকই।'

'আর তোমরাও তো বউভাত করবে। সে তুমি যত জাঁকজমক ক'রেই করো না কেন, আপাদমস্তক হিরে-জহরত দিয়ে মুড়ে দাও না কেন, সেটা হ'লো তোমাদের মান-সম্মানের ব্যাপার।' এখানে সোমেশ্বরকে একটা ইঙ্গিত দিলেন ননীবালা।

সোমেশ্বর খুশি হ'লো। জাঁকজমকের কথাটা ভালো লাগলো তার। আর তখুনি তার মন জাঁকজমকের তালিকা রচনায় ব্যাপৃত হ'য়ে উঠলো।

'কিন্তু বাবা, একটা কথা—'

'বলুন।'

'একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

'কী সাহায্য ?'

'এ-সব ব্যাপারে জনবল চাই, তুমি যদি সেটার ভার নাও—'

'সে তো অতি সহজ কথা।'

'আর গাড়িটাও চাই একবেলার জন্য।'

'আপনি এখুনি রেখে দিন না—'

'আর তুমি ?'

'আমার লাগবে কিসে ? এখন একটা ট্যাক্সি ক'রে চ'লে যাবো, আর গিয়ে পড়লে আমার গাড়ির অভাব হবে না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেরই তো গাড়ি আছে। দরকার হয় নিয়ে নিলেই চলবে।'

'তাহ'লে তো খুবই ভালো কথা। মেয়েটাকে এই যে কতবার বলি একটা গাড়ি কেন, তা সে কানে তোলে না ! কত সুখে মানুষ করেছি।

বাপ বেঁচে থাকতে তো আদরের অভাব ছিলো না। না-হয় শহরে না-ই থাকতুম, গ্রামে আমরা মানে-সম্মানেই ছিলুম। সেখানে দত্তমল্লিকদের প্রতিপত্তি তো বড়ো কম ছিলো না। বংশমর্যাদায়ও খাটো নয়। ওর বাপ মারা গেলেন পরে এই গান-গান ক'রেই আমাদের কলকাতা আসা। গ্রামে কি সে-সব হয়? না কি গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কোনো শিক্ষিত লোক থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

'আর এলাম ব'লেই না তোমার মতো দেবতুল্য মানুষের হাতে আজ মেয়েটিকে তুলে দিতে পারছি।'

'কী যে বলেন! আপনার মেয়েকে পেয়েই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

'অবিশ্যি এ-কথাও আমি তোমাকে বলবো, মেয়ে আমার বড়ো শাদা-সিধে, বড়ো ভালোমানুষ, এ-রকমটি তুমি সচরাচর পাবে না।'

সোমেশ্বর শব্দ ক'রে হাসলো, 'সে-কথা আমি জানি না? জানি ব'লেই তো হাত পেতে আছি এতোদিন ধ'রে। যাক গে, আপনি আমাকে যদি একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দেন খুব ভালো হয়। গাড়িটা থাক, ওটা আপনি যেমন খুশি ব্যবহার করুন, ও তো আপনার মেয়েরই।' সলজ্জ কুণ্ঠায় সে যুবকোচিত ভঙ্গি করলো। হাতের প্ল্যাটিনামের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সহসা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললো, 'এখুনি আমার যাওয়া দরকার, ওদিকেও কিছু ব্যবস্থা আছে।'

'তুমি এক কাজ করো—' আপন হ'য়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ননীবালা, 'গাড়িটা এখন বরং তুমি নিয়েই যাও, আমি ততোক্ষণে এদিকে একটু গুছিয়ে নিই, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলে তখন আমি অন্য কাজে বেরুবো।'

'বেশ।'

'আর সেই সঙ্গে তোমার দু-একজন বয়-বেয়ারা, আর সেই ছেলেটি, যে তোমার লেখাপড়ার কাজ ক'রে দেয়, তাদের যদি একটু পাঠিয়ে দাও—'

'ঠিক আছে।'

'কিছু মনে করছো না তো? জন বলতে তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার এখানে।'

'আশ্চর্য! এ নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? আর কী করতে হবে তাই বলুন।'

'আচ্ছা, একদিনের মধ্যে কিছু কার্ড ছাপানো কি সম্ভব?'

'কেন নয়? ডবল চার্জ দিয়ে করিয়ে নিলেই হবে। বিয়ের নিমন্ত্রণ তো?'

'হ্যাঁ। একটু সুন্দর-টুন্দর ক'রে, এখনকার ফ্যাশানে—'

'কাল দুপুরের মধ্যে পেলে চলবে?'

'দুপুরের মধ্যে পেলেই চলবে। তক্ষুনি গাড়ি ক'রে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কেউ গিয়ে দিয়ে আসবে। বড়ো নেমন্তন্নগুলো আমি আজই মুখে-মুখে সেরে আসবো। চিঠি দেওয়া বিয়ের একটা চিরাচরিত রীতি, এই আর কি।'

'আপনার নামেই ছাপা হবে তো?'

ননীবালা মিষ্টি ক'রে হাসলেন।

সোমেশ্বর চ'লে গেলে আকাশে পাখা মুড়ে ভেসে-থাকা পাখির মতো কতক্ষণ ঝিম ধ'রে রইলেন ননীবালা। যেন কিছু ভাববার রইলো না, করবার রইলো না, কেবল সুখ, সুখ, আর সুখ।

দেখতে-দেখতে বেলা বেড়ে উঠছে; দেয়ালের বড়ো ঘড়িতে ঢংঢং ক'রে বারোটা বাজলো। আজ ননীবালার একাদশী, তাড়াতাড়ি স্নান

ক'রে তাড়াতাড়ি বড়ো বাটির একবাটি দুধ গরম ক'রে খেয়ে নিলেন, কলা খেলেন, মীটসেফ থেকে দু'খানা সন্দেশ বের ক'রে খেলেন, খান কয়েক বিস্কুটও খেলেন সেই সঙ্গে। তারপর গোটা কয়েক কমলা ব্যাগের মধ্যে ভ'রে নিয়ে প্রস্তুত হলেন বেরুবার জন্য। আজ তিনি ভাত খান না, দুপুরে তাঁর জন্যে ঘি-মাখানো পাতলা আটার রুটি তৈরি হয়েছে, লাউ-পাতার ঝোল, ছানার ডালনা, ডাল-পাতুরি, এ-সবও হয়েছে। কিন্তু এখন ব'সে সে-সব খাওয়ার সময় কই? আর খেলেই শুতে ইচ্ছে করে, দুটো-আড়াইটের মধ্যে ফিরে এসে তখন ধীরে-ধীরে হবে'খন সে-সব।

নবলক্ষ্মী খেয়ে যেতে বলেছিলো ব'লেই এ-সব বললেন। বললেন, 'আজ একাদশী হ'য়ে আমার বরং সুবিধেই হ'লো, বুঝলি না? আজ তো আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই, দিব্যি হালকা হ'য়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবো।'

নবলক্ষ্মী মুখ নিচু ক'রে মাথা নাড়লো।

'একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো বড়ো কম কথা নয়? আর এমন হুট ক'রে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।" অবিশ্যি গয়নাগাঁটি সব আমি আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম, কাপড়-চোপড়, তা-ও কিছু কম নেই। আর আমার দেবার আছেই বা কী? আমি হলাম নেহাৎ একটা ইয়ে মানুষ, রাজ-রাজড়ার ঘরে মেয়ে দিলে নিজের দেবার কিছু থাকে কি? ছাখ গিয়ে, এদিক থেকে এই যে আমি এতো সোনা-দানা দিচ্ছি, ও তো সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র। ওরা দেবে মন-মন সোনা, আর সেখানে আমি দিচ্ছি কয়েক ভরি মাত্র। অবিশ্যি এ-কথা বলতে পারিস, আমার মতো ক'জন বাপ মা-ই বা এতো দিতে পারে, আর পারলেও প্রাণে ধ'রে দেয়, সেটা সত্যি কথা। কিন্তু কী করবো বল? মন তো মানে না। একটা মাত্র মেয়ে, যথাসর্বস্ব দিয়েও যেন আশ মেটে না। এই তো চলেছি

বেনারসি কিনতে, তারপর জামাইয়ের জন্যও লাগবে কিছু, কত টাকা নিয়েছি ছাখ—' মস্ত ব্যাগ থেকে ননীবালা টাকার বাণ্ডিল বার ক'রে দেখালেন, 'এই সবই তো ঢেলে আসবো ? অথচ এও তো জানি, আমি একশো টাকা খরচ ক'রে যে-বেনারসি কিনবো, সে-বেনারসি ওদের বাড়ির বেনারসির কাছে একটা ন্যাকড়ার মতো দেখাবে। বউভাতে দেবে তো ওরা। দেখবি তো সবই। সাচ্চা সোনার স্থতো দিয়ে তৈরি হবে সেই কাপড়। সূর্যের আলো পড়লে তাকানো যাবে না, গালালে না-হোক সেরটাক সোনাও কি না বেরোবে।'

সোমেশ্বরকে এলগিন রোডে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা আবার তখুনি ফিরে এসেছে বালিগঞ্জে। ননীবালা আর দেরি করলেন না। যেতে-যেতে মেয়ের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন একবার। শুয়ে আছে মানসী, মুখটা ওদিকে ফেরানো, এদিকে বালিশ-ছাওয়া খোলা চুল।

'কী রে, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে নাকি।'

জবাব শোনা গেলো না।

'আমি বেরুচ্ছি, বুঝলি ? ফিরতে দেরি হবে অনেক, তুই খেয়ে নিস।' ঘর পেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় এসে গলা চড়ালেন, 'নবলক্ষ্মী আর নন্দর মা-ও যেন খেয়ে নেয়।' তারপর তরতরিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

গাড়িতে আরাম ক'রে এলিয়ে ব'সে প্রথম কোনদিকে যাবেন, কী করবেন সেটাই চিন্তা করলেন। কালকে যারা আসবে, সে-নিমন্ত্রণ তো আগেই করেছেন, কিন্তু আজকের আশীর্বাদের সময়েও তো ডাকতে হবে বাছা-বাছা কয়েকজনকে ? তাদের নামগুলো আর মুখগুলোই মনে করতে তিনি চেষ্টা করলেন।

এখন, এই মুহূর্তে অবিশ্যি কেনাকাটার ব্যাপারটাই তাঁর কাছে প্রধান। আর সময় নেই। এই বেলাটুকুর মধ্যেই যা করবার ক'রে নিতে হবে। নিমন্ত্রণের কাজ অন্যকে দিয়ে করালেও চলতে পারে, ফোন ক'রে দিলেও হ'তে পারে, কিন্তু কেনাকাটার কাজে কাউকে দিয়ে তাঁর ভরসা নেই। ভরসা করবার যোগ্য লোকজনই কি আছে নাকি সংসারে। প্রত্যেকটা লোক আজকাল অবিশ্বাসী, ধড়িবাজ, মিথ্যে কথা বলে। আর এতো টাকার কেনাকাটা! ননীবালা শূন্যে ভ্রূকুটি হানলেন।

কিন্তু তবুও দু-একটা বাড়িতে আজ নিজেই যাবেন তিনি। যাওয়া দরকার। ব্যাপারটা নেহাৎ ছোটো নয়, সে-ভাবে সারবেনও না, শত্রুরা ঘিরে আছে চারদিক। সকলকে তিনি চকিত করবেন, ব্যথিত করবেন, দাগা দেবেন প্রাণে। অনেক ভেবে নিমন্ত্রণের লিস্ট করেছেন। অনেক ভেবে আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছেন। টাকা খরচ হবে। তা হোক। ঘরে-ঘরে যা-ই করুন, মুঠো হাত খুলুন বা না-খুলুন কিছু এসে যায় না, আপন ঐশ্বর্য আপনি দেখে সুখ কী? পরকে দেখাতে পারলে তবে না তার মূল্য। আর দেখাবার সুযোগ এর চেয়ে আর বেশি কবে আসবে তাঁর জীবনে? কখনোই না। প্রায় ছ'মাস যাবৎ তিনি তিল-তিল ক'রে তাঁর ভাবনাধারাকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন, ভেবে-চিন্তে তিন মাস ধ'রে বিয়ের তারিখ পাকা করবার ফন্দি এঁটেছেন, এক মাস আগে থেকে এই তারিখটিকে লক্ষ্য ক'রে বিয়ের ফর্দ তৈরি করেছেন। মানসী না জানুক, তিনি জানতেন মানসীর নিয়তি মানসীকে এই লক্ষ্যেই টেনে নিয়ে আসছে সজোরে, পৌঁছতে যে আর বিলম্ব নেই তাও ভালো ক'রেই জানতেন। আর কাজ এগিয়ে এসেছে জেনেও তিনি চুপ ক'রে ব'সে থাকবেন ততোটা শৈথিল্য তাঁর মনে বা দেহে কোনোখানে নেই।

অবিশ্যি চুপ ক'রে কোনোদিন বা কখনোই তিনি ছিলেন না। থাকলে

এই সৌভাগ্য এমন ক'রে হাতে এসে ধরা দিতো না। তার জন্যে ভাবতে হয়েছে, চেষ্টা করতে হয়েছে, সীতাহরণের জন্য রাবণের যেমন সোনার হরিণ তৈরি করবার দরকার হয়েছিলো, ঠিক তেমনি ননীবালাকেও সেই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। রাবণ সীতাকে পেতে চান, কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটাই যেমন সব নয়, তেমনি সোমেশ্বরের ইচ্ছেটাও তাঁর মেয়ের মনের কাছে সব ছিলো না। সব কেন, কিছুই ছিলো না। সেখানে মায়ামৃগের পার্টটা ননীবালাকেই নিতে হয়েছিলো। দু-দিক থেকে দু-জনকেই ছলনা করতে হয়েছে তাঁকে। নিজের বিচিত্র সুচিত্র ছলনার রূপ দেখে নিজেই কতবার মুগ্ধ হয়েছেন। সোমেশ্বরের কাছে তিনি কি তিনি থাকতেন? ননীবালার সোনার বিম্বই দেখেছে সে, দেখেছে আর অভিভূত হয়েছে। মানসীকে পাবার জন্য না-জেনে সোমেশ্বর তাঁর পিছে-পিছেই হেঁটেছে, মানসীর কঠিন ব্যবহারে সে যতবার যতদূরে ছিটকে গেছে, ততোবার ততোদূর থেকে তিনিই তাকে সাপটে নিয়ে এসেছেন।

ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড মনে প'ড়ে গেলো ননীবালার। রাবণরাজার মতো দুই চোখে আলো জ্বালিয়ে ননীবালাও আপন সাফল্যে আপনিই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠলেন। চুনোপুঁটি তো নয় সোমেশ্বর, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, অনেক দেখে চুল লালচে হ'য়ে এসেছে, অনেক প্রতাপ খাটিয়েছে অনেক স্ত্রীলোকের উপর, জীবন ভ'রে এটাই জেনেছে এই জগৎসংসারের সকল লোকজন তারই অধীন, তারই দাস, পাবার জন্যই সে এসেছে, আর এরা এসেছে দেবার জন্য। পেতে গেলে যে কষ্টও করতে হয় এই বোধ সোমেশ্বরের জ্ঞানের এলাকার বাইরে। মানসীর বিমুখ মন, অনিচ্ছুক প্রেম আর সংযত ব্যবহার প্রথম থেকেই ধাক্কা

দিয়েছে তাকে। এই ধাক্কায় জেদ বেড়েছে, ইচ্ছে বেড়েছে, ক্ষুধা বেড়েছে, আর জমিদারনন্দনের সেই সব রিপুর আগুনে ননীবালা ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে প্রজ্বলিত করেছেন। কোন যজ্ঞের কী বিধি তা যে তাঁর এতো নখদর্পণে ছিলো, নিজেই কি জানতেন ?

জানতেন। জানতেন। সব জানতেন। প্রথম যেদিন সোমেশ্বর তাঁদের বাড়িতে এসেছিলো, টকটকে চেহারা নিয়ে রাজার ভঙ্গিতে রাজা হ'য়ে বসেছিলো সোফায় হেলান দিয়ে, মানসীর গান শুনেছিলো, মুগ্ধ আবেশে চোখ বুজেছিলো, তারিফ করেছিলো, গদ্‌গদ ভাষায় আলাপ করেছিলো, সেদিন থেকেই প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে তিনি তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু অচৈতন্য বুদ্ধি দিয়ে জেনে ফেলেছিলেন সব কথা। মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে ছিলো মানসী, কথাবার্তা জমাতে পারে নি সোমেশ্বর। তাতে কী। ননীবালা তো ছিলেন সেখানে। তাঁর মুখের সস্নেহ হাসিটি তো মলিন ছিলো না, যত্নে তো কোনো ত্রুটি ছিলো না, আগ্রহেও ভাটা ছিলো না। অপুত্রক বর্ষীয়সী মহিলার পুত্রস্নেহের ব্যাকুল বাসনার ভানকেও শৈশবে মাতৃহীন পুরুষ চরিতার্থ করতে লোলুপ হয়। ননীবালা কি জানেন না পুরুষমানুষ যত বড়োই দিগ্বিজয়ী পুরুষ হোক না, গৃহে তারা শিশু, অসহায়। মায়ের ক্ষুধা তাদের চিরকালের। স্ত্রীর মধ্যেও তারা মাকেই আবার পেতে চায়। মায়ের যত্নই খোঁজে। মায়ের পার্টে কি ননীবালার একতিলও খুঁত ছিলো সেদিন ?

এসেছিলো সুপ্রিয়া চ্যাটার্জির সঙ্গে। ব্যারিস্টার এ. এন. চ্যাটার্জির মেয়ে, রামেন্দু ভট্টাচার্যের আর-একজন কৃতী ছাত্রী। ননীবালা লক্ষ্য করেছিলেন সোমেশ্বরের সঙ্গে মেয়েটির বন্ধুতা বা আলাপের গতিটা ততো সরল নয়। রং ধরেছে। বুকটা কড়কড় ক'রে উঠেছিলো। সেই সঙ্গে

বিদ্যুতের মতো একটা ক্ষণিক আলোও তিনি দেখেছিলেন, আশাও পেয়েছিলেন, অতৃপ্ত সোমেশ্বরের তৃপ্তি যে সুপ্রিয়াতেও আবদ্ধ থাকবে না, সেটা তৎক্ষণাৎ ধ'রে ফেলেছিলেন তিনি। আর ধ'রে ফেলা মাত্রই মায়া-মৃগ ঝলমল ক'রে উঠলো তাঁর সোনার অঙ্গ নিয়ে। আর তারপর আস্তে-আস্তে খেলিয়ে-খেলিয়ে এইখানে তো নিয়ে এলেন। মেয়েটা বোকা! কিসে ওর ভালো, কিসে ওর মন্দ বোঝে কখনো? না কি ভাবে সে-কথা? না কি এই যে ননীবালা আপ্রাণ চেষ্টায় এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন তার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা আছে? কিচ্ছু নেই। নেই তো নেই। চুপচাপ থাকলেই পারিস। নিজেকে সমর্পণ করলেই পারিস। ভাবলেই পারিস আমার যখন মাথা নেই, মার বুদ্ধিতেই চলি না, তা নয়। মুখের দিকে তাকানো যাবে না। থমথম করবে মেঘ, কিন্তু ফাটবেও না, ঝরবেও না। কেবল অন্ধকার ক'রে দেবে চারদিক। একটা গুমোট চলবে কয়েক দিন। কথা বললে তার জবাব তৈরি আছে, কিন্তু একটা অবুঝ, হাবা বোবা মেয়ের নিঃশব্দ রাগের সঙ্গে কী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবেন ননীবালা। তখন মনে হয় ঠিক আগের মতো চুলের মুঠি ধ'রে পিঠের উপর গুমগুম কয়েকটা লাগাতে পারলে ঠিক হয়, ঝাল মেটে মনের, কিন্তু সে-সাহস আজ আর নেই ননীবালার। মনে-মনে রাধানগরের দত্তমল্লিক গোষ্ঠীকেই দায়ী করেন, বাপের স্বভাব পেয়েছে ব'লে একলা ঘরে মাথা খোঁড়েন।

তবু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে ঢং ধ'রে তীরের কাছে এসেও তরী ডুবিয়ে দেয় নি মেয়ে তার জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নৈলে সব আকাঙ্ক্ষায় আজ তাঁর জলাঞ্জলি হ'তো। জীবনে যা-কিছু চেয়েছেন, যত কিছু পেয়েছেন, এই পাওয়াটাই কি তার মধ্যে চরম পাওয়া নয়?

সুপ্রিয়ার সঙ্গে সোমেশ্বর সেদিন মানসীকে তার বাড়ির এক গানের

জলসায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলো। বাগচি লজে বসবে সেই আসর। অনেক গাইয়ে এসেছে বাইরে থেকে, বাংলার গায়ক-গায়িকাদেরও বাদ দিচ্ছে না সে। সোমেশ্বরের ধারণা গাঁয়ে যোগী ভিখ পায় না তাই, নইলে গানে আজকাল বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। তার মনে সেদিন একটা প্রতিযোগিতার ভাবই ছিলো। বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে লড়াইতে বসাতে চেয়েছিলো কলকাতার গাইয়েদের। মানসীকেও সে সেই সম্মান দিতে চায় ব'লেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলো, মানসী আর সুপ্রিয়া ঠুংরি গাইবে। সোমেশ্বর মনে করে এ-দেশের এ-দুটি মেয়ে গানের জগতে অনন্যসাধারণ।

শীতকাল। কলকাতা জমজমাট। এখানে একজিবিশন, সেখানে সার্কাস, ওখানে কুস্তি, নিউ মার্কেট সেজেগুজে ফুলবাবু। ফ্লাওয়ার শো, ডগ শো, আরো যে কত কী অন্ত নেই। তার মধ্যে প্রধান হ'লো গানের কনফারেন্স। একমাস ধ'রে চলেছে সেই গান। বড়ো-বড়ো ওস্তাদরা হাজার-হাজার টাকা মুজরো নিয়ে কত দূর-দূর দেশ থেকে বাংলা মুলুকে চ'লে এসেছে গলার কসরৎ দেখাতে, বাহবা নিতে। তারা জেনেছে কলকাতা শহরে টাকার গাছ আছে, হাত বাড়ালেই মেলে। কলকাতা শহরে ফুর্তি আছে, চাইলেই পাওয়া যায়, কলকাতা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। সেখানকার লোকেরা টাকা ছড়াতে তো জানেই, সমঝদারও বটে। তা নৈলে হাজার-হাজার টাকার টিকিট এমন অনায়াসে বিক্রি হচ্ছে কেমন ক'রে। লোকেরা রাতের পর রাত এমন পাগল হ'য়ে গান শুনছে কেমন ক'রে, যারা টিকিট কাটতে পারছে না, তারা আছে ফুটপাতে। ব'সে আছে সারারাত, শুনছে, মোহিত হচ্ছে, অপার্থিব আনন্দের নেশায় ভুলে গেছে দেহের সুখদুঃখ। কাগজে ছবি উঠছে এই সব গুণগ্রাহীদের।

ননীবালাও সেই গুণগ্রাহীদের একজন হয়েছেন দু-একদিন। মেয়ের

দৌলতে বেশি দামের সামনের আসনে ব'সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছেন এদের কাণ্ডকারখানা। বাইজিদের দেখেছেন, ওস্তাদদের দেখেছেন, আলো দেখেছেন, ফুল দেখেছেন, লোকে লোকারণ্য প্যাণ্ডেলের অগুনতি কালো-কালো মাথা দেখেছেন, গণ্ডগোল শুনেছেন, পরিচিত মানুষ দেখলে যারা চেনার যোগ্য তাদের চিনে গল্প করেছেন, যারা অযোগ্য তাদের করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ধন্য করেছেন। তারপর ভেবেছেন কত টাকার টিকিট বিক্রি হ'লো এক রাত্রে, ক'টা লোক ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়লো, ক'জন মানুষ সসম্মান নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে তাঁর মতো। বাইরে থেকে হাসাহাসির শব্দ এসেছে, ফুর্তির উদ্দামতা। এসেছে পাঁপর ভাজার গন্ধ, ভেতরে ঠোঙা-ঠোঙা পেঁয়াজি এসেছে। লোকেরা চাকুম-চুকুম খাচ্ছে, তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছে, চেয়ারের হেলানে ঘুমুচ্ছে গোঁ-গোঁ নাক ডাকিয়ে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ঢুলে-ঢুলে পড়ছে, ননীবালাও ঢুলতে-ঢুলতে বারে-বারে খুরি ভর্তি গরম চা আনিয়ে খেয়েছেন, তারপর কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে এক ঘুমে রাত কাবার।

গান তিনি শোনেন নি। গান শুনতে যানও নি। আর এ-কথাও তিনি জানেন, খবরের কাগজ আলো ক'রে গানের শ্রোতাদের যে-সব ভিড়ের ছবি বেরোয়, তারা বেশির ভাগই তাঁর মতো শ্রোতা। তারা আসে ভিড় বাড়াতে, দল বেঁধে রাত জাগতে, সিগারেট টানতে, নেশা করতে, চা পেঁয়াজি খেয়ে জিবে শান দিতে। ছেলেরা মেয়ে দেখে। মেয়েরা সাজগোজ দেখায়। নিত্যি তিরিশদিনের নিয়মভাঙার আনন্দে মেতে উঠতে আসে সব। তা মন্দই বা কী। এমন সব উত্তেজক রাত কি জীবনে রোজ আসে? তা নৈলে গান! ঐ সব গানে শোনবার আছেটা কী! তিনি তো ভেবে পান না। কেবল মাথা-কোটাকুটি আর কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, শরীরটাকে ভেঙেচুরে সারাটা রাত ধ'রে

লোকগুলো কলজে ফাটিয়ে কী চিৎকারই না করে। পারেও। আর তাই শুনে মূর্ছা যান তাঁর মেয়ে। প্রত্যেক রাত্রে নির্ঘুম চোখে ঠায় ব'সে থাকে সেখানে, মোহের মতো তাকিয়ে থাকে, পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে ওঠে শুনতে-শুনতে, ডাকলে সাড়া নেই— যেন জ্ঞান নেই কোনো।

শুধু এই গানই নয়, কোনো গানই ভালোবাসেন না ননীবালা। তাঁর মনের মধ্যে এই সুকুমার বৃত্তিটি নেই, সুরের কোনো জাদু নেই তাঁর জীবনে। নেহাৎই মেয়ে একটা মস্ত গাইয়ে, এই গানই তাঁর লক্ষ্মী, গান দিয়েই এইখানে তিনি সমাসীন, মান-সম্মান প্রতিপত্তি এই গানের হাত ধ'রেই এসেছে তাঁর দরজায়, তাই ঝালাপালা হ'য়েও সহ্য করেন। তা নৈলে কোনোখানে গান শোনার নিমন্ত্রণ হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ অরাজি। চায়ের নিমন্ত্রণে যান, কিছু দেখবার নিমন্ত্রণ হ'লে যান, ছবির মহরতে যান, এমন কি মেয়ে যখন গ্রামোফোনে গান দিতে যায় তখনও সঙ্গে-সঙ্গে দমদম চ'লে যান গাড়ি চ'ড়ে বেড়িয়ে আসবার জন্য, কিন্তু কোনো জলসার নিমন্ত্রণে কিছুতেই যান না। তবু কনফারেন্সগুলোতে অনেক আমোদ আছে, কিন্তু ঘরোয়া জলসাগুলোতে তো কেবল দাঁতমুখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে চোয়াল ব্যথা করা। খেয়ে-দেয়ে আর কর্ম নেই নাকি তাঁর?

কিন্তু সোমেশ্বর যখন বললো, 'আপনিও কিন্তু যাবেন।' স্মিতহাস্যে ঘাড় হেলিয়ে মুহূর্তে রাজি হলেন ননীবালা, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। গানের ব্যাপারে নিমন্ত্রণ না-করলেও আমি না-গিয়ে থাকতে পারি না।'

মানসী মুখ তুলে তাকিয়েছিলো, ননীবালা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'গান আমার নেশা। কে-কে গাইবে?'

'সবাই। কলকাতার খ্যাতনামা গাইয়েরা তো নিশ্চয়ই, আর কনফারেন্সে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরও প্রায় সবাইকেই পেয়েছি। আমি

ভাবছি—' মনের কথাটা বললো সোমেশ্বর, 'ডালরুটির সঙ্গে মাছভাতের একটা ঠোক্কর লাগুক। একই ঠাটের গান পাশাপাশি দু-জন গাইবে, একজন বাঙালি একজন অবাঙালি। দেখবো, এক বাংলা দেশ থেকেই যত টাকা এরা প্রত্যেক বছর লুটে নিয়ে যায়, সত্যিই তার যোগ্য কিনা। আমার তো মনে হয় এই যে এতো নাম আসমানী বাইয়ের, তার চেয়ে এঁরা—' এখানে সোমেশ্বর মানসীর দিকে একবার তাকালো, 'কিছুমাত্র কম যান না। বরং আমি বলবো এঁদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওদেরই কোনো তুলনা হয় না। গাঁজা-খাওয়া ফাটা গলা—এই পাখির স্বর পাবে কোথায়।'

ননীবালা খুশি হলেন। ন্যাকামি ক'রে বললেন, 'আমার মেয়ের গান তাহ'লে আপনার শোনবার অযোগ্য নয়।'

'তাহ'লে কি আর খুঁজে-খুঁজে আলাপ করতে আসি?'

'আপনাদের প্রশংসার মূল্য তো জানি। গানের জগতের মানুষ আপনারা—' এইখানে থামলেন, শুনেছিলেন কোথাকার রাজারা যেন দারুণ গানের ভক্ত, ঠিক এরাই কিনা মনে করতে পারলেন না। সোমেশ্বরই তাঁকে রক্ষা করলো সেই সংশয় থেকে, 'তা বলতে পারেন। এ আমাদের রক্তের ধারা, পুরুষানুক্রমে আমরা গানের ভক্ত। এখন আর কিছুই হয় না, বছরে এক-আধবার এক-আধটা জলসা মাত্র, তা নৈলে আমাদের বাগচি-লজ-এর গোলঘর তো বারোমাস ওস্তাদেই ঠাসা থাকতো।'

বিজ্ঞের মতো ননীবালা মাথা নাড়লেন—'তা আর জানি না।' এখানেও মানসী মা-র মুখে চোখ তুলেছিলো।

সোমেশ্বরের চোখে অতীতের ছায়া ভাসলো। অর্ধমনস্ক হ'য়ে বললো, 'প্রায় ছ' ফুট গভীর ক'রে, বারো ফুট চওড়া গোল একটা পরিখা কেটে চারদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছিলো সেই গোলঘরের। ইটালি থেকে মার্বেল

আনিয়ে তীর বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, পাশে-পাশে গোলাপের ঝাড়। একটা লোহার ঝোলানো ব্রিজের উপর দিয়ে সেই পরিখা ডিঙিয়ে গোল-ঘরে যেতেন কর্তাবাবুরা, নিচতলাটাতে বিশাল একটা হল, ঠিক মাঝখানে একহাত উঁচু প্রশস্ত বেদী, সেখানে ওস্তাদরা বসতেন তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, আর শ্রোতারা নিচে গোল হ'য়ে ঘিরে বসতেন যাঁর যাঁর আসনে। উপরতলার গোল বারান্দা ঘিরে খান বারো ঘর ছিলো, সেটা একান্ত-ভাবেই সেই গাইয়ে বাজিয়েদের বাসস্থান।' সোমেশ্বর সুপ্রিয়ার দিকে তাকালো, 'তোমাকে তো দেখালাম সেদিন, কী হ'য়ে প'ড়ে আছে দেখলে তো। ঐ পরিখায় এক সময়ে কী সুন্দর টলটলে জল ছিলো, কত পদ্ম যে ফুটে থাকতো—'

চোখ বড়ো ক'রে, থুৎনি গলায় ঠেকিয়ে ঢং করলো সুপ্রিয়া— 'ভীষণ অন্যায়। এ-ভাবে একটা সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার কিন্তু আপনার নেই।'

সোমেশ্বর হাসলো। 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, ও-সব মেইনটেইন করবে কে ? জানো, এখনো বাড়ি পরিষ্কার রাখবার জন্য আমাকে পাঁচটা মালির মাইনে দিতে হয় ?'

ননীবালা হাঁ হ'য়ে শুনেছেন, ঢোঁক গিলে বললেন, 'গান-বাজনার ব্যাপারটা তাহ'লে সে-বাড়িতেই হবে ?'

'হ্যাঁ, ঐ গোলঘরেই। ওখানে প্রায় সাত-আট শো লোক বসতে পারে।'

'অ্যাতো বড়ো !'

বিনীত হাস্যে যুক্তকর হ'লো সোমেশ্বর। 'ও-রকম জলসাঘর একমাত্র রায়গড়ের রাজাদেরই আছে, মিসেস দত্তমল্লিক, অহংকার ক'রে বলছি না, আমার পিতামহদের শুধু শখই ছিলো না, রুচিবোধেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

এ-কথার পরে ননীবালা শুধু বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়েছিলেন সোমেশ্বরের মুখের দিকে। একটা সত্যিকার রাজপুত্রকে কিংবা রাজাকে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখছিলেন বোধহয়। তিনি কি আর কখনো কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেখেন নি? দেখেছেন বৈকি! জজ দেখেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট দেখেছেন, ব্যারিস্টার দেখেছেন, দেখেছেন কোটিপতি মারোয়াড়ি প্রয়োজক, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, আরো কত লোক দেখেছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ কোনো রাজা খেতাবধারী মানুষের সাক্ষাৎ তো আর পান নি। এমন পরিখা-ঘেরা গোলঘরের খবরও শোনেন নি। যে-বাড়ির কোনো একটা অংশে, কোনো একটা ঘরেই সাত-আট শো লোক বসতে পারে, সে-বাড়ির সমস্তটা যে কত বড়ো সেটাই মনে-মনে ধারণা করতে চেষ্টা করলেন তিনি।

একটু পরে বললেন, 'আপনি তো সে-বাড়িতেই থাকেন?'

সোমেশ্বর হাসলো, 'তা থাকতেই হয়, কিন্তু শিগগিরই ছাড়ছি।'

'কেন?'

'ও-সব পুরোনো জিনিস আঁকড়ে থাকা আমার পোষায় না। একলা মানুষ, দিব্যি আরামে একটা ভালো পাড়ায়, ভালো ফ্ল্যাটে থাকবো, অত্ত বড়ো বাড়ি দিয়ে আমার হবে কী? ও-বাড়ির ক'টা মহল জানেন? আমার ঠাকুমা বলেন ছেলেবেলায় আমি নাকি একবার আমাদের বাড়ির মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিলাম।' সোমেশ্বর হেসে উঠলো।

ননীবালা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, ইতস্তত ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে আমাদের এখানে আসবেন তো মাঝে মাঝে?'

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অনধিকার অনুরোধ। সোমেশ্বর এই প্রথম দিন এসেছে তাঁর বাড়িতে, বেড়াতেও আসে নি, প্রয়োজনেই এসেছে। যেমন আরো কত কেউ কত জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসে, এও তেমনি। সুপ্রিয়া পরিচিত ব'লে, সুপ্রিয়ার সঙ্গে এসেছে এইটুকু যা তফাৎ। এর মধ্যে

আবার আসবার মতো প্রশ্ন ওঠে কোথায় ? মানসী বিরক্ত হয়েছিলো। ননীবালা জানেন বিরক্ত তাঁর মেয়ে অনেকক্ষণ থেকেই হচ্ছিলো, কিন্তু এবার সেটা চরম হ'লো। হঠাৎ হারমনিয়মটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, আজ তাহ'লে—'

বিদায় দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোমেশ্বর, গা ঘেঁষে সুপ্রিয়াও উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ননীবালা ব'সে রইলেন, ব'সে-ব'সেই সনির্বন্ধ হলেন, 'দয়া ক'রে এসেছেন, শুধু মুখে যেতে দেবো না। একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মানসী, যা তো, একটু দেখে আয় তো চা-টা হ'লো কিনা।' লোকের সামনে মেয়েকে তিনি টুনি বলেন না।

সোমেশ্বর ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'না, না, ও-সব কিছু করতে যাবেন না, তাছাড়া এই অসময়ে—'

'অতিথি নারায়ণ—' মিষ্টি ক'রে হাসলেন ননীবালা, 'তার উপরে এমন অতিথি, এর কি কোনো অসময় থাকতে পারে ?' মেয়ের উদাস গম্ভীর মুখের উপর পলকপাত করলেন তিনি, তারপর নিজেই উঠলেন, 'আমিই দেখে আসছি, তুই ওদের কাছে বোস।' যেতে-যেতে ফিরে তাকালেন, 'সুপ্রিয়া, শোনো।'

'কী, মাসিমা ?' সুপ্রিয়া কৌতূহলী হ'য়ে কাছে যেতেই ননীবালা তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বাধ্য হ'য়ে বসলো সোমেশ্বর। বাধ্য হ'য়ে মানসীও আলাপে প্রবৃত্ত হ'লো। কিন্তু ননীবালার চালটা কি কেউ ধরতে পেরেছিলো সেদিন ? সুপ্রিয়াকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আজেবাজে কথায় আটকে রাখতে-রাখতে সোমেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয়ের কতখানি গভীরতা সে-খবরটা সংগ্রহ করতে-করতে তিনি যে মেয়ের কতখানি উপকার করছিলেন তা-ই কি বুঝেছিলো তাঁর বোকা মেয়েটা ? সিল্কের মস্ত রুমালটা ঘুরিয়ে হাওয়া

খেতে-খেতে আজ তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবলেন সে-সব কথা। তারপর নিজেকে তারিফ ক'রে হাসলেন আপন মনে।

ভাগ্য। ভাগ্য। সবই ভাগ্য। নৈলে মানসীর কী যোগ্যতা ছিলো সোমেশ্বরের স্ত্রী হবার? কী আছে তার? রূপ গুণ অর্থ বিত্ত শিক্ষা দীক্ষা সব দিকেই সে ছোটো। শুধু গান। গানের কি এতোই মোহিনী শক্তি? না, তা নয়। ভাগ্যও নয় শুধু। ভাগ্যের চাকা ধ'রে ঝুলে থাকবার অসীম ধৈর্যেরই এই উপহার। ভাগ্যকে গ্রহণ করবার শক্তি কি সকলেরই থাকে, না আছে? ননীবালা না-থাকলে এই ভাগ্য কি আজ মানসীকে ধরা দিতো? কখনোই না।

টুকটুক তুড়ি মেরে হাই তুলে গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট পথের আশায় উৎসুক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবানীপুরের কোনো এক সরু গলির মুখে এসে গাড়ি থামলো। ননীবালাই থামালেন। কানাই ঠাকুর থাকেন এখানে। বরেন-মামার বাড়িতে যখন ছিলেন, এই ঠাকুরই তাঁদের পুজো-আর্চা ক'রে দিয়ে আসতো। সেই থেকে ননীবালার সঙ্গে চেনা। ননীবালার কাজে-কর্মেও দু-একবার ডাক পড়েছে কানাই ঠাকুরের। বছরে দু'বার ঘটা ক'রে নারায়ণসেবা করেন তিনি, এখনো দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে তাঁর। অন্তত তাঁর নিজের তা-ই ধারণা। ঘোরালো প্যাঁচালো রাস্তা বেয়ে এক-তলার ছোট্ট দু'খানা ঘরে এই পুরুৎ মশায়ের আস্তানা। মাঝখানে উঠোন আছে একটি। সেখানে দাঁড়িয়েই ননীবালা হাঁকলেন, 'ঠাকুরমশায় কই গো?'

প্রথমে একটি বিধবা মেয়ে বেরিয়ে এলো, ননীবালা চেনেন তাকে। ঠাকুরমশায়ের মেয়ে, তারপর এলেন ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী, তারপর ঠাকুর-

মশায় নিজে। বোঝা গেলো বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। টিকিতে ফুলটি পর্যন্ত বাঁধা হ'য়ে গেছে। নামাবলিটি কাঁধে। ননীবালা একগাল হেসে বললেন, 'মেয়ের বিয়ে।'

'তাই নাকি? খুব ভালো, খুব ভালো। কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন?'

ননীবালার সবিস্তারে বলবারই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু সময় কম, তবু তারই মধ্যে যতটা পারেন ব'লে নিলেন।

ঠাকুরমশায় খুশি হলেন শুনে। আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'কবে?'

'কবে আবার, একেবারে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে যে। রাজা বাহাদুর আর একদিনও দেরি করতে চাইছেন না, কালকের তারিখেই সারতে হবে। লগ্ন তাড়াতাড়ি আছে। প্রায় গোধূলি লগ্নই বলা যায়। সকালে আটটার সময় রেজিস্ট্রি হবে, সন্ধ্যা সাতটার সময় বিয়ে। আপনি যা হয় ক'রে-ক'ম্মে দেবেন—'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কিন্তু চুক্তি করবেন, না নিজেই সব—'

'চুক্তি মানে?' ননীবালা অবাক না-হ'য়ে পারলেন না।

'চুক্তি মানে চুক্তি।' ননীবালার অজ্ঞানতায় ঠাকুরমশায়ও একটু অবাক হলেন। 'অর্থাৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা করবেন, না আমি করবো এই আর কি। যেমন শ্রাদ্ধ। আজকাল সবাই চুক্তিতে করে। তারপর ধরুন উপনয়ন, অন্নপ্রাশন— সব তো আমরা আজকাল চুক্তিতে নিই। বিয়েটাই এতোদিন ছিলো না, এখন সেটারও চলন হয়েছে।'

'ও।'

'একটা হিন্দু বিবাহের খুঁটিনাটি তো কম নয়। সব আমরা নিয়ে যাই। যেমন কুলো, পিঁড়ি, শাঁখ, সরা, গাছকৌটো, কোষাকুষি— দশকর্ম ভাণ্ডারের সমস্ত জিনিস আমরা ভাড়া ক'রে নিয়ে যাই, বিয়ে শেষ হওয়া মাত্র ফেরৎ দিয়ে দিই। চেলি পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি?'

'তা নৈলে অত সব করবেন কখন। একদিনে ঐ অণুকোটি চৌষট্টি আয়োজন সম্ভব? আপনি টাকা ধ'রে দিন, আমি কাল সন্ধ্যাবেলা সব সুদ্ধ গিয়ে হাজির হবো। বর-কনে যে বসবে তার নতুন পাটিটা পর্যন্ত নিয়ে যাবো। কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'তাহ'লে তো খুব ভালো হয়। আমি আরো ভাবছিলাম, এতো অল্প সময়ে কী করি। আপনাকে নিয়ে বাজার করবো ব'লেই এসেছিলাম। যা-যা লাগবে ফর্দ ক'রে দেবেন, কিনে দেবো। এ-ভার যদি আপনি নিজেই নেন তাহ'লে তো আমি বাঁচি। আর খরচও তো বোধহয় কম লাগবে?'

'লাগবে না! একটা জিনিস কেনা আর ভাড়া করা, তফাৎ আছে না? তাছাড়া সব তো একদিনের জন্য, কিনেও তো লাভ নেই কোনো।'

'তাই তো।'

'আপনার আদ্ধেক টাকা বেঁচে যাবে।'

'তাহ'লে চুক্তিতে কত লাগবে বলুন।'

'আসুন, ঘরে বসবেন আসুন, সব ব'লে দিই আপনাকে।'

ঘরে এসে বসলেন ননীবালা। পাঁচমিনিটের মধ্যে ঠিক হ'য়ে গেলো সব। আগাম টাকা দিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। ঠাকুরমশায় সঙ্গে এলেন, কাছেই কোথাও যাবেন তিনি, ননীবালা ঐটুকু রাস্তা দয়া ক'রে তাঁকে পৌছে দেবেন। অবিশ্যি আরো একটু উদ্দেশ্য আছে সঙ্গে আনবার। দু-জন ঠিকে ঠাকুর ঠিক করতে চান তিনি কালকের জন্য, ঠাকুরমশায় জানেন এ-সব খবর। তাদের আটঘাট তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু ঠাকুরমশায় সে-কথা শুনে বললেন, 'তার দরকার কী? তার চেয়ে হোটেলে অর্ডার দিন না।'

'সে কি হয় ?'

'কত লোক হবে আপনার ?'

'কত আর! কাকে বা চিনি এখানে। হ'তো যদি আমাদের গ্রামে দেখতেন পিলপিল ক'রে পাঁচশো লোক এসে হাজির হ'তো।'

'তার মানে পাঁচশো লোকও হবে না ?'

'না না, পাঁচশো কোথা থেকে হবে। দু'শো হ'লে ঢের।'

'ও, তাহ'লে তো কোনো অসুবিধেই নেই। আর তাছাড়া ও-সব বাঙালি ব্যাপার আপনি করবেনই বা কেন ? রাজাউজিরের সঙ্গে কাজ করছেন, হালেচালে সেই মর্যাদা রাখতে হবে তো। নিশ্চয়ই অনেক বড়ো-বড়ো লোকও আসবে, যারা সাহেবসুবোর মতো খানা খায়।'

'হ্যাঁ, তা অনেক আসবে।'

'তবে ? সেখানে কি তকমা-আঁটা বয়-বেয়ারা না-হ'লে মানায় ?'

'সে-রকম পাওয়া যায় ?'

'যায় না ? টাকার কাছে সব বিকোয়। বাঘের দুধ পাওয়া যায় আর ভাড়াটে বেয়ারা পাওয়া যায় না ?'

'তাহ'লে আমাকে তাই ঠিক ক'রে দিন।'

'বেশ।'

ঠাকুরমশায় ওস্তাদ লোক। মস্ত এক হোটেলে নিয়ে এলেন ননীবালাকে। বললেন, 'এবার বলুন কী কী আপনি চান।'

হোটেলের চারদিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন ননীবালা। ভালো-মন্দ খাবারের গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছে নাকের মধ্যে। কলকাতা বসবাসের এই কয়েক বছরের মধ্যে কম তো দেখলেন না, সোমেশ্বরের জলসার গান শুনতে গিয়ে তাদের গোলঘরও দেখে এসেছেন, হারিয়ে যাবার মতো তিনতলা তিনমহলা মার্বেল পাথরের বাড়ির আনাচ-কানাচও

ঘুরে দেখে এসেছেন। কত পার্টি দেখেছেন, সম্মিলনী দেখেছেন, বড়োলোকদের সাহেব-সাহেব খেলা দেখেছেন, কিন্তু এতো বড়ো হোটেলে কোনোদিন ঢোকেন নি। কানাই ঠাকুরের উপর রীতিমতো শ্রদ্ধা হ'লো তাঁর। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আজকে বিকেলে জন পঁচিশেক খাবে, তার জন্য—'

'বলুন, কী ব্যবস্থা করবো।' দোকানের ম্যানেজার বোধহয়, কাগজ পেনসিল নিয়ে অর্ডার নিতে এলো। একটু চুপ ক'রে থেকে ননীবালা বললেন, 'যা-যা বলবো সব দিতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'পরিবেশন করবার লোকও দিতে পারবেন ? বেশ পোশাক-টোশাক প'রে যাবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন তো ?'

'পারবো না ? এই তো আমাদের কাজ। আপনি কী করবেন ? স্ট্যাণ্ড-আপ সাপার ? না, একেবারে বসিয়ে ডিনার ?'

স্ট্যাণ্ড-আপ সাপার শব্দটা জানা ছিলো না ননীবালার, কিন্তু বসিয়ে ডিনারের অর্থটা বুঝলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'ঐ বসিয়ে ডিনারই খাওয়াবো।'

'ঠিক আছে। পঁচিশজন বসবার মতো চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা আছে তো ?'

'চেয়ার-টেবিল ?'

'চেয়ার-টেবিল না-হ'লে ডিনার হবে কী ক'রে ?'

'ও।'

'যদি মেঝেতে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে আমাদের লোক

পরিবেশন করতে যাবে না, চেয়ার-টেবিল হ'লে, আমরা তার উপযুক্ত সব ব্যবস্থাই ক'রে দিতে পারবো। জলের গ্লাশ, খাবার প্লেট, ন্যাপকিন, কাঁটা চামচে— এ-সবও তো চাই।'

'ও।'

'অবিশ্যি ভাববার কিছু নেই। চুক্তি দিলে আমরাই ক'রে দেবো সব। পাঁচটার সময় লোকজন গিয়ে টেবিল লাগিয়ে আসবে, কাঁটায়-কাঁটায় আটটার সময় ডিনার নিয়ে চ'লে যাবে বেয়ারারা, একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে সব নিয়ে চ'লে আসবে। দশটার মধ্যে সারা।'

'এও চুক্তিতে হয়?'

'হয় না? বাঃ। আজ দশ বচ্ছর আমরা করছি কী?'

ননীবালা চমৎকৃত হলেন। 'তবে কালকের ব্যাপারটাও চুক্তি ক'রে নিন।'

'কাল কী হবে বলুন। আর উপলক্ষ কী তা-ও বলুন।'

'আমার মেয়ের বিয়ে।'

'ও, বিয়ে! তাহ'লে তো একটু হাঙ্গামার ব্যাপার। খাবার ব্যবস্থা কোথায় হবে, ছাদে?'

'না, লনে।'

'লনে! বাঃ, তাহ'লে তো ভালোই। শামিয়ানা খাটবে?'

'না। অমনি খোলা থাকবে। বৃষ্টি-বাদলের দিন যখন নয়—'

'তাই তো। তাছাড়া লনে খোলা পার্টিই ভালো হয়। বেশ গ্রুপ ক'রে-ক'রে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে ফুলদানি রেখে— এই রকম চান তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম।'

'ঠিক আছে। কতজন লোক হবে?'

'ধরুন দেড়শো থেকে দু'শো—'

কর্মচারিটি মাথা নেড়ে খাতার উপর পেনসিল ঠুকতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'আর খাওয়ার লিস্ট কী হবে ?'

'কী হ'লে ভালো হয় বলুন তো ?'

'আপনি যদি ফুল ডিনার চান সে একরকম হবে, আর যদি অন্য সব বিয়ের মতো পোলাও, মাংস, মাছের কালিয়া, চপ, চাটনি এ-সব চান সে আর একরকম হবে। যেটা আপনার পছন্দ।'

উত্তর দিতে একটু চিন্তা করতে হ'লো ননীবালাকে। নিমন্ত্রিতদের কার কী রকম পছন্দ, কী রকম পদমর্যাদা এক লহমায় যেন সব ভেবে নিতে চেষ্টা ক'রে বললেন, 'এক কাজ করুন, দু-রকম ব্যবস্থাই দিন, আদ্ধেক-আদ্ধেক।'

'বেশ। আর আজকেরটা ?'

'আজ জন তিরিশেকের মতো মাংস পোলাওয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'বেশ।'

'কত খরচ হবে ?'

'তা কিছু বেশিই তো হবে। ডেকরেটরের ব্যবস্থাও তো আমাদেরই করতে হবে। আজকে এক প্রস্থ, আবার কালকে এক প্রস্থ। গেট সাজাতে হবে কি ? আলো ? আলোও তো লাগবে।'

'গেট সাজাবেন ? তাহ'লে তো খুব ভালো হয়। এ তো আর সাধারণের ব্যাপার নয়, রায়গড়ের রাজা আসছেন বিয়ে করতে, গেট তো সাজানোই উচিত।'

'নিশ্চয়ই।' কর্মচারিটি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লো। 'তাহ'লে আপনার কিছু বেশিই প'ড়ে যাবে।'

'তা পড়ুক। আমার এই একটিই মেয়ে, আর টাকারও আমার অভাব নেই—'

'তা তো ঠিকই। আচ্ছা আপনি বসুন, আমি হিসেব ক'ষে দিচ্ছি।'

বসলেন ননীবালা। এতো সহজে, এতো অল্প সময়ে, সম্পূর্ণ অন্যের ঘাড়ে ভার দিয়ে যে-কাজটি সমাধা হ'তে যাচ্ছে এটা ভেবে হালকা লাগলো খুব। মনে-মনে তিনিও হিসেব কষতে লাগলেন, খরচটা কতদুর গড়াতে পারে, আর তিনি কতদূর পর্যন্ত উঠতে পারেন। খাওয়া খরচটা সোমেশ্বর দিতে চেয়েছে ; অবিশ্যি সেটা চেয়েছিলো জন্মদিনের পার্টি হিসেবে, এখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিয়ের পার্টি। তা হোক, বলেছে যখন, তখন সে দেবেই, অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে, ননীবালাও তা নেবেন ; কাজেই সেখানে খানিকটা বাঁচোয়া। আর যা বাকি থাকবে, তা-ও নেহাৎ কমে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না, তা না হোক। রাজি হবেন ননীবালা। এমন সাজানোগুজোনো সুন্দর ব্যবস্থা তিনি কি কখনোই ক'রে উঠতে পারতেন? তিনি জানেন কী? জীবন ভোর তো কুশাসন কলাপাতাই দেখে এসেছেন। তার উপর লোকবল নেই, জিব বেরিয়ে যাবে না এতোখানি? আর এই কেমন ছিমছাম, ফিটফাট, পরিষ্কার। বাড়িতে রান্নার হাঙ্গামা নেই, লোক লাগিয়ে খাটাবার ঝকমারি নেই, সাজো গোজো আর ফোঁপরদালালি ক'রে বেড়াও। ব্যস্‌। খরচের বড়ো একটি অঙ্কের জন্য মনকে তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দর কষাকষি অবশ্য হ'লো অনেকক্ষণ। তবুও শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বেশ ভালো ব্যবস্থা ক'রেই হোটেল থেকে বেরুলেন ননীবালা। এর পরে শাড়ির দোকান আর গয়নার দোকান। শাড়ি অনেক আছে মানসীর, আর পাবেও নিশ্চয়ই অনেক। ঠাকুরমশায় তার নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে গেলে, মস্ত ব্যাগ থেকে একটা ফর্দ বার ক'রে তিনি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। বেনারসি একখানা, মুর্শিদাবাদ সিল্ক একখানা, একখানা

গোদাবরী কটকি, একখানা মান্দ্রাজি। মোট চারখানা শাড়ি। সেই সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজ পছন্দ ক'রে কেনাও তো দায়। মানসীর কোনো বন্ধু-বান্ধব, অল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে আনলে ভালো হ'তো। ওদিকে জামাইয়ের জন্য গরদের জোড়, পাঞ্জাবির মুগা, এ-সবও তো কিনতে হবে। তার উপরে সোনার জিনিসও আছে কিছু। একটা নেকলেস আর হাতের একজোড়া বালা। এ-দুটোই মানসীর নেই, নৈলে ধীরে-ধীরে গয়না তিনি প্রায় সবই গড়িয়ে রেখেছেন। সোমেশ্বরকে একটি দামি আংটি দিতে হবে। আর মিনে-করা সোনার বোতাম। তাই দিয়ে আশীর্বাদ করবেন আজ, পাঁচজনে দেখবে।

ননীবালা মার্কেটে এসে নামলেন।

কলকাতা শহর। সত্যি আজব দেশ। টাকা থাকলে সব আছে। তা নৈলে একটা বিয়ের ব্যবস্থা! সোজা? যার জন্য এক মাস ধ'রে কত মানুষের কত পরিশ্রম, কত খাটুনি, কত আয়োজন। সেই ছেলেবেলায় চপি-পিসির বিয়েতে লক্ষ্মীর মা-টা তো খাটতে-খাটতে ম'রেই গেলো। আর ননীবালা কিনা একখানা চার চাকার গাড়িতে ব'সে হাওয়া খেতে-খেতে দু-ঘণ্টাতেই সব সেরে ফেললেন? কী আশ্চর্য! পায়ের উপর পা রেখে নরম ক'রে নাচাতে লাগলেন তিনি।

বাড়ি-বাড়ি নেমে নিমন্ত্রণ করতে কিন্তু একটু কষ্ট হ'লো শেষে। বারে-বারে ওঠা আর নামা, মেপে-মেপে হাসা আর বলা, একটুখানি বসতেও হয় আবার। সবশেষে ফেরবার রাস্তায় কালিঘাটে বরেন-মামার বাড়িতেও নামলেন নিমন্ত্রণ করতে।

ততোক্ষণে বেলা ঢ'লে এসেছে, পড়ন্ত রোদের অসহ্য উত্তাপে গা ভিজে যাচ্ছে ঘামে। চিড়বিড় ক'রে উঠছে মাথার ভেতরটা। অথচ ফাল্গুন মাস।

এতো গরম হওয়া কি উচিত? কলকাতার সবই অদ্ভুত। রাধানগরে পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়, আর ফাগুনের শীত আগুনের গায়। এখানে মোষ বাঘ আগুন সব সমান। শীতই নেই মোটে। ভালো-ভালো গরম জামাগুলো বাক্সেই পচে। এই তো গেল-বছর কত দাম দিয়ে কী সুন্দর কাশ্মিরি শালখানা কিনলেন, নিয়মমতো শীত থাকলে আজ কি পারতেন না সেখানা পিঠে ফেলে বেরুতে? আর পৌষ মাঘ মাসেই বা কী? কতটুকু শীত নামে? ঐ বড়োদিনের সময়ে যা দু-চারদিন।

বরেন-মামার বাড়িতে নামবার আগে ড্রাইভারকে ব'লে অনেকবার হর্ন দেওয়ালেন ননীবালা, কিন্তু কেউ এসে দোতলার চিলতে বারান্দাটাতে দাঁড়ালো না, একটা বাড়ির একটা জানালাও এতোটুকু ফাঁক হ'লো না। আশা করেছিলেন কত মুখ কত দিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারবে, নতুন ঝকঝকে গাড়িটা দেখতে-দেখতে ভাববে, 'কে এলো, কে এলো?' বেয়ারাটা যখন তার রাজকীয় পোশাক নিয়ে নেমে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দেবে, চোখগুলো বড়ো-বড়ো ক'রে অপেক্ষা করবে গাড়ির আরোহীটিকে দেখবার জন্য। শাদা ধবধবে দুধ-গরদ প'রে তখন ধীরে-ধীরে নেমে আসবেন ননীবালা। কিন্তু হতাশ হলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে মনে-মনে বললেন, নিষ্কর্মা মেয়েমানুষগুলো ঘুমুচ্ছে এখনো।

সদর দরজা খোলাই ছিলো। তিনটে বেজে গেছে, ঠিকে-ঝিয়েরা এসে গেছে বাসন মাজতে। একতলার উঠোনে সরকারি কলতলাটা রমরম করছে তাদের কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠের আলাপে আর বাসনমাজার পটু হাতের ঘষঘষানিতে। পচা ভাত তরকারি, জল আর ছাইয়ের সমন্বয়ে একটা ভ্যাপসা বিশ্রী গন্ধ উঠছে জায়গাটাতে, চলাফেরার রাস্তাটা জলে

জলাকার। ননীবালা পাশ কাটিয়ে নাকে রুমাল চেপে কোনোরকমে উঠে গেলেন দোতলায়, কতকাল পরে এই ধরনের একটা বাড়িতে পা দিয়ে গা ঘিনঘিন করলো তাঁর। এ-বাড়ি ছেড়ে সেই যে তিনি মেয়েকে নিয়ে তেরো টাকার ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন তারপরে এই এলেন। যাবার আগে এঁদের সঙ্গে একটা খণ্ড প্রলয় ঘ'টে গিয়েছিলো। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতিত্বে এমনিতে আগুন হ'য়ে ছিলো সবাই, ঘর ভাড়া নিয়ে হঠাৎ এ-ভাবে উঠে যাবার চক্রান্তে সে-আগুন শতগুণ হ'য়ে জ্ব'লে উঠলো। ঝি নেই, চাকর নেই, বিনা নোটিশে এ-রকম চ'লে গেলেই হ'লো? আগুনটা অবিশ্যি মামীই উদ্গার করেছিলেন বেশি, কেননা অসুবিধেটা তাঁকেই ভোগ করতে হবে। আপিশের ভাত, স্কুলের ভাত, মসলা পেষা, মাছ কোটা, ছেলে রাখা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়া, ঘর মোছা, সবই তো এক-হাতে ঠেলতে হবে তাঁকে। মেয়ে দুটো তো সাজের লাঠি! কোনো কাজে এগুবে নাকি? গান করবে, বাজনা বাজাবে, ফুটুক-ফুটুক ছুটুক-ছুটুক এ-জানালায় ও-জানালায় দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করবে উল্টোদিকের রাইবাবুর ফাজিল ছেলেটার সঙ্গে— মাথায়-মাথায় দুটোকে ঠুকে দিলেও হুঁশ হবে না।

সেদিন ননীবালাও গ'র্জে উঠেছিলেন সমানে-সমানে। কেন? ভয় কিসের? আর কি তিনি এদের আশ্রয়ে থাকছেন? ভাসতে-ভাসতে কুটোটা ধরেছিলেন ব'লে নাকানি-চোবানি তো কম খাওয়ান নি এঁরা, অনেক সয়েছেন, অনেক মুখ বুজে থেকেছেন, কিন্তু আর না। আজ তিনি পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ তিনি জন্মের শোধ জবাব দিয়ে যাবেন, দুটো ভালো-মন্দ কথা খুব ভালো ক'রে শুনিয়ে দিয়ে যাবেন, জানিয়ে যাবেন বলতে-কইতে শুধু তাঁরাই পারেন না, বিধাতা তাঁকেও একখানা মুখ দিয়েছেন, আর সে-মুখের ধার বড়ো সহজ নয়। কোমরে কাপড় বেঁধে ডিঙি মেরে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি, 'কী,

কী বললে? আমরা ধড়িবাজ? আমার মেয়ের স্বভাব খারাপ! আর তোমরা? তোমরা কী? তোমাদের জানি না? তোমাদের চিনি না? মুখ তোমাদের খ'সে যাবে, পুড়ে যাবে, কুরুকুষ্ঠি হবে।' কুণ্ঠিত টুনি দুই হাতের সজোর আকর্ষণে মাকে টেনে নিতে-নিতে বলেছিলো, 'ছী, ছি, এ-সব তুমি কী বলছো মা? কী করছো?' মেয়েকে এক ঝটকায় উল্টে ফেলে দিয়ে ননীবালা আবার মামীর মুখের কাছে এসে দাঁড়ালেন। একবার যখন শুরু করেছেন, এখুনি সেটা সাঙ্গ করবেন তেমন পাত্রই নন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে কলহটি এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। বরেন-মামা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলেন, ছেলেমেয়েরাও খানিকক্ষণ পরে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, মামীও থমকালেন, কিন্তু ননীবালা থামলেন না। দুটি ঘণ্টার মধ্যে ছাতে, দেয়ালে, কলতলার আবর্জনার স্তূপে, রেলিঙে, কোথাও একটি কাক চিল বসতে পারলো না। অন্য ভাড়াটেরা ভিড় ক'রে মজা দেখতে লাগলো, আশে-পাশের বাড়ির বাসিন্দারা চকিত হ'লো। ছোটো ছেলেরা কাঁদতে লাগলো, তবু নিবৃত্তি নেই। ননীবালা গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের বউ, যতদিন বউ-কাল গেছে, গেছে, তারপরই তো স্বাধীন। চিরদিন প্রিয়নাথবাবুকে দাপটে রেখেছেন, অনেক যুঝে-বুঝে সংসার করেছেন, কারণে-অকারণে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে গলা লুটিয়ে ঝগড়া করেছেন, নিন্দে করেছেন, স্তুতি করেছেন— অনেক লড়াইয়ে জিতে এ-বিষয়ে রীতিমতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছেন তিনি। কলকাতা আসবার পরেই না-হয় অবস্থার বিপর্যয়ে ইঁদুর হ'য়ে গর্তে ঢুকেছিলেন, কিন্তু সেদিন, অতদিন পরে মুখ ছুটিয়ে বেশ ভালো রকম একটা জমজমাট কলহ করতে পেরে ভালোই লেগেছিলো, দম-বন্ধ-করা দুঃখের নৌকোয় খোলা বাতাসের পাল উঠেছিলো, মনটা হালকা হয়েছিলো। বরং শেষ পর্যন্ত সব চুপ হ'য়ে

যাওয়ায় হতাশই হলেন একটু। মনে-মনে ধিক্কার দিলেন। এই ? এইটুকু শক্তি নিয়ে এতো বিক্রম ?

পথে বেরিয়ে টুনি বলেছিলো, 'তুমি অন্যায় করেছো।'

'কেন, অন্যায় কেন ?' কথা শুনে গা জ্বালা করেছিলো ননীবালার, ঠাস ক'রে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করেছিলো মেয়ের গালে। অন্যদিকে তাকিয়ে টুনি বলেছিলো, 'হাজার হোক, ওঁরাই আমাদের দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাড়িয়ে দেন নি, শত্রুতা করেন নি, ব্যবহারও এমন কিছু—'

মেয়ের অস্ফুট গলার ধর্মকথা ননীবালা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রবল কণ্ঠের গর্জনে সমুদ্রের মধ্যে এক টুকরো নুড়ির মতো ডুবিয়ে দিয়ে বললেন, 'আহা রে আমার ভালো ব্যবহার, আমার সাতকালের দরদী বন্ধু, দিন-রাত বিনি পয়সার দাসী খাটিয়ে কী উপকারই না করেছেন! ছোটো-লোক। ইতর। দু-বেলা দুটো খেতে দিয়ে তো দুটো কুত্তা পুষেছে, তার আবার লম্বা চওড়া কথা। দেহে-গতরে খাটিয়ে-খাটিয়ে একেবারে ফোঁপরা ক'রে ছেড়েছে শয়তানের বাচ্চারা। তাঁদের সঙ্গে আবার ইয়ে। ন্যায় আর অন্যায়।'

একদণ্ডে টুনি ঠাণ্ডা।

সেই ঝগড়ার রেশ এখন অবিশ্যি মুছে গেছে। মনে রাখেন নি ননীবালা, বরদাত্রীর মতো প্রসন্ন হাস্যে সব তিনি ক্ষমা করেছেন। এমন কি লেকের ধারে জুতো পায়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একদিন বরেন-মামাকে দেখে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। খুশি মনেই কথা বলেছিলেন। প্রত্যেকটি কথার ফাঁকে-ফাঁকে বরেন-মামার মুখের পেশীতে যে-সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোড়ন উঠতে দেখেছিলেন তাতে প্রায় চেঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো তাঁর।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে ঘরের সামনে ননীবালা থমকে দাঁড়ালেন। মামীমা মাদুরে গড়াচ্ছিলেন, কচি বাচ্চাগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমুচ্ছে মায়ের সঙ্গে, ছোট্টো ঘরটা যেন থিকথিক করছে মানুষের ছানায়। ননীবালা হাতের সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছলেন, পায়ের জুতোটা খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে পারলেন না।

চোখ খুলে হাঁ হ'য়ে গেলেন বরেন-মামী। ননীবালার সুসজ্জিত দেহ ঘিরে অনেকক্ষণ ধ'রে থেমে রইলো তাঁর বিস্মিত চোখ, তারপর অসংবৃত আঁচলে গা মাথা ঢেকে ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে বললেন, 'ও মা, ভাগ্নি নাকি? আমি তো চিনতেই পারি নি। এসো, এসো। বোসো। মামীকে তবে মনে পড়লো এতোদিনে?' সম্ভ্রম আর খুশি ফুটে উঠলো সেই অভ্যর্থনার স্বরে; হাত দিয়ে নোংরা বালিশটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, একটা বাচ্চাকে সরিয়ে তিনি বসবার জায়গা ক'রে দিলেন ভাগ্নিকে।

ননীবালা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মুখে নরম হাসি ছড়ালেন, 'মনে পড়বে না কেন? তোমরা কি আমার পর? না কি কোনোদিন দেখেছি সেই চোখে?'

'না, তা তুমি সত্যি দ্যাখো নি।' সব ভুলে গ'লে গেলেন মামী।

'কই, ছুটকি ফুটকি কই?'

'ফুটকির তো বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, সে শ্বশুরবাড়ি।'

'ও মা, তাই নাকি? কেমন বিয়ে হ'লো? বর কী করে?'

'হ'লো একরকম মন্দ না। এখন তো ছুটকির জন্যই ভাবনা। তোমার মামা তো একেবারে হয়রান হ'য়ে গেলেন, জুটছে কই? আর জুটবেই বা কী বলো? টাকাকড়িরও জোর নেই, চেহারারও জৌলুস নেই।'

'গান-টান করছিলো তো—'

'আর গান— মাথা নেই তার মাথাব্যথা। তা তোমার খবর কী? বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ননীবালা সন্তর্পণে বসলেন ; কিন্তু বললেন, 'না, ভাই, আর বসবো না, বেলা গেছে।'

'এলেই তো বেলা ফুরিয়ে, বেলার আর দোষ কী বলো ? তোমার মামা আসুন, চা জলখাবার করি, তারপর তো যাওয়ার কথা—'

'ওরে বাবা, চায়ের কথা আর ভাবতেই পারছি না খালি পেটে—বাড়ি গিয়ে চান ক'রে যা হোক কিছু দাঁতে কেটে একটু বসতে পারলে এখন বাঁচি।'

'সে কি ! এই অবেলায়, এখনো নাও নি খাও নি নাকি ?'

'সময় আর পেলাম কই, একলা মানুষ, সব দিক তো সামলাতে হচ্ছে।'

'এতো ব্যস্ততা কিসের ? আর কোথাও গিয়েছিলে ?'

'সারাদিনই তো ঘুরছি, কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ— অবিশ্যি চাকর-বাকরের অভাব নেই, কিন্তু তাই ব'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ তো আর আমি লোক পাঠিয়ে করতে পারি না। তাছাড়া কতদিন দেখি না—'

'নিমন্ত্রণ ! কিসের নিমন্ত্রণ ?'

'টুনির বিয়ে।'

'টুনির বিয়ে ? তাই বলো। খুব ভালো কথা। খুব সুখের কথা। কী মেয়েই তুমি পেটে ধরেছিলে ভাগ্নি। একেবারে রত্নগর্ভা। কত নাম, কত যশ, টাকাকড়িও নিশ্চয়ই যথেষ্ট রোজগার করে ?' মামীর একেবারে কৃতার্থ গলা।

ননীবালা চোখ টান করলেন, 'তা তো একটু করেই। এই ধরো না গিয়ে মাসে বাড়িভাড়াটাই তো দি তিনশো টাকা (পঞ্চাশ টাকা বাড়ালেন), তারপর ধরো গিয়ে ঝি-চাকর মিলে জনা চারেক খাটে (একজন বাড়ালেন), তাদের মাইনেও কি সোজা নাকি ? চার জনেই ওরা সত্তর টাকা (আসলে চল্লিশ) টানে। তার উপরে ধরো গিয়ে

আলোটা পাখাটা, পার্টি সম্মেলন, জন্মদিনের উপহার, পজিসন মতো পোশাক-আশাক— তা থাক গে সে-সব। কাল রাত্তিরে তোমরা সবাই যাবে। খাবে-দাবে বিয়ে দেখবে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে আর কি। মামাকে বোলো। নিমন্ত্রণ-চিঠিটা আনতে আবার ভুলে গেছি, সে না-হয় কাল পাঠানো যাবে, কিন্তু নিজে ব'লে গেলাম, মনে থাকে যেন।'

'নিশ্চয়ই থাকবে। তুমি যে মেয়ের বিয়েতে ভোলো নি, তাতে আমি কত খুশি হলাম—'

'খুশি আর কী, এ তো আমার কর্তব্য।'

'সেই কর্তব্যই বা ক'জন মনে রাখে বলো? তা বিয়ে কোথায় ঠিক হ'লো?'

ননীবালা হাসলেন, 'রায়গড়ের রাজবাড়িতে। ঐ যে গো, শ্যামবাজারে মস্ত গম্বুজওলা বাড়ি, সবাই তো চেনে, বাগচি-লজ। অত বড়ো বাড়ি ঐ তল্লাটে আর নেই। থাকবে কী, রাজরাজড়ার কাণ্ডই অন্য রকম। তাদের সঙ্গে আর কে পাল্লা দেবে বলো।'

'রাজা!' মামী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

'একদিন গিয়েছিলাম বাড়িটার ভেতরে, বাব্বা, কী বিশাল। রাজবাড়িই বটে। আমার তো রীতিমতো ইয়ে লাগছিলো। মহলের পর মহল পার হ'য়ে যখন একেবারে অন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম, বলবো কি তোমাকে, হাঁটতে-হাঁটতে আমার ঘাম ছুটে গেছে। অত বড়ো বাড়ি কি একদিনে দেখে ওঠা যায়? হাতিশাল, ঘোড়াশাল, পক্ষীশালা, রন্ধনশালা, অতিথিশালা, জাদুঘর— কত যে আছে বাড়িটার মধ্যে— তারপর গিয়ে তোমার জলসাঘর, পরিখা, বাগান, ফোয়ারা—'

বরেন-মামীর গলায় কফ আটকালো, দু-বার কেসে নিয়ে বললেন, 'সেই বাড়িতে বিয়ে?'

পাশের ঘর থেকে ফট ক'রে তাঁর মেজো মেয়ে বেরিয়ে এলো, 'আপনি "বাগচি-লজ"-এর কথা বলছেন ? সোমেশ্বর বাগচিদের আদিবাড়ি ?'

'ঐ ছ্যাখো, মেয়ে তোমার সব জানে। ও মা, কত বড়ো হয়েছিস রে মাথায় ? চিনিস নাকি সোমেশ্বরকে ?' ননীবালা হেসে খুন।

ভুরু কুঁচকে এতোখানি ঘাড় নাড়লো ছুটকি, 'হ্যাঁ-অ্যা। আমাদের স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে এসেছিলেন যে। প্রাইজ দিলেন।' তার চোখে-মুখে দস্তুরমতো শ্রদ্ধা ফুটলো, 'ঠিক নেকড়ে বাঘের মতো একটা মস্ত কুকুর আছে, ওঁর সঙ্গে গাড়ি চ'ড়ে বেড়ায়। এখন তো উনি কুইনস পার্কে থাকেন, লাল টকটকে চেহারা। ওঁদের মহারাজা খেতাব, জানেন ?'

'আর না-জেনে কী করি বল ? কুটুম্ব হচ্ছে যখন।'

'ওদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে এ-পাড়ায়, তাদেরও অনেককে আমি চিনি। আমার সঙ্গেই তো ছুটি মেয়ে পড়ে, তারপর এই সামনের হরিশবাবুর বড়ো ছেলেও ওদের জ্ঞাতিভাই—'

'ঐ জ্ঞাতি ফ্যাতি দিয়ে কী হবে,' ঠোঁট বাঁকালেন ননীবালা, 'ঐ সোমেশ্বরই তো আমার জামাই হচ্ছে। না বাপু, উঠি এবার, গাড়িটা আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে—'

'সোমেশ্বর! সোমেশ্বর বাগচি!'

'তাই তোমার বোনঝির মন ওঠে না। হাতে পায়ে ধ'রে কত সাধ্য-সাধনায় তবে না সোমেশ্বর মন পেয়েছে মেয়ের।'

'সোমেশ্বর বাগচির সঙ্গে টুনির বিয়ে হচ্ছে ?'

'কী বলবো, নিজের মেয়ে, লজ্জাও করে, টুনি হেঁটে গেলে সোমেশ্বর বুক পেতে দেয়, মুখভার হ'লে ছুনিয়া অন্ধকার দেখে, ঐ মেয়ের জন্য সে জলে ঝাঁপ দিতে পারে, আগুনে পুড়তে পারে, এমন ভালোবাসা দেখি নি কোনোদিন, আর আমার মেয়ের কিনা মন ওঠে না।'

বরেন-মামী এ-সব নাম-ধাম কিছুই জানতেন না, তবুও ব্যাপারটা যে কিছু সহজ নয় সেটা বুঝলেন। কেমন অর্থহীনভাবে একবার মেয়ের দিকে আর একবার ননীবালার দিকে তাকাতে লাগলেন। অনেক পরে বললেন, 'তাহ'লে মেয়ে তোমার রানী হচ্ছে ?'

ননীবালা শরীরের মেদে, শাড়ির ভাঁজে তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়ালেন, জুতোটা পায়ে ঢুকোতে-ঢুকোতে বললেন, 'তা হচ্ছে।' এক পা এগিয়ে দরজা ধ'রে, 'তাহ'লে কাল তোমরা যেয়ো !'

মামীও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে, অস্ফুটে কী বললেন শোনা গেলো না। ননীবালা ছুটকির দিকে তাকালেন, 'যাস রে। মাসি মানুষ, বোনঝির বিয়েতে গিয়ে খাবি-দাবি, আমোদ-আহ্লাদ, সর্দারি এ-সব করবি তবে তো ? শোনো মামী, বিয়ে কিন্তু একেবারে সন্ধ্যার লগ্নেই, দেরি কোরো না যেতে। ঐ ছাখো ভুলে গেলাম। চল তো ফুটকি, এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আসবি গাড়ি থেকে।'

হাতের মুঠো আলগা হ'য়ে গেছে ননীবালার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মা-মেয়ের মুখের দিকে তিনি পলকপাত করলেন। মেয়েটি নড়লো না। শিথিল গলায় বললো, 'মিষ্টি দিয়ে কী হবে ?'

মামীমা ঝংকার দিলেন, 'আহা, এতো বড়ো দিদি বলছে, মেয়ের যেন একটা মান্যমাননা নেই।' ব'লে নিজেই নামতে লাগলেন ননীবালার পিছে-পিছে।

নিচে নেমে এসে গাড়ির দরজাটা সবখানি খুলে ধরলেন ননীবালা, আকণ্ঠ জিনিসপত্রে ঠাসা। মিষ্টির হাঁড়িগুলো সামনেই ছিলো, তবু তিনি এটা হাৎড়ালেন, ওটা হাৎড়ালেন, বেনারসির বাক্সটা অযথা ফেলে দিলেন হাতের ঠেলায়, তারপর ঠিক আছে কিনা, নোংরা লাগলো কিনা দেখবার জন্য বাক্সটা খুলে একশো দশ টাকা দামের শাড়িটা মামীর

চোখের সামনে নাড়াচাড়া করলেন। এ-পাশে স'রে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'বাহাদুর সিং।'

'জী।' ড্রাইভারের পাশে ব'সে থাকা পোশাক-আঁটা নেপালি বয় ত্রস্তে ছুটে এলো কাছে, এসে সেলাম করলো।

ননীবালা সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে আদেশ দিলেন, 'একঠো মিঠাইকা হাড্ডি বাহার কর দাও তো।'

নেপালি বয় পরিষ্কার বাংলা শিখেছে। ননীবালা জানেন সে-কথা। হিন্দি বলতে যে তিনি পটু নন সে-কথাও জানেন। আর এও জানেন বাড়িতে তিনি বাহাদুরের সঙ্গে বাংলায়ই কথা বলবেন। কিন্তু তাই ব'লে লোকের সামনে তো চাকর-বাকরের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বলতে পারেন না। আড়চোখে মামীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করলো।

এবার ননীবালা মিষ্টি হেসে গাড়িতে উঠে বসলেন। 'তাহ'লে যাই, মামী ?'

মামী মিষ্টির হাঁড়িটা বুকে চেপে ধ'রে শুধু ঘাড় নাড়লেন। আর গাড়ি ছেড়ে দেবার পরও যে তিনি অনেকক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, পিছনের কাচ দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে সে-দৃশ্যও দেখলেন ননীবালা। গভীর তৃপ্তিতে শরীরটা যেন অবশ হ'য়ে এলো।

বাড়ি এসে প্রথমেই মেয়ের ঘরে উঁকি দিলেন। চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিছানায়, বুঝতে পারলেন না জেগে আছে, না ঘুমুচ্ছে। এক-বার ডাকলেন, সাড়া পেলেন না। ইচ্ছে ছিলো জিনিসগুলো দেখান। হ'লো না। বাড়িটা নিঝুম। যদিও উচিত নয়, চারটে প্রায় বাজে, আজ শুয়ে-ব'সে কাটাবার দিন নয়। কত লোক আসবে, তার জন্য

প্রস্তুতি আছে। ঘর-বাড়ি গুছোনোই কি একটা সহজ কথা নাকি? সোমেশ্বরকে আসতে বলেছেন সাতটার সময়ে। সাতটা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আশীর্বাদের সময়। অতিথিরা আসবেন আরো খানিক পরে। রাত্তিরের নিমন্ত্রণ তাঁদের। আর হোটেলের লোকেরা তো চেয়ার টেবিল সাজাতে এলো ব'লে। ভাগ্যিস সব ব্যবস্থা চুক্তিতে সেরে এসেছেন, নৈলে কী হ'তো ভাবতেই এখন ভয় করছে। অবিশ্যি এটা তিনি আগাগোড়াই ভেবেছিলেন যে মাংস আর চপ-কাটলেট কোনো রেস্তোরাঁ থেকেই কিনে আনবেন, এর আগেও একবার এনেছিলেন। টুনির এক ভক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। কিন্তু ভাত মাছ ডাল সব-কিছুর ভারই যে নিতে পারবে তারা তা ভাবেন নি। কী সুবিধেই না হ'লো। তা নৈলে এই সব অকম্মা ঝি-চাকর দিয়ে কিছু করতে হ'লেই হয়েছিলো আর কি। আর মেয়ের কথা না-হয় না-ই তুললেন। ভূতে ধরেছে আবার। এখন ভগবানের ইচ্ছায় কোনোরকমে বিয়েটা দিতে পারলে তিনি বাঁচেন।

ঝি দু-জনকে বকতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডাকবার আগেই বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে কাজে লেগে গেলো তারা। একজন ব্যস্ত হ'য়ে গ্যাস জ্বালিয়ে ননীবালার খাবার গরম করতে বসলো, একজন কাপড়চোপড় পাট করতে এলো। ছোকরা চাকরটাও ঘর ঝাঁট দিতে লেগে গেলো। ননীবালা চোখ দিয়ে পরখ করতে লাগলেন কোথায় কী ভাবে এতো লোকের বসবার এবং খাবার একটা সুব্যবস্থা করা যায়। ড্রয়িংরুমটা খুব বড়োই আছে, পাশে-পাশে সোফা কৌচগুলো ঠেলে সারা ঘর জুড়ে যদি দামি কার্পেট আর চাদর বিছিয়ে দেন, দেখাবেও সুন্দর, ভালো ক'রে বসতেও পারবে। আশীর্বাদও এ-ঘরেই হবে। আর খাওয়ার ব্যাপারটা ছাতে করলে কেমন হয়। সেখানে আলো-টালো সবই আছে। আজ ছাতে, কাল লনে, সেও একটা বেশ নতুনত্ব হবে। আবার এদিকে ঘর-বাড়ি ওলোটপালোট

হবে না, জিনিসপত্র টানাটানি হবে না। তাই ভালো। নিশ্চিন্ত হলেন মনে-মনে। এর পরে কয়েকটা ফোন করলেন তিনি, যাদের করলেন তারা সবাই (ননীবালার মতে) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ঈর্ষুক, আজকের এই সৌভাগ্যে তাদের বুক ব্যথা করবে, রাত্তিরে ঘুম হবে না।

এই সব সেরে স্নান ক'রে দুটি মুখে দিয়ে ডেক-চেয়ারটিতে বসলেন এসে। আজ আর ভালো ক'রে শোবার সময় কই ? কেবল মিনিট কয়েক শরীরটাকে একটু শিথিল করা, ছেড়ে দেওয়া। চারজন ঝি-চাকর বেয়ারা, আর একজন অধীনস্থ অবনত ভদ্রলোকের দুঃস্থ ছেলেকে (সোমেশ্বরের সেই ছেলেটি) ক্রমাগত একটার পর একটা ফরমাশে ব্যাকুল ক'রে রাখতে-রাখতে ভাবলেন : 'একটা দিন না-হয় না-ই ঘুমোলাম, না-ই বিশ্রাম করলাম। গাধাগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে না-চালালে এগুলো কি চলবে ? মাথা তো সব গোবরে ঠাসা।'

. . . . তিন

বেলা গড়ালো। রঙিন বিকেল আবির ছড়ালো চারদিকে। লেকের তীরে ধীরে-ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। সুন্দর সময়। দিন বড়ো হয়েছে আজকাল, দুপুর লম্বা হয়েছে। যাই-যাই ক'রেও সূর্য দেরি করে অস্ত যেতে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নিজের লাল আর গোল আর প্রকাণ্ড ছায়াটি দেখে জলের আয়নায়। তারপর কখন যেন টুপ ক'রে ডুবে যায়। মানসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-খোলা ঘরের মস্ত জানালা দিয়ে তার ম্যাজেণ্টা আভা অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে ঘরে। অন্য দিন সেই সময়ের মধ্যে মানসীর গা-হাত-পা ধোয়া সারা হ'য়ে যায়, সুগন্ধি সাবানের মৃদু সৌরভে ঘরের বাতাস আলোড়িত করতে-করতে সে চিরুনি চালায় লম্বা চুলে। গুনগুন

ক'রে সুরের আগুন ছড়ায়। সন্ধ্যাগুলো সুন্দর কাটে। যেন জলের স্রোতের মতো ব'য়ে যায় গান-বাজনা আর আলাপে উৎসবে।

কিন্তু আজ কী হ'লো তার? এমন শুভদিনে?

চুপচাপ সে ব'সে থাকলো জানালার তাকে ছবি হ'য়ে। সূর্যাস্ত দেখলো, দেখলো সন্ধ্যা আর রাত্রির সংগম। যখন অন্ধকার হ'য়ে গেলো তখনও নড়লো না। নড়বার কথা মনে হ'লো না তার। আর ওদিকে ননীবালা সব কাজকর্ম সেরে কাপড়-চোপড় বদলে প্রস্তুত হ'য়ে নিলেন অতিথিদের জন্য। এতোক্ষণ ছাতেই ছিলেন। মস্ত বাড়ির মস্ত ছাত, সুন্দর দেখাচ্ছিলো খোলা ছাতে খাবার টেবিল সাজিয়ে। লোকগুলোর পছন্দ আছে, মাঝে-মাঝে ফুলদানিতে ফুল রেখেছে আবার। রেখেছে প্লেট আর কাঁটা-চামচে। ননীবালা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা তাঁরই ব্যবস্থা, তাঁর বাড়িরই ঘটনা। ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌঁছতে-পৌঁছতেই সব ফিটফাট। তিনিও নেমে এলেন ছোকরা চাকরটাকে পাহারা বসিয়ে।

খাবার ঘরের পাশের চৌবাচ্চাওলা বাথরুমটাতে স্নান করেন তিনি। যদিও এই খানিক আগে স্নান করেছেন, তবুও আবার ঢুকলেন। হাতে-কলমে না-হয় কিছু না-ই করেছেন, তাই ব'লে পরিশ্রম তো কিছু কম হয় নি? কালিঝুলিও কম লাগে নি শরীরে। কোথায় কী করা হবে, কী সরানো হবে, কী সংযোগ হবে, কী ধরনে সাজালে সুন্দর হবে সবই তো তাঁকেই দেখিয়ে দিতে হয়েছে। সেই একটু ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন কখন, তারপর থেকেই তো পায়ের তলায় সর্ষে, ঘুরছেন তো ঘুরছেনই। এই আসছে ডেকরেটররা, এই আসছে হোটেলওলারা, এই আসছে ফুল, আসছে শুভেচ্ছা, ঝি ডাকছে, চাকর ডাকছে, বেয়ারা ডাকছে, একেবারে হন্তদন্ত। সাতটা বেজেছে, বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালা হয়েছে বসবার ঘরে, ঝকঝক করছে ঘরখানা। এখনো সোমেশ্বর এসে পৌঁছয় নি, এলো

ব'লে। তাই ননীবালা তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, সেজে নিলেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে মেয়ের কথা বেশি ভাববার সময় পান নি তিনি। চকিতে দু-একবার মনে হ'য়েই মিলিয়ে গেছে। এইবার পর্দা সরিয়ে ঘরের দরজায় এসে অন্ধকার দেখে থমকে দাঁড়ালেন। একবার মনে হ'লো বোধহয় স্নান করতে ঢুকেছে বাথরুমে, তাই ঘরের আলো নেবানো। পরমুহূর্তেই বুঝলেন তা নয়। বাথরুমে যাবার সময় ঘরের আলো নিবিয়ে যাবে এতো হিসেবি নয় তাঁর মেয়ে, তাছাড়া বাথরুমের দরজাটিও আধো-ভেজানো। অন্ধকার। জানালার লম্বা ছায়াটি আধো-অন্ধকারে ন'ড়ে উঠলো, সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত শক্ত থেকে আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠলো তাঁর। কঠিন গলায় ডাকলেন, 'টুনি।'

'অ্যাঁ!' চমকে মুখ ফেরালো মানসী।

'অন্ধকার কেন ঘর?'

'ও।'

'আলো জ্বালতেই মনে নেই দেখছি।' নিজেই এগিয়ে এসে দেয়ালে হাত বাড়ালেন। আলোকিত ঘরে মেয়ের বিস্রস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখনো চান করিস নি তুই? চুল বাঁধিস নি?'

'এই যাই।' কুণ্ঠিত মানসী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

'যাই মানে? এতোক্ষণ করলি কী তবে?'

'ব'সে ছিলাম।'

'ব'সে ছিলি?'

'যাচ্ছি স্নান করতে। দেরি হবে না।'

'তোর হয়েছে কী শুনি?'

'কী হবে!'

'তা আমার জানবার কথা নয়।'

আলনা থেকে তোয়ালে জামা টেনে নিলো মানসী।

'আমি কাল থেকেই লক্ষ্য করছি,' রোষে প্রায় ফুঁশতে-ফুঁশতে ননীবালা উচ্চারণ করলেন, 'আবার রোগে ধরেছে তোমাকে। কেন, হয়েছে কী জানতে পারি সেটা ?'

এবারও জবাব দিলো না মানসী। ননীবালা বললেন, 'বাড়িতে একটা কাজ, সারাদিনে একবার ঘর থেকে বেরুতে দেখলুম না, একবার নড়লি না, একগাছা কুটো নাড়লি না। বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার।'

মুখ তুললো মানসী, 'বাড়াবাড়ির কথা উঠছে কিসে? তুমি তো জানো, আমার শরীর ভালো না।'

'শরীর তোমার ঠিকই আছে, আসলে বলো মন ভালো না।'

'তা কী করবো।' মানসী বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, 'মন থাকলেই তার ভালো লাগা মন্দ লাগা থাকে।'

মেয়ের দিকে ননীবালা তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আমাদের আর মন নেই, মন কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন বিধাতা।'

'হয়তো।'

'তার মানে তুই বলতে চাস এ-সব ব্যাপারে তোর কোনো মন বা ইচ্ছে বা গরজ, কিছুই নেই। সবই আমার আয়োজন। সোমেশ্বরকে তুই নিজের মুখে কথা দিস নি ?'

'ও-সব কথা উঠছে কিসে ?'

'কিসে নয় ? বিয়ে করবি তুই, ঠিকও করেছিস তুই, আর এখন দোহাই দিচ্ছিস আমার।'

'তোমার ?'

'তাছাড়া আবার কী ? মনের কথা বুঝতে কি মুখের কথার দরকার হয় ?'

'তর্ক করতে ভালো লাগে না, মা।'

'তা কেন লাগবে? সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতেই তোমার ভালো লাগে। অলক্ষ্মীতে পেলে এই হয়। ভগবান যা দিয়েছেন, তা তোর সইবে কেন? রাধানগরের ভাঙা বাড়ি আর ছেঁড়া কাঁথা চাই যে। তারই যোগ্য তুই।'

মানসী বাথরুমের দরজা ধ'রে চুপ। অভ্যাসবিরুদ্ধভাবে অনেকক্ষণ প্রতিবাদ ক'রে সে ক্লান্ত।

ননীবালার গলা কর্কশ হ'য়ে উঠলো, 'খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, শেয়াল-কুকুরের মতো ঘুরঘুর করতিস দাওয়ায়-দাওয়ায়, আর মনে-মনে ভাবতিস কেউ এসে রাজা ক'রে দেবে বুঝি, একটা বিশ্বাসঘাতক, ছোটোলোকের জন্য সারাদিন গলা উঁচিয়ে থাকা---- '

'মা!'

'শোন টুনি,' ননীবালা দু-পা এগিয়ে এসে মুখের সামনে আঙুল নাড়লেন, 'সাপের ভঙ্গি যেমন বেদের অজানা নয়, তেমনি তুই কী ভাবছিস, কী মনে ক'রে মড়ার মতো সারাদিন নেতিয়ে আছিস ঘরের কোণে তা-ও আমি জানি। আমার চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না।'

মানসী নিঃসাড়।

'কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও জেনো, আজ যদি হঠাৎ কোথাও তাকে দেখতে পাও, তুমি দেখবে স্বপ্ন তোমার স্বপ্নই। তোমার সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিল নেই। রাধানগরের ঝাড়ে-জঙ্গলে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় যে ছিলো শেয়াল-রাজা, কলকাতার এই আড়াই শো টাকার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মানসী দত্তমল্লিকের দরজায় সে ছুঁচো।'

মানসী চুপ।

'আর এও জেনো, যদি কোনো কারণে আবার তোমাকে ফিরে

যেতে হয় সেই অবস্থায় একদণ্ডও টিঁকতে পারবে না তুমি। সেই মানুষ তোমার কল্পনায় যতই রঙিন ফানুস ওড়াক, বাস্তবে সে অসম্ভব।'

'মা, চুপ করো, চুপ করো!' মানসী হাতের ভাঁজে মুখ লুকোলো।

'চুপ করবো কেন? যা ঠিক তা আমি বলবোই। যা নেই, যা থাকতে পারে না, তা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে এই বানানো কান্না আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আজকের মতো একটা শুভদিনে—'

দুই হাতের সবল ঠেলায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে মানসী যেন মা-র কথার জবাবেই ঠাস ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো ছিটকিনিটা। তারপর দেয়াল ধ'রে ধুঁকতে লাগলো পরিশ্রমে। কপালটা ভ'রে গেলো বিন্দু-বিন্দু ঘামে।

কিন্তু দরজা বন্ধ করলেই কি আজ এই ভাবনা থেকে রেহাই পাবে মানসী? মা-র কথার তীক্ষ্ণ ফলাগুলো উপড়ে ফেলতে পারবে? যে-মাটির নির্যাস টেনে-টেনে চারাগাছ আকাশে মুখ তুলেছিলো, বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছিলো, সূর্যস্নানে অভিষিক্ত হ'য়ে দেহের মধ্যে প্রাণের স্পর্শে শিহরিত হ'য়ে চিনে নিয়েছিলো নিজেকে, সে-মাটি ছাড়িয়ে যে আজকের মহীরুহ অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে, সে-কথা কি মানসী নিজেই জানে না? জানে। মা না-ব'লে দিলেও জানে, একপলক যে-মানুষটিকে দেখে আজ তার মর্মমূল পর্যন্ত এমন ক'রে কেঁপে উঠেছে, সেটা তার অতীতেরই একটা অভ্যাস মাত্র। একটা চেনা গানের ভেসে-আসা সুরের যন্ত্রণা। আসলে সে যে একদিন ছিলো, যাকে ঘিরে টুনি নামে কোনো একটি অল্পবয়সী মেয়ের জীবন কোনো একদিন পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলো, যে-টুনি আজ বিখ্যাত মানসী দত্তমল্লিকের বুকের মধ্যে জ'মে পাথর হ'য়ে গেছে এ শুধু তারই একটা অসার মৃত স্মৃতি। তা নৈলে এতোদিন কোথায়

ছিলো সে-মানুষ? মানসী কবে তার কথা ভেবে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়েছে? শেষ কবে ভেবেছে তা পর্যন্ত মনে নেই। নিজের কত শত অপরিমিত আনন্দে, উৎসবে, প্রাচুর্যে একদিনও তো এই নির্মলকে মনে ক'রে একটা নিশ্বাস ফেলে নি। তবে?

তবে কেন বুকের মধ্যে এই আলোড়ন বিলোড়ন? পরিচ্ছন্ন মোজেইক-করা প্রশস্ত বাথরুমের ছোট্টো টুলটার উপর ব'সে প'ড়ে শ্রান্ত মানসী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো। ভাগ্যের শত্রুতায় যে অন্তরতম মানুষকে একদিন বাধ্য হ'য়েই তোমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো, প্রায় দশ বছরের অদর্শনে, জীবনের আশ্চর্য উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-মানুষ সত্যিই কি আজ তোমার হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়েছে? যার বিরহে তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গিয়েছিলো আজ কি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক ক'রে সত্যি নিবে গেছে সে-আগুন?

একটা কান্নার স্রোত গড়িয়ে গেলো গলা বেয়ে বুক বেয়ে আরো কোথায়। ছটফট ক'রে উঠলো সে, মনে পড়লো সেই বাইশ বছরের প্রথম সূর্যের মতো একমুঠো উত্তপ্ত আগুন, যার সঙ্গে আজকের দিনের ঐ রঙ-ধ'রে-ঝুলে-পড়া ক্ষণিক দেখা মানুষটির তামাটে অপরাহ্ণের সঙ্গে বুঝি বা আর কোনো সম্বন্ধ নেই। একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় দু-হাতে বুকটা সে চেপে ধরলো।

তবে থাক, থাক। এই প্রবঞ্চনা থাক। থাক এই ভালোবাসার প্রহসন। মৃত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার অন্তিম প্রয়াস। হে প্রিয়তম। অন্তরতম। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, দয়া করো। নিজের অজান্তেই মানসী উঠে দাঁড়িয়ে যেন জ্বলতে-জ্বলতে শীতল হবার আশায় ঝরনার তলায় পেতে দিলো দেহ।

. . . . চার

পার্টিটা সেদিন ভালোই জমলো। আলোতে, ফুলেতে, আনন্দে, সুগন্ধে, গ্রামোফোন রেকর্ডের সানাইতে, গাইয়েদের আধুনিক গানের বিহ্বল প্রেমেতে, একেবারে জমজমাট হ'য়ে উঠলো সব। মেনে নেবার ক্ষমতা মানসীর সহজাত। নিজের উদ্বেলিত হৃদয়কে পোষা কুকুরের মতো এক ধমকে সে ঠাণ্ডা ক'রে দিলো। ড্রয়িংরুমের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হ'য়েই সকলকে অভ্যর্থনা করলো সে, অন্যেরা যখন হাসলো সেও হাসলো, যখন সবাই ঠাট্টা করলো লজ্জা পেতেও দেরি হ'লো না তার, এমন কি সময় সুযোগ খুঁজে পিছনের বারান্দায় ডেকে এনে সোমেশ্বর যখন আদর করলো, তখনও আঙুলটুকু নাড়লো না।

সময় সুযোগ খুঁজে ননীবালা ও একবার দেখা করলেন ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে। আঁচলের কোণে চোখ মুছে বললেন, 'আমার সর্বস্ব আজ তোমার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, জানি না এর পরে কেমন ক'রে দিন কাটাবো। ওকে বিদায় দিয়ে কোন প্রাণে বেঁচে থাকবো।'

সোমেশ্বর বললো, 'বিদায় মানে? আপনি কি ওকে ছাড়া আলাদা থাকবেন নাকি? না কি আপনি চাইলেই আমরা তা দেবো?'

ননীবালা একটি করুণ হাসি ভাসিয়ে দিলেন মুখের উপর, 'বিয়ে দিলেই মেয়ে পর। তারপর যদি দয়া ক'রে মাকে তোমরা মনে রাখো, তবেই আমার অনেক।'

'ছী ছি, এ-রকম আপনি বলবেন না।' সোমেশ্বরের গলা রীতিমতো আবদেরে শোনালো।

ননীবালা ধীরে মাথা নেড়ে হাসলেন, 'না-বললেও, যা সত্য তা তো সত্যই?'

'আপনি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, কিংবা আপনার সঙ্গে আমরা। এই ফ্ল্যাট এ-মাসেই ছেড়ে দেবো। ওখানে আমার মস্ত বাড়ি—'

'তোমার বাড়ি আরো মস্ত হোক, তোমার ঐশ্বর্য আরো বাড়ুক—' প্রায় সমবয়সী প্রৌঢ় জামাইয়ের মাথায় তিনি হাত ছোঁয়ালেন, 'কিন্তু অমন কথা বোলো না। মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে গিয়ে যেন আমাকে আপদ হ'তে না হয়। আমাকে দয়া ক'রে আলাদা ব্যবস্থাই ক'রে দিয়ো।'

'বেশ তো।' সোমেশ্বর শরীর কাঁপিয়ে হাসলো, 'তা-ই যদি চান তা-ই হবে।'

'আচ্ছা, তোমার যে লেকের ধারে খানিকটা জমি আছে,' কথাটা যেন হঠাৎ মনে পড়লো ননীবালার, 'সেটার বিষয়ে কিছু ভেবেছো কি?'

'ভাবছি তো বাড়ি তুলবো একটা—'

'জমি তো বোধহয় বেশ খানিকটা—'

'বেশ আর কি।'

'তুমি আমাকে তা থেকেই খানিকটা জমি দাও বাবা, যেমন ক'রে হোক একটা কুড়ে তুলে নিয়ে না-হয় বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিই—'

'ঠিক আছে। তা নিয়ে আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আপনি যেমন আমাকে আশীর্বাদ করলেন আমারও তো তেমনি একটা প্রণামী আছে। যদি চান আমি একমাসের মধ্যেই আপনাকে বাড়ি তুলে দেবো।'

'না, না, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই—' সুখের আবেগে ননীবালার গলা বন্ধ হ'য়ে এলো, 'তোমার মতো এমন দেবতুল্য মানুষকে যে আমি জামাই ক'রে পেলাম এই তো আমার সব চেয়ে বড়ো ভাগ্য।' এবার সত্যি-সত্যিই চোখে জল এলো তাঁর।

শাশুড়ির সঙ্গে পাকা কথা ব'লে এ-ঘরে চ'লে এলো সোমেশ্বর। চোখে-চোখে মানসীকে খুঁজলো। আজ আর একদণ্ড তাকে কাছে না-পেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এতো ভিড়ে নিভৃত হবার আশা কই? এতো দিন দূরে-দূরে ছিলো, বরং সে-ই ছিলো ভালো। একরকম নিষ্পত্তি ছিলো মনের সঙ্গে। কিন্তু বাঘের রক্তের আস্বাদ পাওয়ার মতো মানসীর নরম স্নিগ্ধ দেহের এতোটুকু স্পর্শেই আর আজ মন মানছে না সোমেশ্বরের। শুধু আজ নয়, কালকে রাত পর্যন্তও এই সুদীর্ঘ অপেক্ষা। কিন্তু তারপর। ভাবতেই শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো সোমেশ্বরের।

তারপর এই মেয়ে তার হাতের মুঠোয়। এই মেয়ের এই দেহ তারই, একমাত্র তারই অধিকারভুক্ত। প্রণয়িনীর ভূমিকায় মানসী এ-পর্যন্ত তাকে যত শুচিবায়ু দেখিয়েছে স্ত্রীর ভূমিকায় স্বামীর বলাৎকারের কাছে তার একটা জবাবদিহি আছে বৈকি। আর সেটাই তো পুরুষের যোগ্য। তা-ছাড়া অনর্গল দৈহিক বাসনার চরিতার্থতা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কিসেই বা সম্ভব?

বেয়াল্লিশ বছর বয়সের সোমেশ্বর অন্যমনস্ক হ'য়ে ব'সে-ব'সে আজ এ-সব কথাই ভাবলো। না-ভেবে পারলো না। যেদিন এক মেয়েতে আবদ্ধ থেকে নিজেকে খাঁচার চিড়িয়া বানিয়ে দিতে তার আপত্তির সীমা ছিলো না, আজ আর সেদিন নেই। স্বেচ্ছাচারিতার ঘোড়ায় চ'ড়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়িয়ে দম ফুরিয়ে এখন ঘরের কথা মনে পড়েছে। এখন শুধু শরীরের একরকম চাহিদাই নয়, তার আরো অনেক প্রয়োজনের কথা টের পেয়েছে সোমেশ্বর। সেবা চাই, সঙ্গ চাই, গৃহস্থালি চাই। আর এই ঠাণ্ডা শীতল চন্দনের মতো পবিত্র মেয়েটিই তো একমাত্র মেয়ে, যে তার জীবনে কেবল সুদূর হ'য়ে থেকেই তাকে এমনি প্রবলভাবে আকর্ষণ

করতে পারলো, পাখির মতো গলা গানের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে তাকে পাগল ক'রে দিলো।

আড্ডা ভাঙতে-ভাঙতে মন্দ রাত হ'লো না। সুন্দর হাওয়া দিলো বাইরে, ফুটফুটে চাঁদ উঠলো আকাশে, অতিথিদের বিদায় দিতে নিচে নেমে এলো মানসী, আর ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ননীবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এলেন সব তুলে-টুলে রাখতে, নিরাসারা করতে। আজকের গোলমালে অনেকক্ষণ ভাঁড়ারের চাবি খোলা ছিলো, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে-সবের মধ্যেও উঁকি মারলেন হুঁশিয়ার হ'য়ে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন ঠিকই আছে, না খোয়া গেছে কিছু। ঝি-চাকরদের তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেন না। টুনি আবার বলে, 'তুমি এ-রকম করো কেন ওদের সঙ্গে ?' মেয়ের ঢং দেখে শরীর জ্বলে তখন। ভারি ইয়ে হয়েছেন। বড়োমানুষি! বলতেই বলে 'ঢাকে আছাড়, কোদালকে খিল, বাঁদিকে লাথি, আর গোলামকে কিল।'

এদের সব সময় হাতে রাখতে হয় কেবল ব'কে মেরে। নইলেই লাইকুত্তার পাতে ভোজন।

ঝি-চাকরদের খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও এই জন্যে তিনি ঢিলে নন। তবু তো তেমন শাসনে রাখতে পারেন না মেয়ের যন্ত্রণায়। সমানে মাছ দিতে হবে তাদের, দামি-দামি তরকারির খোসাগুলো ফেলে দেবে তবু ঝিয়েদের জন্য একটা আলাদা তরকারি হ'তে দেবে না। সকালে বিকেলে আবার জলখাবারের ঘটা কত। এইজন্যেই তো দিন-দিন এগুলো নিষ্কর্মা হ'য়ে যাচ্ছে। এর শোধ তোলবার সুযোগ অবিশ্যি প্রায়ই জুটে যায় তাঁর। মাসের মধ্যে অনেক দিনই মানসী বাড়িতে খায় না।

নানা জায়গায় পার্টি থাকে, জলসা থাকে, সান্ধ্য নিমন্ত্রণ বা ডিনার

থাকে। সে-সব দিন ননীবালা ডাল আর রুটি ছাড়া তৃণটুকুও দেন না। যদিও তাঁর নিজের জন্য মাছ ছাড়া আর সব-কিছুরই ব্যবস্থা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না, বয়েস হয়েছে, ভালো খাওয়া-দাওয়া না-করলে শরীরই বা টি ঁকবে কেন? খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের খান চোদ্দ লুচির সঙ্গে রাত্তিরে তিনি বেগুনভাজা, আলুভাজা, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, একবাটি ক্ষীর, মিষ্টি এই সব খান। আর টম্যাটো তাঁর রোজই চাই। তাতে নাকি ভিটামিন আছে। (কলকাতা এসে কত ইংরিজিই শিখলেন তিনি!) যখন পা ভেঙে গিয়েছিলো তখন বলেছিলো ডাক্তার। যথেষ্ট ভিটামিন দিতে হবে শরীরকে। মাছ, মাংস যদি নেহাৎ না-ই খান তবে এদিকে দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি, আর ওদিকে তরকারির মধ্যে আলু, গাজর, বীট, বীন, স্কোয়াশ এ-সবের স্যুপ। টম্যাটোটা যথেষ্ট পরিমাণে। স্যুপ তো খাবেনই,— শরবৎ ক'রেও গ্লাশ দুই খাবেন চিনি দিয়ে।

কী করেন ননীবালা! সেই থেকে এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে ঐ স্যুপটি তাঁর একবাটি এক চুমুকে চাই-ই চাই। টম্যাটোর শরবৎটাও রেখেছেন। তাতে শরীরটা সত্যি ঠাণ্ডা থাকে। আর রংটাও পরিষ্কার হয়।

রাধানগরে থাকতে এ-সবের নামও জানতেন না। কী জঘন্য দেশ রে বাবা।

ঝি দুটো ভারি মুখে গনগন ক'রে রুটি খায় মটরের ডাল দিয়ে আর বলে, 'এমন খাবার দিলে বাপু থাকবো না আমরা।'

'থাকবি না তো যা না কোন চুলোয় যাবি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?' পরিপাটি ক'রে খেয়ে উঠে আঁচাতে-আঁচাতে তিনি ভাবেন।

তা কি যাবে নাকি? এমন হাবা মনিব কি রোজ-রোজ জুটবে? বড়ো একটা কনট্র্যাক্ট হ'লো কি অমনি বকশিশ। নিজে কিছু কিনলো কি

অমনি ওদের। পুজোর সময় শাড়ি চাই, দোলের সময় ব্লাউজ চাই, বায়না কত। আর ঢং‌ও জানে মাগি ছুটো। 'দিদিমণি! দিদিমণি!' একেবারে মিছরির পানা।

আজ কিন্তু ঝিয়েদের কিছু বললেন না। বরং গলায় মধু ঢাললেন, 'নে বাপু, ভালো ক'রে খা। পান্তুয়া আর-একটা নিতেই হবে। না-খেলে খাটবি কেমন ক'রে শুনি?' ঝপাঝপ খাবার জিনিস তিনি পাতে ফেলে দিলেন। গাল ভ'রে হেসে বললেন, 'আরো কত খাবি, কত পাবি। রাজবাড়িতে যাচ্ছে দিদিমণি, তোরাই কি কম সম্মান পাবি? হাজার হোক রানীর ঘরের খাস দাসী তো? জামাই আমার সাধারণ মানুষের মতো কাপড়-জামা প'রে আসেন ব'লেই ভাবিস না আমাদের মতোই একজন। বুঝলি? তা নয়। সোনা-দানায় বাড়ি ঠাসা, আজ একটা হাজার টাকা দামের হীরের আংটি দিয়েছে, আবার কাল সকালেই তো একলক্ষ টাকার হীরের কণ্ঠি দিয়ে পাকা আশীর্বাদ করতে আসবে বাড়ির দেওয়ান। সোনার পোশাক পর্যন্ত আছে এদের। আর মাথায় যখন মুকুট পরবে দেখবি।

বাড়তি খাবার মীটসেফে তুলে রাখতে-রাখতে উল্লসিত হ'য়ে জামাইয়ের অগাধ ঐশ্বর্যের কাহিনী তিনি উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন নন্দর মা আর নবলক্ষ্মীর কাছে। ছোকরাটাও ঘুমে ঢুলে বড়ো-বড়ো গরসে ভাত মুখে তুলতে-তুলতে চোখ বড়ো ক'রে শুনলো।

যাবার মুখে সোমেশ্বর বললো, 'বাই দি ওয়ে, একটা কথা, আমি আজ ফোন করেছিলাম ট্রান্সপোর্টকে, মানে ট্রান্সপোর্ট আপিশে।'

'ট্রান্সপোর্ট আপিশে?' অবাক হ'লো মানসী।

'ঐ তোমার কালকের ব্যাপারটা। সেই কণ্ডাক্টর।'

'কে ?'

'আরে তোমার জন্য যে-লোকটা কাল বাস থেকে ঝুলে প'ড়ে প্রায় আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলো।'

'কণ্ডাক্টর !'

'ছ্যাখো নি ? সেই দোতলায় টিকিট নেওয়া থেকেই তো আরম্ভ। ইডিয়ট। দিলাম একটা কমপ্লেইণ্ট ক'রে।'

'কণ্ডাক্টর ?'

'খোদকর্তাকেই পেলাম ফোনে, যা-তা বললাম। এমন ইতর লোক-জন সব, আর সরকারও তো তেমনি, তুমি কি ভেবেছো কোনো স্টেপ নেবে ?'

মানসী চুপ।

'এজন্যেই আমি মেয়েদের বাসে-ট্রামে চড়ার এতো বিরোধী। আচ্ছা, আজ তবে বিদায়, মণি।'

সোমেশ্বর গাড়িতে উঠলো।

মানসী দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হ'য়ে। কে যেন তাকে গেঁথে দিলো মাটির সঙ্গে।

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো কিচিরমিচির ডাক ছেড়ে। চাঁদ দেখলে এমন ওরা যায় লেকের জলে ছায়া ফেলে-ফেলে, তার মানে রাত বেড়েছে।

দোতলার ফ্ল্যাটের আলোটি বন্ধ হ'লো টিপ ক'রে। একটা ছোটো বাচ্চা কেঁদে উঠলো অন্য ফ্ল্যাটে। একটা গোরু তখন থেকে জাবর কাটছিলো আপন মনে, এবার ধীরে-ধীরে কোথায় হেঁটে গেলো। বড়ো রাস্তা থেকে ছোট্টো একটি কোলাহল উঠেই আবার নিবে গেলো, একটা

প্রাইভেট গাড়ি তীর বেগে ছুটে গেলো লেকের দিকে, ভেতর থেকে কোরাস গানের ক্ষণিক স্বর। চাঁদনি রাতের ফুর্তি।

নির্জন রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ তুলে ওদের দেখলো মানসী। শিরশিরে ঠাণ্ডায় শাড়ির আঁচলটা কাঁপলো। মিষ্টি একটা চেনা গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। কিসের গন্ধ। কী ফুল? মাত্র কয়েকটি বড়ো-বড়ো বাড়ি বুকে নিয়ে এ-পাড়ায় মাঠ-ঘাটের অন্ত নেই। নিজে-নিজেই কত বুনো ফুল ফুটে থাকে যেখানে-সেখানে। কী সুন্দর লতা গাছ বড়ো-বড়ো গাছের দেহ জড়িয়ে বেড়ে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে জোনাকি জ্বলে। ভারি ভালো লাগে মানসীর। তখন সে পিছন ফিরে তাকায় জোনাক-জ্বলা আরো কোনো ভুলে-যাওয়া রাত্রির দিকে। ভুলে-যাওয়া? না, ভুলে-থাকা? ভুলে কি যাওয়া যায়? কেউ কি ভোলে? ভুলতে পারে? ভোলা কি এতোই সহজ? শুধু ভুলে থাকে। ভুলতেই হয় ব'লে ভুলে থাকে। না-ভুললে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই ভুলতেই হয়। ঠিক এমনিই দুধশাদা চাঁদের রাতে এমনি বাতাসে-ভেসে-আসা গন্ধভরা মাধবীলতার ঝোপে দাঁড়িয়ে গাঢ় ঘন নিবিড় গলার ছোট্টো একটি ডাক, 'টুনি। আমার টুনি পাখি।'

টুনি! টুনিপাখি!

হঠাৎ ছটফট ক'রে উঠলো মানসী। ভুলি নি, ভুলি নি, আমি তো ভুলি নি! ভুলতে আমি পারি না। জ্বরের ঘোরে প্রলাপরত রোগীর মতো অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়তে-নাড়তে সে বিড়বিড় করলো। তারপর অদ্ভুত একটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগলো মোহের মতো।

. . . . পাঁচ

কলকাতা শহরের সেই প্রথম একমাত্র নীল দোতলা বাস্, ঘড়ি ধ'রে যার আসা-যাওয়া, যে-বাস্ চল্লিশ মিনিটে বালিগঞ্জ-শ্যামবাজার করে, যে-বাসে চড়বার জন্য সারা শহর চঞ্চল, যে-বাসে ক'রে কাল রাত দশটায় মানসী সোমেশ্বরের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলো, সেই বাস্ এখন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে শেষ ট্রিপ সেরে ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। রাস্তা জনবিরল হ'য়ে এসেছে, যতদূর চোখ চলে প্রায় ফাঁকা, এতোক্ষণে গাড়ির চালক একটু অসাবধান হ'তে পেরেছে, মনের মতো বেগ দিতে পেরেছে এঞ্জিনে। সারাদিনের কলকাতার সঙ্গে এই রাত এগারোটার কলকাতার কোনো মিল নেই। একটা দুরন্ত দানব যেন সারা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড ক'রে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে দারুণ দাপাদাপির শেষে হঠাৎ শ্রান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। নীলাম্বরী শাড়ির আঁচল বিছিয়ে স্নিগ্ধ রাতের শান্তি নেমেছে শহরে। যাত্রীবিরল বাসের অন্তরে নির্মল আর তার সঙ্গী, দু-জন কর্মচারীই এখন আলস্যে ক্লান্ত। সঙ্গীটি একটু অবসর পেয়ে বসেছে গিয়ে সামনের দিকে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে। হয়তো বা তন্দ্রা এসেছে তার। সারা বাস্‌টাই ঝিমুচ্ছে ঘুমের ঘোরে। নির্মলও আর পারছে না, পা ধ'রে এসেছে, গা এলিয়ে রডের উপরেই ছেড়ে রেখেছে নিজেকে। কেউ উঠছে না, কেউ নামছে না, দুরন্ত বেগে চক্ষের পলকে রাস্তা-ঘাট সব পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হঠাৎ একটা আর্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠে থেমে গেলো সামনের স্টপ ছাড়িয়ে, কে যেন ছুটতে-ছুটতে, পড়তে-পড়তে প্রাণপণ বেগে এগিয়ে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাসের মধ্যে। মুহূর্তে চকিত হ'য়ে পড়ন্ত মানুষটিকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলো নির্মল, তারপরেই থমকে নিজেকে নিয়ে আড়াল হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো এক কোণে। আর তারই ক্লান্ত, অবনত, ব্যর্থতার ভারে নিপীড়িত কম্পিত বুকের তলা

দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলো মানসী।

সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে মনে-মনে উচ্চারণ করলো নির্মল। যে-ভদ্রলোক আজ সকালে তাদের নামে নালিশ করেছেন ট্রান্সপোর্ট আপিশে। যাঁর সুন্দরী সুবেশী স্ত্রীর দিকে কাল রাত দশটা-সতেরো মিনিটে সে বা তার সঙ্গী, অর্থাৎ যে-দু'জন সেই সময়ে ডিউটিতে ছিলো, তাদের মধ্যে কোনো-একজন অসভ্যের মতো তাকিয়েছিলো লোলুপ দৃষ্টিতে। আচরণে যাদের শোভনতার একান্ত অভাব ছিলো, যে-দুটো ইতর এবং ছোটোলোকের বাচ্চা এবং কণ্ডাক্টর নামক নিকৃষ্ট জীব এই ধরনের বেয়াদবি করতে সাহস পেয়েছিলো, সরকারের উচিত, সে-দুটোকে অবিলম্বে ডেকে এনে চাবুক মারা, এবং কাজ থেকে বরখাস্ত করা। ফোন ক'রে এই সব কথা বলেছেন এই ভদ্রমহিলার স্বামীটি। কিন্তু যাঁর কাছে নালিশ এসেছে সেই মানুষটি খোদ-কর্তা হ'লেও মানুষই। বয়স হয়েছে, বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখে অভ্যস্ত। এই নালিশকে ততো গুরুত্ব দেন নি, একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামীর প্রলাপ মনে ক'রে তাদের ডেকে একটু ধমকেই ছেড়ে দিয়েছেন। ভদ্র বলতে হবে বৈকি। আপিশের জরুরি ডাকে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে এই শাসনটুকু হজম করতে-করতে তার সঙ্গীটির কী মনে হচ্ছিলো জানে না নির্মল। তার নিজের মনটা শূন্য ছিলো। যন্ত্রণারও তো একটা সীমা আছে, যার পরে যন্ত্রণাও আর যন্ত্রণা দিতে পারে না। নির্মল তখন তাকিয়ে-তাকিয়ে বাগানের ফুলগুলো দেখছিলো, দেখছিলো সকালবেলাকার প্রথম রোদ, রোদে কাঁপা প্রজাপতির রঙিন পাখা। মনটা কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো কে জানে। শরীরটাও হালকা থেকে আরো হালকা হ'য়ে তুলোর আঁশের

মতো ভাসতে লাগলো বাতাসে, যার কোনো স্থিতি নেই, বেগ নেই, চাপ নেই, পতনও নেই। ভালোই হ'লো। মনস্থির করা সহজ হ'লো। এই কলকাতার মোহ মিটলো তার। তা নৈলে শুধু কি কণ্ডাক্টর হ'য়েই ক্ষান্ত দিতো সে? এই চাকরি গেলে, এ-দেশের ফুটপাত কামড়ে প'ড়ে থাকতো, শেষ পর্যন্ত আশার ছলনা তাকে কোন কুহকের দেশে টেনে নিয়ে যেতো কে জানে। পদত্যাগপত্রখানা আজকের মতো এমন সতেজ বিনয়ের সঙ্গে পেশ ক'রে আসা কোনোদিনই সম্ভব হ'তো না। এতো বছর সে এতো গৌরবের সঙ্গে কাজ ক'রে এসেছে সৈন্যবিভাগে, কলকাতা ছাড়তে পারলে এর চেয়ে ভালো কাজ এর চেয়ে অনেক আগেই তার জুটতো। সে যায় নি, যেতে পারে নি। এতোদিনে সত্যিই মুক্তি পেলো, ছুটি পেলো। ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ ভদ্রলোকটিকে, এই ভদ্রমহিলার ভদ্রলোক স্বামীটিকে।

শরীরটাকে সোজা ক'রে সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবলো নির্মল। আর ভাবতে-ভাবতে শিথিল পায়ে কখন এক সময়ে ধীরে-ধীরে উঠে এলো দোতলায়। টিকিট নিতে হবে যে। নেওয়া তার কর্তব্য। যতক্ষণ সে বহাল আছে এই চাকরিতে ততোক্ষণ সে অবিশ্বাসী হ'তে পারে না। কেন হবে? কার জন্য হবে? ঐ ভদ্রমহিলা তার কে? কিসের কুণ্ঠা, কিসের লজ্জা? কেন এই অভিমান? এই ভীরুতা? ছি! এক ধমকে নিজেকে এনে সে ঠিক অচেনা মানুষের মতোই নিঃশব্দে দাঁড় করালো মানসীর পিছনে। আত্মসংযম করতে সময় লাগলো একটু, তারপর সহজ গলাতেই বললো, 'টিকিট।'

মানসী সামনের দিকে তাকিয়েছিলো, চমকে মুখ ফেরালো। আর সেই মুখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস নিতে পারলো না নির্মল। এতোক্ষণ ধ'রে জড়ো-করা সকল শক্তি তার মুহূর্তে ভেসে গেলো। ঢোঁক গিলে চোখ নামিয়ে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে আধখানা ঘুরে দাঁড়িয়ে

নিজের অজান্তেই কখন একখানা হাত উঠে এলো নিজের না-কামানো দাড়ি-ভরা গালে, খাকির প্যান্টটা এই চাকরিতে এসে এই প্রথম বড়ো বেশি নোংরা মনে হ'লো। গায়ের বুশশার্টটা আরো অকথ্য। সহসা একটা অদ্ভুত আত্মগ্লানিতে মনটা ভ'রে উঠলো। লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করলো। বিধাতার নিষ্ঠুরতায় অবাক হবার সুযোগ সে অনেকবার পেয়েছে জীবনে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার যেন কোনো তুলনা পেলো না।

মানসীর আকাশের মতো নীল নতুন-কেনা দামি ফরাসী সিল্কের কোমল শাড়ি বাতাসের ছোঁয়ায় ততোক্ষণে ঢেউ তুললো একটি, বাসি বকুলের মতো একটা অস্পষ্ট শিথিল সুগন্ধ এখানে-ওখানে মাকড়সার জালের মতো ভাসতে লাগলো হাওয়ায়, হাতের পাঁচভরি সোনার নতুন গড়ানো মোটা বালাটার আশ্চর্য পালিশ থেকে সূর্যের জ্যোতি ঠিকরোলো, সযত্নে প্রসাধিত গালের একটা পাশ কানের টুকটুকে লাল প্রবালে রঙিন দেখালো। পিঠের উপর এলিয়ে-পড়া কালো খোঁপা, খোঁপার উপর ছড়ানো-ছিটোনো রুপোর তারাফুল, ব্রোকেডের ব্লাউজে আঁটো পিঠের রুপোলি রং, ঠিক মাঝখানে লম্বা হ'য়ে বেয়ে নেমে-আসা পাথরের মালার কুচকুচে কালো সিল্কের ফিতে, সব মিলিয়ে কোনো কিছুর সঙ্গেই আর নিজেকে একাত্ম বোধ করতে লজ্জা পেলো নির্মল। কেবল হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে-তাকানো আর ঈষৎ তুলে-ধরা মুখের ভঙ্গিটিতে পলকের জন্য রাধানগরের টুনিকে মনে প'ড়ে মোচড় দিয়ে উঠলো বুকটা।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মানসীও নামিয়ে নিলো মুখ। কপাল থেকে উড়ে-পড়া ছোটো-ছোটো চুলগুলো সাপটে সরিয়ে দিলো পিছনের দিকে। নিজের কিউটেক্স মাখা আঙুলের দিকে তাকিয়ে হাতখানা টেনে নিলো আঁচলের তলায়। হাঁটু বুক বেয়ে পেঁচিয়ে-ওঠা আকাশ-নীল

শাড়ির সাচ্চা রুপোলি বর্ডার যেন একটু উগ্র হ'য়ে চোখে পড়লো। শস্তা ময়লা বুশশার্টের আড়ালে নির্মলের দৃঢ় দীর্ঘ সুঠাম দেহ, অনিদ্রাক্লান্ত বড়ো-বড়ো চোখের গাঢ় দৃষ্টি, না-কামানো পুরুষ-গালের কর্কশ লাবণ্য, সব-কিছুই তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করলো সেই মুহূর্তে। তবে কি সকালবেলাকার প্রথম সূর্যের চাইতে মধ্যাহ্নসূর্যের জ্যোতির প্রখরতাও কিছু কম আকর্ষণযোগ্য নয়? না কি বাইশ বছরের টলোমলো তারুণ্যের কাছে উত্তরতিরিশের স্থির যৌবনই অনেক বেশি মনোরম? বুকের ভেতরটা মানসীর কতকাল পরে আবার তেমনি জোরে-জোরে কেঁপে উঠলো ছেলেবেলাকার মতো।

মনকে কিন্তু প্রশ্রয় দিলো না নির্মল। তার পৌরুষ তাকে ধিক্কার দিলো। কাল সারারাত সে যার জন্য একবিন্দু ঘুমোতে পারে নি, আজ সারা সকাল যার জন্য অপমানের বৃশ্চিকদংশনে সে জ্বলেছে, সারাদিন যার কথা ভাবতে-ভাবতে একটা মূর্ছার মতো কেটে গেছে সময়, এখন এই মুহূর্তে যার দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে নিজেকে সে অসম্মানিত হ'তে দিচ্ছে, বলতে গেলে সারাটা জীবনই সে যার জন্য জ্বললো, পুড়লো, ক্ষয় হ'লো, দেরাদূনের অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসে ঘুরে বেড়ালো কলকাতার পথে-পথে, পকেটের পয়সা ফুরিয়ে গেলে সামান্য ম্যাট্রিক পাশের যোগ্যতা নিয়ে আর-কোনো কাজ না-পেয়ে বিনা দ্বিধায় এই কাজ নিয়ে আজ এইখানে এসে পৌঁছলো, তার জন্য কিসের বেদনা? কিসের অভিমান? তাছাড়া অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সুসজ্জিত, সুশ্রী স্ত্রীর কাছে এই অবস্থায় তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার মতো লজ্জা আর আছে নাকি কিছু? এই আটদশ বছরের যুদ্ধের চাকরিতে সে অনেক দেখেছে, শুনেছে, সয়েছে। মন নিয়ে যেমন জ্বলেছে, তেমনি প্রাণ নিয়েও বিধাতা কম খেলা খেলেন নি।

বেশ তো। যুদ্ধের অবসানে এই তার শেষ খেলা হোক। শেষ শক্তির পরিচয়। নিজের দুর্বল হৃদয়কে প্রায় চাবুক মেরে স্থির করলো নির্মল। এই ঠাণ্ডায়ও বিন্দু-বিন্দু ঘামে তার কপাল ছেয়ে গেলো, বুক-পিঠ ভিজে উঠলো, অসহ্য ময়লা রুমালটা পকেট থেকে বের ক'রে ঘাড় গলা মুছে, দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললো, 'আপনার টিকিট?'

টিকিট। টিকিট কেন? মানসী তো পয়সা নিয়ে আসে নি। এখানে যে আসবে তা কি সে জানতো? তবে কখন এলো? কেমন ক'রে এলো? কী ভাবতে-ভাবতে এমন শূন্য হাতে চ'লে এলো সে? কই, কিছুই তো মনে করতে পারছে না। এই তো সে দাঁড়িয়ে ছিলো কম্পাউণ্ডের ফটকে, দু-পাশে বেল-কামিনীর ঝাড়। অতিথিদের বিদায় দিতে নেমে এসেছিলো। প্রথমে বিদায় নিলেন 'নবীনার নিয়তি'র বিখ্যাত ডিরেক্টার অনন্তমাধব বটব্যাল। কালো রং, টানা চোখ, বাঁকা ঠোঁটে হাসেন। তাঁর সঙ্গে ফুল্লরা সেন গিয়ে ঢুকলো গাড়ির অন্ধকারে, 'প্লী-ই-ই-জ, মিঃ বটব্যাল', গ'লে গেলো সারা শরীরে, 'চলুন না লেকটা চক্কর দি একবার।' তারপর সেই নতুন ছবিটার প্রডিউসার বদ্রিপ্রসাদ আগরওয়ালা, তারপর সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি আর তার মস্ত হাউণ্ড, আর সব শেষে সোমেশ্বর। তার ভাবী স্বামী, যার সঙ্গে এই কয়েক মুহূর্ত আগে সে সকলের সামনে এনগেজ্‌ড্‌ হয়েছে, যে তাকে একটা মস্ত মার্বেলের গুলির মতো মস্ত হীরের দুর্মূল্য আংটি পরিয়ে দিয়েছে আঙুলে, যে-হীরের দিকে তাকিয়ে ননীবালা আর চোখ ফেরাতে পারেন নি, যে-হীরে এখন শাড়ির তলায় ঢেকে রাখা সত্ত্বেও লাল নীল সবুজ বেগনি আলোর ঝিলিক তুলছে প্রত্যেক মুহূর্তে। তারপর? তারপর কী?

বাসের চারদিকে তাকালো সে। অত বড়ো বিশাল দোতলার গহ্বরে অতগুলো আসনের মধ্যে একলা আরোহী নিজেকে দেখতে পেয়ে অবাক

হ'য়ে গেলো। একটু দূরে একটা অনমনীয় নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সোজা দাঁড়িয়ে আছে নির্মল। তার কঠিন চেহারায় এমন একটি রেখা ফুটে নেই, যাতে ভুলক্রমেও মনে হ'তে পারে মানসীকে সে চিনতে পেরেছে। মানসী উতলা বোধ করলো, তার পলকপাত দ্রুত হ'লো, নিশ্বাস ঘন হ'লো। আরক্ত হ'য়ে বললো, 'টিকিট ? কিন্তু আমি— আমি তো পয়সা আনি নি।'

নির্মলের দৃষ্টি জানালার বাইরে। পলকের জন্য চোখটা ফেরালো কি ফেরালো না। অস্ফুটে বললো, 'তবে ?'

তবে? তাই তো, তবে কী ? মানসীর ব্যাকুল দৃষ্টি স্থির হ'লো নির্মলের মুখের উপর। নির্বিকার নির্মল শরীরটাকে এক পায়ের ভর থেকে আরেক পায়ে দাঁড় করালো, মাথার উড়ন্ত চুলগুলোকে আঙুল ডুবিয়ে ঠেলে দিলো পিছন দিকে, নিরাসক্ত গলায় বললো, 'বেঁধে দেবো ?'

ভাগ্যের পরিহাসে হাসি পেলো মানসীর। উপযুক্ত জবাব বটে। নির্মল আজ টুনিকে পয়সার অভাবে নামিয়ে দিচ্ছে বাস্ থেকে। শেষ পাওনাটা এতোদিন বাকি ছিলো তাহ'লে ? নির্মলের তূণে এমন একটি কঠিন বাণ এখনো অবশিষ্ট ছিলো মানসীর জন্য ? হাতের মুঠো শক্ত ক'রে স্তব্ধ থেকে নিজেকে সামলে নিলো সে। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'তাছাড়া উপায় কী ?'

'এখানেই বাঁধবো ?' নামতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো নির্মল।

'গন্তব্যে পৌঁছনো যখন সম্ভব নয়,' ছাব্বিশ বছরের পোড়-খাওয়া ক্লতবিগ্য মানসী কঠিন হ'য়ে উঠেছে সেই সময়টুকুর মধ্যে, 'তখন যেখানেই হোক ক্ষতি কী ?'

'কদ্দূর যাবেন ?'

'সেটা অবিশ্যি নির্দিষ্ট নেই। যা-ই হোক, এই ভুলের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

'ভুলচুক সকলেরই হয়।'

'হয়। কিন্তু এমন মারাত্মক ভুল হবে সেটা ভাবি নি।'

'ভুল মাত্রই মারাত্মক। যে করে সেই ভোগে।'

'চারটে পয়সা পাঠিয়ে দেবো আপনাদের সরকারের দপ্তরে। ভুল করতে পারি, ঠকাতে তো পারিনে।'

'সে কী কথা ? আপনি কখনো ঠকাতে পারেন ?'

থমকালো মানসী। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তাহ'লে আর টিকিট চাইছেন কেন ?'

'সরকারের নিয়ম।'

'শুধু সরকারের নিয়ম ব'লেই ?'

'আজ্ঞে আমরা তো ভৃত্য মাত্র।'

'কার বলুন তো।'

'সরকারের তো বটেই। আপনাদেরও।'

'আমাদেরও ?'

'যাত্রীর মনোরঞ্জন করাও আমাদের কাজের একটা অঙ্গ।'

'তাই জন্যেই বুঝি রাত এগারোটার এই অনিশ্চিত রাস্তায় একজন বিপন্ন মেয়েকে এ-রকম ক'রে পথে নামিয়ে দিচ্ছেন ?'

'বিপন্ন ?'

'নিশ্চয়ই!' গলায় জোর দিলো মানসী, 'সঙ্গে পয়সা নেই, সঙ্গী নেই—'

নির্মল সনির্বন্ধ হ'লো।— 'ক্ষমা করবেন, এই চাকরিতে বিপদভঞ্জনের নির্দেশ নেই কোনো।'

'চাকরিতে না থাক, মনে তো আছে ?'

'সে-বালাই আমরা চুকিয়ে দিয়েই এ-সব কাজে আসি।'

'বিবেক ?'

'আমি একজন সামান্য বাস্‌-কণ্ডাক্টর, আর আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা-যাত্রী, আপনার সঙ্গে আমার বিবেকের সম্বন্ধ কী ?'

'তাহ'লে মনুষ্যত্ব ? সেটা তো থাকা উচিত ?'

'আমরা আবার মানুষ !' দুই চোখে অজস্র বিদ্রূপ নিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ালো নির্মল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ডিউটিতে আছি, এটা আমার কাজের জায়গা, আলাপ করার—'

'জায়গা নয়,' মানসী মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো, 'বেশ তো, সে-জায়গার ঠিকানাটাই বলুন।'

নির্মলের অন্যদিকে-তাকিয়ে-থাকা দৃষ্টির পলকে ছোট্টো একটি কম্পন উঠলো। 'কিছু দরকার আছে কি ?'

'একটু আছে বৈকি।'

'আশ্চর্য ! আমার মতো মানুষের সঙ্গে আপনার—'

'খুব অবাক হবার মতো ঘটনা ব'লে মনে হচ্ছে, না ?'

'তা তো একটু হচ্ছেই।'

'মিথ্যে কথা বলাটাও কি আপনার চাকরির একটা অঙ্গ নাকি ?'

'মিথ্যে কথা ?'

'নয় ?'

চুপ ক'রে রইলো নির্মল।

মানসী বললো, 'অস্বীকার করতে চান করুন, মিথ্যার ছদ্মবেশ কেন ? আত্মবিশ্বাস নেই ?'

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিলো নির্মল, ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'সুখে আছেন, সুখে থাকুন। ও-সব কথা থাক।'

'আমার সুখের জন্য খুব ব্যস্ত, না ?'

'মন্দ কী।'

'বছরের পর বছর তারই প্রমাণ দিয়েছেন বোধ হয়।'

নির্মল স্তব্ধ রইলো একটু। পাৎলা লম্বা একটি নিশ্বাস নরম বাতাসের মতো আস্তে ব'য়ে যেতে দিলো বুকের মধ্যে। বললো, 'আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই কি তার প্রমাণ নয়?'

'তাই নাকি?' মানসী ভুরু বাঁকালো, 'ব'লে না-দিলে জানবার উপায় ছিলো না।'

নির্মল ব্যথিত হ'য়ে বললো, 'কৌতুক আপনাকেই মানায়।'

'আপনাকে নয়?'

'আমাকে! আমার কৌতুক করবার অবসর কোথায়?'

'এর জন্যে অবসরের দরকার হয় না।'

'হয়। আপনার মতো পদস্থ মহিলাদের সঙ্গে কৌতুক করতে হ'লে অবসরটাই তার মধ্যে মুখ্য।' ঈষৎ ঝাঁঝ ফুটলো এবার নির্মলের গলায়।

'ও, পদস্থ হওয়াটাতেই দেখছি আপনার আসল আপত্তি।' মানসীর গলায়ও কম জ্বালা নেই।

'আপত্তি! আপত্তি কিসের?'

'ভেবেছিলেন না-খেয়ে, না-প'রে, শুকিয়ে ম'রে আপনার মতো একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের আশায়ই বুঝি চিরদিন রাধানগরের অন্ধকারে প'ড়ে থাকবো।' কিসে থেকে কী। আসলে কোথায় একটা সন্দেহের কুটিল কামড় অনুভব করছে মানসী। একটা দুরন্ত ঈর্ষার দহন। কল্পনায় যেন কোনো একটি নিভৃত নির্জন গৃহকোণের ছবি দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে একটি মেয়ের দুটি প্রতীক্ষারত চোখ, যে-চোখের মায়ায় নির্মল আজ পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত। যে-দুটি চোখের কথা ভেবে নির্মল আজ একবার, এক মুহূর্তের জন্য তাকাতে পারছে না তার দিকে। নিশ্চয়ই। তা নৈলে কেন এই ছলনা? এড়িয়ে যাবার এই অসার্থক চাতুরী। আপনি-আজ্ঞে

ব'লে দূরে সরিয়ে রাখার ঘটা। ওর মন ব'লে কি পদার্থ নেই কোনো ? কে নিলো সেই মন ?

মাথা নিচু করলো নির্মল। নিঃশব্দে হজম করলো এই নিষ্ঠুর তিরস্কার। আস্তে বললো, 'আমি কিছুই ভাবি নি।'

'জানি। তাও জানি। আমিও কারো ভাববার অপেক্ষায় ব'সে থাকি নি।' মানসী উত্তেজিত ভাবে উঠতে গিয়ে ব'সে পড়লো চলন্ত বাসের টানে।

নির্মল হাতের ঘড়ি দেখলো, বাইরের দিকে তাকালো ; বললো, 'নামবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানেই ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কালিঘাট।'

'আমি পথ-ঘাট চিনি।'

'জানি। তার জন্যে নয়।'

'তবে কিসের জন্যে ?'

'বলছিলাম, এখানেই কি আপনার স্টপ ?'

'জেনে কিছু দরকার আছে ?'

'ঠিক স্টপে নামাই কি ভালো নয় ?'

'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।' মানসী আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু এমন জোরে বাস্ চলেছে যে না-থামলে চলা দায়।

নির্মল বললো, 'রাত হয়েছে, একটা যে-কোনো জায়গায় নেমে পড়া কি উচিত হবে ?'

'ভাবনা হচ্ছে ?'

'না। আমার ভাবনা কী ?' ঢোঁক গিললো নির্মল। ভেবে পেলো না কখন থেকে সত্যি এই মেয়ের জন্য মনে-মনে রীতিমতো একটা উদ্বেগ বোধ করছে সে। হ'লোই বা অন্যের স্ত্রী, তবু তো ও টুনি। টুনিই তো।

মানসী চোখ তুললো না, চাপা গলায় বললো, 'কোনো ভাবনা নেই, না ?'

অস্বস্তি বোধ করলো নির্মল। বুঝতে পারলো না, টুনি আজ কী চায় তার কাছে। কী তার উদ্দেশ্য। গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললো, 'না।'

'কিন্তু একদিন তো ছিলো।'

'একদিনের কথা থাক।'

'তা তো থাকবেই।' জ্ব'লে উঠলো মানসী, 'আমিও সেই একদিনের কথা আজ আর মনে ক'রে ব'সে নেই। কাউকে মনে করিয়েও দিতে আসি নি।'

'জানি।'

'নেহাৎ কৌতূহলবশতই এসেছিলাম।'

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'আর তার চেয়েও যেটা স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে মনে-মনে যদি কেউ কোনোদিন এতোটুকু করুণা ক'রে থাকে, সেই অহংকারের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া।'

'জানি।' তেমনি শীতল গলা নির্মলের।

'তা-ও জানেন ? বাঃ, জ্ঞানের কোথাও কমতি নেই দেখছি।'

'সেটাই আসল যন্ত্রণা।' এক পলক তাকিয়ে নির্মল আবছা হাসলো।

হয়তো হাওয়ায় ধুলো ঢুকলো মানসীর চোখে, সিল্কের আঁচলে ঘ'ষে নিলো সেটা। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ক'রে বললো, 'আরো একটা কারণে এসেছি—'

'বলুন—'

'আপনার কাছে কিছু ঋণ ছিলো আমার।'

'ঋণ ?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মানসী, 'হ্যাঁ।'

'ও।' এতোক্ষণে বোঝা গেলো ব্যাপারটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো নির্মল। তারপরেই দুই চোখে যেন হাসির ফোয়ারা ছড়ালো, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেটা বোধহয় শোধ দেবার মতো—'

'হ্যাঁ। সেটা আমি শোধ ক'রেই দিতে চাই।'

'হিসেবটা কি মনে আছে ?'

'আছে।'

'সব কি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'সব ?'

'সব।'

'মনে পড়বে কি ?'

'পড়বে। পড়বে।' সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলো মানসী, 'সব মনে পড়বে আমার। কড়ায় ক্রান্তিতে সে-হিসেব শোধ ক'রে দেবার জন্যই এতো রাত ক'রে এমন রিক্ত হাতে পাগলের মতো আমি ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে ? সে নেই।'

নির্মল হাতের পাঁচ আঙুলে মানসীর এইমাত্র পরিত্যক্ত আসনের পিঠটা সমস্ত শক্তিতে চেপে ধ'রে বললো, 'কী ?'

'কিছু না।' দু-সিঁড়ি নামলো মানসী, আর তারপরেই ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো নির্মলের চোখ থেকে।

নির্মল হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর কী ভাবলো

কে জানে। অধীর হ'য়ে নিচে নেমে এসে আধো-ঘুমন্ত সহকর্মীটির গলায় নিজের ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে বললো, 'এক মিনিট, আসছি।'

.... ছয়

রাস্তায় নেমে ঝোঁকের মাথায় খানিকটা হেঁটে, দাঁড়িয়ে পড়লো মানসী। নিশ্বাসের ওঠা-পড়া তার এখনো স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসে নি, হয়তো বা দম নিতেই দাঁড়ালো। কিন্তু সবটাই তা নয়। বাস্‌টা তাকে কদ্দূর এনে ছেড়ে দিয়েছে সে-জায়গাটা আন্দাজ করবার জন্যও থামতে হ'লো। কালকের মতো আজকেও ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, বড়ো-বড়ো গাছগুলো ভৌতিক ছায়া ফেলেছে ফুটপাতের উপর। ঘুমন্ত ভিখিরির দল, সেই ছায়া জড়িয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে এলোমেলো রাস্তা জুড়ে, কয়েকটা কুকুরও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সেখানে। সামনেই একটা ডাস্টবিন, গন্ধ উঠছে থেকে-থেকে। দুটো গোরু বিশাল শরীর নিয়ে তারই মধ্যে মুখ ডুবিয়ে কী যেন বার করছে টেনে-টেনে। মানসী স'রে এলো এ-পাশে। বোঝা গেলো জায়গাটা জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি।

এতো দূর! এতো দূর তো ভাবে নি সে। ভেবেছিলো পাড়ার মধ্যেই দু-চার স্টপ এদিক-ওদিক। একটা রিক্‌শ নিয়েই ফিরে যেতে পারবে, বাড়ি গিয়ে ভাড়া দিয়ে দেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই পরিবেশে, ভবানী-পুরের প্রায় শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করলো তার। সাড়ে-আটটা বাজতেই যে-শহরের দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে যায়, দশটা বাজতেই সে-শহর ঝিমিয়ে আসে। আর তার মধ্যে রাত এগারোটার রাস্তা তো ম'রে গেছে বলতে হবে। যেটুকু স্পন্দন সে শুধু লাইটপোস্টের তলায় অবসরান্তে

ভৃত্যদের গোল হ'য়ে ব'সে তাদের আড্ডা, নয়তো নিশাচরদের পানের দোকানে ভিড়। একা-একা বুক পেতে শুয়ে-থাকা ইস্পাতের ট্রাম লাইনটার অজগর দেহের দিকে তাকিয়ে মানসীর বুকের ভেতরটা যে কেমন করলো, ইচ্ছে করলো সেখানেই ব'সে পড়ে, ইচ্ছে করলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, ইচ্ছে করলো যেদিকে দু-চোখ যায় চ'লে যায় সেদিকে, গঙ্গার জলে ডুবতেও ইচ্ছে করলো বৈকি। আরো যে কত কিছু ইচ্ছে করলো অন্ত রইলো না কোনো। কিন্তু মানুষ ইচ্ছার অধীন নয়, দুঃখের অধীন নয়, বুদ্ধিরই অধীন। সেই বুদ্ধি দিয়েই মানসী ভাবতে লাগলো এখন কী উপায়ে বাড়ি ফিরতে পারে। হালভাঙা পালছেঁড়া ফুটো নৌকোর মতো উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে যতদূর চোখ চলে ততোদূর একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে তাকাতে লাগলো বিহ্বল চোখে, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলো না। অপেক্ষা করলে হয়তো বা দু-একটা ফিরতি ট্রাম বাস্‌ ধরা যেতো, উপায় নেই। পয়সা নেই হাতে। একা ট্যাক্সি ক'রে যাবার মতোও সাহস নেই। রিক্‌শই বা কই? আর এতোদূর রাস্তা রিক্‌শ ক'রে? ভয়ে-ভয়ে পা ফেলতে লাগলো সামনের দিকে। একজন পথচারী চ'লে গেলো পাশ ঘেঁষে, একটা লরি চ'লে গেলো প্রায় চাপা দিতে-দিতে। ঘুমিয়ে-থাকা কুকুরগুলোর একটা সহসা জেগে উঠে দারুণ চ্যাঁচাতে লাগলো, ঘুম ভেঙে একটা বাবরি-চুলো লোক উঠে ব'সে দুই থাপ্পড়ে ঠাণ্ডা করলো তাকে। আবার সুমসাম। আর তারপরেই ঠিক পিছনে একটা মানুষের নিঃশব্দ পদক্ষেপ অনুভব ক'রে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হ'য়ে উঠলো। 'কে! কে!' ভয়ার্ত কম্পিত গলার চাপা-চাপা আওয়াজ ভেসে গেলো বাতাসে। পিছনের অনুসরণকারী লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালো মাথা নিচু ক'রে. 'ভয় পেয়েছেন?' জনহীন নীরব রাস্তা তার নরম গম্ভীর গলার আওয়াজে যেন গুমগুম ক'রে

উঠলো। শিহরিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো মানসী, তার নিশ্বাস গাঢ় হ'য়ে উঠলো, তাকালো বড়ো-বড়ো চোখে। পরমুহূর্তেই তীব্রভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি! আপনি এসেছেন কেন?'

'দোষ হয়েছে?'

'আমাকে অসম্মান করবার কোনো অধিকার নেই আপনার।'

'কোনো অধিকারের দাবি নিয়ে আমি আসি নি।'

'তবে কী চান?'

'আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।'

'না।'

'কেন?'

'আমি নিজেই যেতে পারবো।'

'পারবেন না।'

'পারবো, পারবো। আপনি যান।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'হোক।'

'পথ নির্জন হ'য়ে গেছে।'

'জানি।'

'সঙ্গে পয়সা নেই।'

'তাতে আপনার কী?'

'আমার!' দুটি সজল চোখ নির্মল আকাশে তুললো, 'না, আমার আর কী।'

'তবে যান।'

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো নির্মল। এক মুহূর্ত দু-জনেই চুপ। একটা খালি ট্যাক্সি যেতে-যেতে মন্থর হ'লো তাদের দেখে। মানসীর অনুমতি

না-নিয়ে সেটাকে হাত বাড়িয়ে থামালো নির্মল। ক্লান্ত গলায় বললো, 'উঠুন।'

'না।'

'বলুন, কোথায় যেতে হবে।'

'না।'

'গাড়িটা থামালাম—'

'আমি বলি নি।'

'আপনি বলবেন, সে-ভাগ্য নিয়ে আমিই কি এসেছি সংসারে?'

'ভাগ্য!' ঘাড় হেলিয়ে বাঁকা চোখে ঠিক টুনির মতো ক'রেই তাকালো মানসী, 'দয়া ক'রে ভাগ্যের দোহাই দেবেন না। ওটা পুরুষের লক্ষণ নয়।'

'হয়তো তা-ই।'

'হয়তো নয়। সেটাই সত্যি।'

'তর্ক থাক।' মাথার চুলে নির্মল আঙুল ডোবালো, 'মিছিমিছি দেরি হচ্ছে।'

'আপনি যান না।'

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

'আপনার সঙ্গে আমি যাবো না।'

'কেন?'

'সে-কৈফিয়ৎ আপনাকে আমি দেবো না।'

'আমার সঙ্গে একা যেতে কি আজ আপনার ভয় করছে?'

'ভয়!'

'লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না চেহারা দেখে?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই ওঠে না।'

'আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে?'

'আঘাত লাগবে কেন ?'

'একটা খাকি প্যাণ্ট-পরা বাস কণ্ডাক্টর— বাড়িতে বলবে কী, না ?'

'নিজেকে ছোটো করতে লজ্জা হয় না ?'

'লজ্জা ! লজ্জা থাকলে কি আর এখানে এসে দাঁড়াই ?'

'এখানে এসে দাঁড়ানোটাতেই আসল লজ্জা, আসল দুঃখ, না ?'

'বাজে কথা থাক। আমি বড়ো ক্লান্ত, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি চ'লে যাই।'

'আমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তো আপনার নয়।'

'আর কোনো দায়িত্ব না থাক, আমি পুরুষ, সে-হিসেবে এই দায়িত্বটা নিশ্চয়ই আছে।'

'ও, সেই হিসেবে। নারীরক্ষা-সমিতি খুলেছেন বুঝি ?'

'যা মনে করেন।'

'মনে করবো কেন। যা সত্য, তা-ই।'

অদূরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো নির্মল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তাহ'লে আমার দরকার নেই কোনো ?' বেদনায় ভারি হ'য়ে উঠলো তার গলা।

মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধস্বরে মানসী বললো, 'না।'

তবু কী জানি কেন দাঁড়িয়ে রইলো নির্মল। কয়েক মুহূর্ত যেন পৃথিবীতে একটা নিশ্বাসপতনের শব্দও শুনতে পেলো না সে। মাথার উপর অনন্ত আকাশের অজস্র তারায় তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বটা মুছে দিতে চেষ্টা করলো ভবানীপুরের এই লম্বা রাস্তাটা থেকে। অনেক পরে প্রায় দীনের আকৃতি নিয়ে বললো, 'একটা কথা ছিলো।'

'কী কথা ? আমার সঙ্গে আর আপনার কী কথা থাকতে পারে ?' মানসীর গলা থরোথরো শোনালো।

'পারে না, না? ঠিক বলেছেন।' একটু থেমে, 'এতো বছর ধ'রে নিজের স্ত্রীকে যত কথা বলবার জন্য সাজিয়ে রেখেছিলাম—'

'কী! কী বললে—'

'সে-সব আজ পরের স্ত্রীকে বলি কী ক'রে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও যে অনেক ভালো।'

'পরের স্ত্রী!'

'কিন্তু টুনি—' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামটা কেমন ক'রে উচ্চারণ ক'রে ফেললো নির্মল। আর সেই ডাক শুনে বুকটা থরথর ক'রে উঠলো মানসীর। রাগ অভিমান সব ভুলে ব্যাকুল গলায় বললো, 'টুনি! এতো-ক্ষণে নামটা মনে পড়লো তোমার?'

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে নির্মল মৃদু হেসে বললো, 'বরং জিগ্যেস করতে পারো এ-নাম ছাড়া এতোগুলো বছর আর আমার কী মনে পড়েছে।'

অভিমানে বুক গলা ভারি হ'য়ে গেলো মানসীর, 'থাক, সে-খবর আমি জানতে চাই না।'

'তাও আমি জানি।' নির্মলের গলাও ভারি শোনালো, 'আজ সকালে তোমার স্বামী আমার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগটি এনেছেন—'

'আমার স্বামী!'

'হয়তো তোমারও ভালো লাগে নি আমার কাল রাত্তিরের বিচলিত ব্যবহার, কিন্তু এটুকু জেনো, তোমার সুখের সংসারে আমি কোনোদিন, কখনো এতোটুকু বাধা হবো না।'

সহসা শিশিরের উপর রোদের ঝলকের মতো মানসীর ঝাপসা চোখে এক ফোঁটা হাসি টলটল ক'রে উঠলো। মেঘ স'রে গিয়ে মস্ত দিগন্তজোড়া নীলাকাশ এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে গেলো তার কাছে। মৃদু হেসে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে।

রাস্তা থেকে ফুটপাতে পা দিলো নির্মল, 'তাহ'লে বিদায় দাও, যাই।'

দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করলো মানসী, 'আর আমি ?'

'তুমি! তুমি কী ?'

'আমি কী করবো ব'লে দাও।'

নির্মল অপলকে মানসীর মুখের দিকে তাকালো এবার। তাকিয়েই রইলো। সহসা একটা দুরন্ত ভালোবাসার আবেগে তার পুরুষ-বুক যেন ভেঙে যেতে চাইলো। কিন্তু ঢেউটা সন্তর্পণে ব'য়ে যেতে দিলো সে। অবসন্ন গলায় বললো, 'তবু তোমাকে দেখলাম। দেখতে পেলাম। বোঝা-পড়া হ'য়ে গেলো একটা।'

'বোঝাপড়া! এতো বছরের দেনা-পাওনার হিসেব কি এতোই সহজ ?' মানসীর কোমল গলা ঠিক টুনির মতোই সলজ্জ শোনালো।

'সহজ আর কোথায়।' নিশ্বাস নিলো নির্মল, 'কী কঠিন মূল্য যে আজ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি কোনোদিন বুঝবে না।'

মানসী ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে উঠে এলো, বুকের অস্ত্রীতন্ত্রী যেন ছিঁড়ে গেলো নির্মলের। চকিত হ'য়ে প্রায় আর্তস্বরে বললো, 'যাচ্ছো ?'

'যাবো না ?'

'ট্যাক্সি নিয়ে ?'

'হেঁটে যাবো ?'

'একা !'

'এই ফাল্গুনের রাত্তিরে রাস্তার হিমে দাঁড়িয়ে অত কথা আমি বলতে পারবো না, গাড়িতে এসো।'

'আমি ?'

'তবে আর কে আছে এখানে ?'

'ও।'

'আর পৌঁছে দেবার মতো আপাতত হাতের কাছে যখন আছোই একজন, তখন আর রাত ক'রে একাই বা যাই কেন ?'

কী জানি কী মর্জি। কিছু না-ব'লে ধীরে-ধীরে উঠে এলো নির্মল। হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তার ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু অন্ধকার গাড়ির স্তব্ধতায় পাশাপাশি ব'সে আবার স্মৃতির পিঁপড়েরা তাকে দংশন করতে লাগলো। আবার পানাভরা পুকুরের টলোমলো জল, তীরের আম, জাম, জামরুলের ঘন ছায়া, বন-তুলসীর ঝোপ, দুপুরের রোদ, বিকেলের গোধূলি, কত শত মেঘের দিনের লুকো-চুরির লীলা।

'কিছু বলছো না—' কখন যেন মানসী শরীরের সমস্ত উত্তাপ নিয়ে স'রে এসেছে কাছে। তার নরম গলা বুকের মধ্যে ছুঁলো। নির্মল জানালা দিয়ে চলন্ত রাস্তা দেখলো, জবাব দিলো না।

'বলো।' মানসী প্রায় ফিসফিস করলো।

'কী বলবো ?'

'কোনো কথা নেই ?'

'না।'

'কেন ?'

'বলেছি তো—'

'কী বলেছো ?'

'অন্যের স্ত্রীর কানে বলবার মতো কথা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু অন্যের স্ত্রী-ই যদি রাত দুপুরে বেরিয়ে আসতে পারে সে-কথা শোনবার জন্য, তাহ'লে তোমার বলতে বাধা কী ?'

'সেটাই আসল বাধা।'

'সত্যি কথা বলো যে আমার জন্য আর তোমার মনে কিছু নেই।'

মুখ ফেরালো নির্মল, 'আর যা-ই হই, আমি লোভী নই টুনি।'

'এখানে লোভের প্রশ্ন কোথায়?'

'বোঝো না?'

'না।'

'এই ক্ষণিক বুদ্‌বুদে আমার কিসের সুখ। শুধু এই মুহূর্তটুকুতে আমার অনন্ত ক্ষুধার কতটুকু তৃপ্তি?'

চোখে বিদ্যুৎ হানলো মানসী, 'ক্ষণিক কেন? ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তটুকুকেই তো তুমি অনন্তকালে পরিণত করতে পারো।'

'পারি নাকি?'

'এই গাড়ি তুমি তোমার বাড়ির দিকে ফেরাতে পারো না?'

'ছি!'

'ছি কিসের?'

'শেষে আমি চুরি করবো? তোমাকে!'

'দোষ কী।'

'একজন ভদ্রলোক হ'য়ে আর-একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে পালাবো?'

'সে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে—'

'তাহ'লেও না।'

'তাহ'লেও না?'

'না।'

'কেন?'

'মানুষের বুকের তলায় একটা হৃদয় থাকে টুনি, মানুষ শরীরসর্বস্ব নয়।'

'যুক্তিটা ঠিক হ'লো না। ভালোবেসে ছিনিয়ে নেওয়াই পুরুষের কাজ।'

'স্বীকার করছি সে-পৌরুষ আমার নেই।'

'যোগ্যতাও নেই।'

'না, তাও আমার নেই। তোমার শরীর ঘিরে আজ যে-আরাম, যে-স্বাচ্ছন্দ্য আর যে-তৃপ্তি ছড়িয়ে রেখেছেন তোমার স্বামী, নির্মল কণ্ডাক্টরের সাধ্য কী তা তোমাকে দিতে পারে?'

'তুমি ভীরু।'

'হয়তো।'

'কাপুরুষ।'

'হয়তো।'

'আসলে এ-সব সুনীতি তোমার আমাকে এড়াবার যুক্তি।'

হাসলো নির্মল, 'তাহ'লে তো আজকের এই অসহ্য সময়গুলোর হাত থেকে অন্তত রক্ষা পেতে পারতাম। কিন্তু আর কতদূর তোমার বাড়ি। আমি আর পারছি না।'

'তবে তুমি এলে কেন আমার সঙ্গে?'

'তুমি ভুল ক'রে পয়সা নিয়ে আসো নি।'

'না-ই বা এনেছিলাম।'

'কত রাত হ'য়ে গেছে, একা-একা—'

'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমন তো কত রাত, কত দিন আমার শূন্য হাতে একা পথে কেটেছে নির্মল, তুমি কোথায় ছিলে?'

'ছিলাম। তোমার সঙ্গেই ছিলাম।' নির্মলের পুরুষ-গলা হাহাকারে ভ'রে উঠলো, 'তোমাকেই পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম দেশ থেকে দেশান্তরে, পথে ঘাটে ফুটপাতে।'

'আমাকে?'

'তোমাকে। শুধু তোমাকে।'

'আমাকে তবে তুমি ভুলে যাও নি?'

'ভুলবো!'

সহসা মানসী নির্মলের সারাদিনের খাটুনিক্লান্ত ধূলিধূসরিত দু-খানা হাত টেনে নিলো নিজের নরম স্নিগ্ধ হাতের মুঠোয়, 'আর এতোদিনে দেখা হ'লো?'

'এতোদিনে।'

'আর তারপর?'

'তারপর!' জলভরা চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো নির্মল, 'তারপর আশাটুকুও গেলো। এতোদিনে আমি সব রকমে কাঙাল হলাম, টুনি।'

এ-কথা শুনে বুক ভরা কত দুঃখের পাষাণ আজ গ'লে গেলো টুনির। অসহ্য কান্নার বেগে কোলের উপর ভেঙে প'ড়ে বললো, 'ছাখো, ভালো ক'রে ছাখো, সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি আজও তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি কিনা।'

এলো খোঁপা খুলে গেলো মানসীর,— ঘন কালো চুল ছড়িয়ে গেলো চারপাশে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো নির্মল। তারপর সেই চুলের অরণ্যে মুখ ডুবিয়ে কখন যেন ডেকে উঠলো, 'টুনি। আমার টুনি! টুনি পাখি আমার।'